# ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর

# পত্রাবলী

## [ মকতুবাতে আহ্‌মদ ]

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়

**পাদ্রীদের নামে চিঠি-পত্র**


সংকলন

হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

# ইমাম মাহদী (আ.)-এর

# পত্রাবলী

## (মকতুবাতে আহ্‌মদ)

### প্রথম খন্ড দ্বিতীয় অধ্যায়

[সাবেক তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়]

### পাদ্রীদের নামে

"খ্রিষ্টান জাতির জন্য আবশ্যকীয় নূর ও জ্যোতি দিয়ে
আমি বিশেষভাবে ভূষিত হয়েছি।
এ বিশেষত্বের দিক দিয়েই আমি
'ইবনে-মরিয়ম' নামে অভিহিত হয়েছি"॥
*–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)*

সংকলক
**হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)**

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা


| | |
|---|---|
| গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে. |
| প্রকাশনায় | **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**<br>৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ |
| ভাষান্তর | **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**<br>মুরব্বী সিলসিলাহ (অব.) |
| প্রচ্ছদ | মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু |
| প্রকাশকাল | প্রথম বাংলা মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০১৩ |
| সংখ্যা | ২০০০ কপি |
| মুদ্রণে | ইন্টারকন এসোসিয়েটস্<br>৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা। |

**Imam Mahdi[as]-er**
**PATRABOLI**
Moqtubate Ahmad
Vol. 1 Chapter 2
Letters to Christian Missionaries
Hakim Nuruddin[ra]

**by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
**The Promised Messiah and Imam Mahdi [as]**
translated into bengali by
**Maulana Ahmad Sadeque Mahmud**
published by
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 978-984-991-046-6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# 'মকতুবাতে আহমদ' প্রসঙ্গে দু'টি কথা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক কাল (১৮৭৮ ইং) থেকেই ইসলামের সমর্থনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। পরবর্তীতে তাঁর এ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তকে তিনি লিখেছেন: "মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে আবশ্যকীয় এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং জগদ্বাসীকে সত্যের প্রতি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এবং এর সাহায্য-সহায়তা ও ইসলামের প্রচারকার্যকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেছেন। ...বস্তুতঃ এ সকল শাখার মধ্যে চতুর্থ শাখা হলো চিঠি-পত্রের কার্যক্রম। এ প্রাতিষ্ঠানিক শাখা থেকে সত্যান্বেষীগণকে বা সত্যের বিরোধীদেরকে চিঠিপত্র লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ নব্বই হাজারেরও বেশি চিঠি এসে থাকবে যেগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে।" (ফতেহ্ ইসলাম পৃ: ১০-২২)

দ্বিতীয় খিলাফতকালে হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) উল্লেখিত চিঠিপত্রের এক বিরাট অংশ সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুনরায় পঞ্চম খিলাফতকালের ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে আরও কিছু সংখ্যক চিঠি-পত্র সংগ্রহ করে সেসবগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পুস্তকটির প্রারম্ভে মূল ভূমিকায় দেয়া হয়েছে। উর্দু ভাষায় লিখা এ সকল চিঠির **প্রথম খন্ডের-প্রথম অধ্যায়** (পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতি, লেখরাম, শিব নারায়ণসহ আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজি ও অন্যান্য হিন্দুদের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের নামে) ও **দ্বিতীয় অধ্যায়** (আথম, ফতেহ্ মসীহ্, আমেরিকার আলেকজান্ডার ডুই ও ইংল্যান্ডের পিগেটসহ অন্যান্য বিখ্যাত খ্রিষ্টান নেতৃস্থানীয় পাদ্রীদের নামে) এবং **দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়** (হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন, খলীফা আউয়াল রা:-এর নামে)।

উপরোক্ত চিঠি-পত্রের বঙ্গানুবাদ আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় ও অনুগ্রহে খিলাফত জুবিলীর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্। অনুবাদের দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন (অব.) মুরুব্বী সিলসিলা মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মূল উর্দু পুস্তকের সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন মুরুব্বী সিলসিলা আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব। প্রুফ রিডিং-এর কাজও করেছেন অনুবাদক। বাংলা একাডেমী কর্তৃক

প্রকাশিত বাংলা বানানরীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন কাজে সহযোগিতা করেছেন জনাব নূরুল ইসলাম মিঠু ও মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব।

এ পবিত্র ও মহামূল্যবান পত্রাবলীতে রয়েছে ইসলাম, মহানবী (স.) ও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বহু সংখ্যক আপত্তি ও অভিযোগের অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে বলিষ্ঠ খন্ডন সম্বলিত উত্তরের পাশাপাশি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গভীর তত্ত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ও বিবরণ, যা বাংলা ভাষাভাষী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির বিশেষ উপকারে আসবে বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ করুন যেন তাই হয়।

এ পুস্তকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর লেখা চিঠি পত্রের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ খ্রিষ্টান পাদ্রীদের নামে চিঠি পত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ পুস্তক প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে যারা সেবা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্ব প্রতিপালক প্রভু।

**মোবাশশেরউর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# পাদ্রীদের নামে পত্রাবলীর বিষয়সূচি


| পত্র নং | পত্র লিখার তারিখ | যার/যাদের নামে পত্র লিখা হয়েছে | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৮৮৫ ইং | পাদ্রী সোফ্‌ট | ১৪ |
| ২ | ১৮৯১ইং | একজন খ্রিষ্টানের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর | ২৩ |
| ৩ | এপ্রিল ১৮৯৩ | জন্ডিয়ালার খ্রিষ্টান অধিবাসী ও পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক প্রমুখের চিঠিপত্র | ৭৯ |
| ৩ | এপ্রিল ১৮৯৩ | পাদ্রী আব্দুল্লাহ্‌ আথমের নামে চিঠি | ৬৭ |
| ৪ | ১৩ এপ্রিল ১৮৯৩ | জন্ডিয়ালার খ্রিষ্টান অধিবাসী | ৮৫ |
| ৫ | ২৩ এপ্রিল ১৮৯৩ | পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক (পত্র-১) | ৮৮ |
| ৬ | ২৫ এপ্রিল ১৮৯৩ | পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক (পত্র-২) | ৯২ |
| ৭ | ৩০ জুন ১৮৯৩ | পাদ্রী জাওয়ালা সিং ১৭৫ | ৯৪ |
| ৮ | ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৫ | সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জরুরী জ্ঞাতব্য | ৯৭ |
| ৯ | ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৫ | পাদ্রী ফতেহ্‌ মসীহ্‌ (নূরুল কুরআন ২য় খন্ড) | ১০০ |
| ১০ | ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৫ | ফতেহ মসীহ্‌র অবশিষ্ট আপত্তিসমূহ | ১১৫ |
| ১১ | ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ | পাদ্রী ফতেহ মসীহ্‌ | ১৫৫ |
| ১২ | ২৫ মে ১৯০০ই | লাহোরের বিশপ সাহেবের উদ্দেশ্যে সত্য ফয়সালার আবেদন | ১৬০ |
| ১৩ | সেপ্টেম্বর ১৯০২ইং | জর্জ লেফরায় ডিডি বিশপ লাহোর | ১৬৭ |
| ১৪ | সেপ্টেম্বর ১৯০২ইং | জন আলেকজান্ডার ডুই (১ম পত্র) | ১৮২ |
| ১৫ | তারিখ বিহীন | জন আলেকজান্ডার ডুই (২য় পত্র) | ১৯৫ |
| ১৬ | ২৪ জুন ১৯০৪ | একজন ইংরেজের নামে | ২০০ |
| ১৭ | ১৯০৬ইং | বাঁশ বেরেলীর একজন মুসলমান ('ইনাবীউল ইসলাম' পুস্তকের জবাবে) | ২০২ |

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

# মকতুবাতে আহমদ, ১ম খন্ডের ভূমিকা

নবী-রসূলগণ বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বনে নিজ নিজ জাতির মাঝে 'দাওয়াত' (ঐশী আহ্বান)-এর কাজ সাধন করে এসেছেন। সেগুলোর মাঝে একটি মাধ্যম চিঠি-পত্রও বটে। তাই কুরআন করীমে সাবার রানীর নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর চিঠির উল্লেখ করে সূরা নামলে নিম্নরূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় : "আমার চিঠিটি নিয়ে যাও এবং এটি নিয়ে তাদের সামনে রেখে দাও। এরপর তাদের কাছ থেকে সরে যাও এবং দেখ, তারা কী উত্তর দেয়। (এ চিঠি দেখে) সে (রানী) বললো, হে আমার জাতির নেতারা! আমার কাছে নিশ্চয় একটি অতি সম্মানজনক পত্র পাঠানো হয়েছে। এটি অবশ্যই সুলায়মানের পক্ষ থেকে আর এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত ও অসীম দানকারী" (আন নামল : ২৯-৩১)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে সত্যের প্রচারকার্য সম্পাদন করেন। সেগুলোর মধ্যে রোমক সম্রাট হারকিউলিসের নামে, পারসিক সম্রাট কিসরার নামে, মিশর অধিপতি মকওকাসের নামে, হাবশা তথা ইথিওপিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর নামে এবং গাস্‌সান ও ইয়ামামার রঈসদের নামে পাঠানো চিঠিপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক কাল থেকেই ইসলামের সমর্থনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। পরবর্তীতে এ পথে তাঁর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরও সুসংহত হতে থাকে। ১৮৯১ইং সালে তিনি তার প্রণীত 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তকে লিখেন :

"ইসলামের জীবন লাভ আমাদের কাছে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। তা কী! তা হলো, এ পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এ মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে। অন্য কথায় এরই নাম ইসলাম। খোদা তাআলা এখন এই ইসলামকে জীবিত করতে চাইছেন। এ মহান অভিযানকে কার্যকর করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব দিক দিয়ে ফলপ্রসু এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন। আর জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য সত্যের সাহায্য ও ইসলাম

প্রচারকার্যকে কয়েকটি শাখায় বিভিক্ত করেছেন। ...বস্তুত এসকল শাখার মধ্যে চতুর্থ শাখা হলো চিঠিপত্রের কার্যক্রম। এ প্রাতিষ্ঠানিক শাখা থেকে সত্যান্বেষীগণকে বা সত্যের বিরোধীদেরকে চিঠিপত্র লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ নব্বই হাজারেরও বেশি চিঠি এসে থাকবে যেগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু চিঠি আছে, যেগুলোকে নিরর্থক ও অনাবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে। এ চিঠিপত্র আসার ধারা নিয়মিত চলছে। আর প্রত্যেক মাসে সম্ভবত তিন শ' থেকে সাত শ' বা হাজার পর্যন্ত চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়ে থাকে।" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড পৃঃ ১০-২২)।

"আমি তো খোদার আদেশে সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদেরকে দাওয়াত (আহবান) করি। পরিশেষে ভারত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজকে ইসলামের (দিকে আহ্বান করে) চিঠি দিয়েছি।".....

....."আর প্রায় ত্রিশ হাজার প্রচারপত্র এ দাবীর বিষয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ইংরেজী ভাষায় আট হাজার প্রচারপত্র ও চিঠি রেজিস্ট্রি করে ভারতবর্ষের সমস্ত পাদ্রী, পন্ডিত ও ইহুদীদের কাছে পাঠানো হয়। আবার এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রীস, রুশ ও রোম এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বড় বড় পাদ্রীর নামে এবং রাজপুত্র ও মন্ত্রীগণের নামে পাঠানো হয়। বস্তুত তাদের মাঝে রয়েছেন বিলাত ও ভারত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও প্রধানমন্ত্রী গ্লেড স্টোন এবং জার্মান যুবরাজ বিসমার্ক। সুতরাং এ সকল মহোদয়ের প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত চিঠিপত্রে একটি সিন্দুক ভরা রয়েছে। (মুনশী মাযহার হুসেন সাহেবের নামে পত্র, আল হাকাম ২৪ আগষ্ট ১৯০১ ইং পৃঃ ৬)

এছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেন এবং শাহ্-আফগানিস্তানকেও নিজের দাবী ও ইসলামী জিহাদ সংক্রান্ত মূলতত্ত্ব তাঁর পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেন।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) ১৯৩১ সালের অবস্থাবলীর পর্যালোচনা করে হযরত আকদাসের চিঠিপত্র সম্পর্কে বলেন:

"চিঠিপত্রের ধারাবাহিক কর্মকান্ড বিরাট এক চলমান প্রক্রিয়া বিশেষ যার মাধ্যমে বহু লোক উপকৃত হয়ে থাকেন। এ চলমান ধারা দুটি খাতে বিভক্ত। প্রথমত সেই সব পত্র যা সরাসরি আল্লাহ্র মুর্তিমান অকাট্য প্রমাণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

অথবা হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের নামে আসে। দ্বিতীয়তঃ সেই সব পত্র যা হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব অথবা অন্যদের নামে আসে। এসব পত্র বলতে হযরত আকদাস সম্পর্কিত বিষয়াবলী জানার জন্য প্রশ্ন সম্বলিত চিঠিপত্রকে বুঝায়। এসব পত্রের উত্তর খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্যে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব বরাবর দিয়ে থাকেন। এ পত্র গুলোর সংখ্যা দৈনিক ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ অনুপাতে বছরে প্রায় বার হাজার দাঁড়ায়। আর হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবের নামে হযরত আকদাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসামূলক চিঠিপত্রের সংখ্যা দৈনিক ১৫ এবং বাৎসরিক ৫৪৭৫ অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১৮ হাজার। এই বিপুল পরিমাণ চিঠির উত্তর লিখে পাঠানো হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় কত লোকের মাঝে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ পবিত্র জামাত ও ঐশী সিলসিলার তবলীগ (বার্তা) পৌঁছেছে।" (আল হাকাম ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০২ ইং পৃঃ ১২)

তিনি আরও বলেন,

"প্রারম্ভিককালে যখন তাঁর (আ.) পক্ষ থেকে কোন দাবী ছিল না এবং 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি ব্যাস্ত ছিলেন তখন তিনি যথারীতি সকল চিঠির উত্তর নিজেই দিতেন। লেখার জন্য দেশী কলম ও কালি ব্যবহার করতেন। এবং পাতলা ফ্রেঞ্চ পেপারে চিঠিপত্রের উত্তর লিখে পাঠাতেন। এ সব চিঠি অনেক সময় স্বয়ং এক স্বতন্ত্র পুস্তকের রূপ ধারণ করতো। এগুলোতে রূহানীয়াত ও সূফীবাদের অতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলীর উপর ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হতো। এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। এরপর মুন্সী আব্দুল্লাহ সান্নোরী এবং সাহেবজাদা সিরাজুল হক সাহেব নোমানী যখন (তাঁর কাছে) উপস্থিত হতে আরম্ভ করলেন তখন তাদেরকে দিয়ে কোন কোন পত্রের উত্তর লিখিয়ে দিতেন। ক্রমান্বয়ে যখন জামাত ব্যপকতা লাভ করতে লাগলো এবং খোদা তাআলার আদেশে এবং ওহী ইলহাম মারফৎ নির্দেশক্রমে তিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী ঘোষণা করলেন, ফলে চিঠি-পত্রও বেশি আসতে আরম্ভ করলো। তখনও অধিকাংশ পত্রের উত্তর বিশেষত তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠাবান ভক্তদের চিঠির উত্তর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই স্বহস্তে লিখতেন বরং তাদের মধ্যে কারও কারও সাথে তাঁর এমন সম্পর্ক ছিল যে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত অথবা তাদের কারও জীবনের শেষ অবধি নিয়মিতভাবে এ রীতি বজায় রাখেন যে তাদের চিঠির উত্তর মাত্র এক লাইন হলেও নিজের হাতেই দিতেন।

কোন কোন বন্ধুর ক্ষেত্রে কেবল ভালোবাসা ও আন্তরিকতার দরুনই নয় বরং সাবধানতা বশত তাদের নামে কোন বই পুস্তক বা প্রচারপত্র ও বিজ্ঞপ্তি পাঠালে নিজের হাতে প্যাকেট তৈরী করতেন, নিজের হাতে ঠিকানা লিখতেন, টিকেট লাগাতেন এবং রেজিস্ট্রি করে পাঠাতেন। বস্তুত এ একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু যা কিছুটা বিস্তারিত ভাবে লিখার দাবী রাখে। আপাতত আমি কেবল একটা ভূমিকামূলক নোট হিসেবে লিখছি।

মোট কথা, যখন দাবীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হলো ফলে চিঠিপত্রও বহুলভাবে আসতে লাগালো আর ডাকের কাজ তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো তখন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব, হাকীম ফযল দীন সাহেব এবং মাঝে মধ্যে মির্যা খোদা বখশ সাহেব এ কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। যখন হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব হিজরত করে কাদিয়ান চলে এলেন তখন স্থায়ীভাবে একাজ তাঁর উপর ন্যাস্ত হলো এবং তাঁর সহায়তার জন্য পীর ইফতিখার সাহেব নিযুক্ত হলেন। বয়আত বা দোয়ার আবেদনগুলো অথবা সাধারণ অন্য চিঠিপত্রের উত্তর তিনি এক বিশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী লিখে দিতেন। আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ চিঠি-পত্রের উত্তর হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব (রা.) নিজেই লিখতেন (সংক্ষেপিত) [আল হাকাম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ পৃষ্ঠা ৬]।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ সব চিঠিপত্র সংগ্রহ ও সংকলন করে এগারটি খন্ডে প্রকাশ করে ছিলেন এবং পরবর্তীতে একটি খন্ড মোহরম মালেক সালাহ্উদ্দীন সাহেব সংকলন করেছিলেন।

১ম খন্ড মীর আব্বাস আলী লুধিয়ানভীর নামে চিঠিপত্র।

২য় খন্ড আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী এবং সাধারণ হিন্দুদের নামে চিঠিপত্র।

৩য় খন্ড পাদ্রীদের নামে চিঠিপত্র।

৪র্থ মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর নামে চিঠিপত্র।

৫ম খন্ড ১ম ভাগ হযরত আব্দুর রহমান মাদ্রাজী (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৫ম খন্ড ২য় ভাগ হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৫ম খন্ড ৩য় ভাগ হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের (রা.) নামে চিঠিপত্র।

৫ম খন্ড ৪র্থ ভাগ হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৫ম খন্ড ৫ম ভাগ বিভিন্ন সাহাবীর নামে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহাবার নামে কিছু সংখ্যক চিঠিপত্রও রয়েছে।

৬ষ্ঠ খন্ড অ-আহমদী উলামার নামে চিঠিপত্র।

৭ম খন্ড মালেক সালাহউদ্দীন সংকলিত বিভিন্ন সাহাবার নামে চিঠিপত্র।

হযরত ইরফানী সাহেব (রা.) এসব চিঠিপত্র যে ক্রমধারায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটি তাঁর পক্ষে চিঠিপত্র সংগ্রহ ও হস্তগত করণের অভাব এবং আর্থিক সংকটের কারণে পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তিনি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো এ সকল চিঠিপত্রকে সংরক্ষণ করা যাতে এ আমানত (গচ্ছিত ধনভান্ডার) জামাতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে পৌঁছুতে পারে। সুতরাং মকতুবাতে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন,

"আমি দুঃখিত, আমার ব্যস্ততা এসকল চিঠি-পত্রের ক্রমিকধারায় এক ত্রুটি সৃষ্টি করে দিয়েছে। তথাপি আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো একত্র করে দেওয়া। আমার পরে যারা আসবেন তারা এ সকল চিঠিপত্রকে ক্রমিকধারায় বিভিন্ন শিরোনামের নীচে সন্নিবিষ্ট করবেন।"

'নেযারত ইশায়াত' সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া (পাকিস্তান), খিলাফত জুবিলীর বরকতমন্ডিত উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইয়্যেদাহুল্লাহু তাআলা)-এর অনুমতিক্রমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চিঠিপত্র নতুন ক্রমিক ধারায় তিনটি খন্ডে প্রকাশ করছে। এ নতুন ধারায় (সাজানো সংকলনটিতে) হযরত ইরফানী সাহেবের (রা.) সংগৃহীত ও একত্রকৃত চিঠিপত্রের মধ্যে কোন একটি চিঠিও বাদ দেয়া হয়নি বরং প্রত্যেক সাহাবীর নামে বিভিন্ন খন্ডে সন্নিবেশিত চিঠিগুলোকে এক জায়গায় এবং তারিখ অনুযায়ী ক্রমধারায় আনয়ন করা হয়েছে। যে কিছু সংখ্যক চিঠি হযরত ইরফানী সাহেব রেকর্ডভুক্ত করতে পারেন নি সেগুলোও অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ নতুন অন্তর্ভুক্ত চিঠিপত্রকে তারকাচিহ্নে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'নেযারত ইশাআত'-এর পক্ষ থেকে দেয়া 'মকতুবাতে আহমদ'-এর ক্রমধারার বিবরনী নিম্নে লিপিবদ্ধ হল :

## প্রথম খন্ড

১। আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী ও সাধারণ হিন্দুদের নামে চিঠিপত্র।

২। খ্রিষ্টান পাদ্রীদের নামে চিঠিপত্র, যাদের মাঝে ফতেহ্ মসীহ্ ও আথম ছাড়া ডুই এবং পিগেটও শামিল রয়েছেন।

৩। অ-আহমদী উলামার নামে চিঠিপত্র, যাদের মাঝে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী, মৌলবী রশিদ আহমদ গঙ্গোহী, মৌলবী গোলাম দস্তগীর সাহেব কসূরী ও মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেব গজনভী প্রমুখদের নামে চিঠিগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪। মীর আব্বাস আলী সাহেবের নামে চিঠিপত্র– এসকল চিঠির বিষয়বস্তু হলো তাসাওউফ বা সূফীবাদ।

৫। তাসাউওফ বা সূফীবাদের মাসয়ালা 'ওয়াহ্‌দাতিল উজুদ' সম্পর্কে মুনশী মুযাফফার হুসেন সাহেবের নামে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিনটি চিঠিও এ খন্ডে শামিল করা হয়েছে।

## দ্বিতীয় খন্ড

সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের নামে চিঠিপত্র।

১। হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

২। হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৩। হযরত শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজি (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৪। হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

## তৃতীয় খন্ড

১। হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.) এর নামে চিঠিপত্র।

২। হযরত মুনশী যাফার আহমদ সাহেব (রা.) এবং কপূর থলার অন্যান্য সাহাবার নামে চিঠিপত্র।

৩। হযরত মুনশী হাবিবুর রহমান সাহেব (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৪। হযরত মীর সিরাজুল হক নু'মানী (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৫। হযরত মুনশী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৬। হযরত শেঠ ইসমাঈল আদম সাহেব (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৭। হযরত ডা. খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৮। হযরত মৌলবী গোলাম হাসান খান সাহেব পিশাওরী (রা.)-এর নামে চিঠিপত্র।

৯। বিভিন্ন সাহাবা কিরামের নামে নতুন প্রাপ্ত চিঠিপত্র।

জনাব হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) জামাতের বিশেষ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির হকদার যিনি চরম বিরূপ পরিস্থিতি, আর্থিক সংকটাবলী ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই মহামূল্যবান চিঠিপত্র সংগ্রহ ক'রে নিজের পত্রিকা আল হাকামে প্রকাশ করেন। এরপর পুস্তক আকারে সন্নিবেশিত করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব মালেক সালাহ্উদ্দীন সাহেবও মকতুবাতে আহমদীয়া ৭ম খন্ড সংকলন করেন। এতে তিনি বিভিন্ন সাহাবা কিরামের নামের পত্রাদি একত্র করেছেন।

মকতুবাতের বর্তমান সংস্করণটির সংকলনের এ অত্যন্ত নাজুক পর্ব অর্থাৎ চিঠিপত্রের ক্রমধারা, নতুন পত্রাদির সন্ধান, আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখা চিঠিগুলোর অনুবাদ এবং প্রুফরিডিং-এর কাজে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হাবীবুর রহমান রিয্ভী সাহেব (নায়েব নাযের ইশাআত) অনেক পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান ও পুরষ্কারে ভূষিত করুন। তার সাথে মুরুব্বী সিলসিলা জনাব রানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, মরুব্বী সিলসিলা জনাব মুবারক আহমদ নাজীব সাহেব এবং মুরুব্বী সিলসিলা জনাব ফাহীম আহমদ খালেদ সাহেব কাজ করেছেন। জামাতের সবাই এই ওয়াকেফীনে জিন্দেগী ভাইদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

ওয়াসসালাম

সৈয়্যদ আব্দুল হাই

নাযের ইশাআত

(সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

প্রণয়ন ও প্রকাশনা বিভাগের

নির্বাহী প্রধান)

১লা ফেরুয়ারী, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

# পাদ্রী সোফ্‌ট সাহেবের নামে

[এটি এক প্রচীন চিঠি যা পাদ্রী সোফ্‌ট সাহেবের নামে লিখা হয়েছিল। এ পাদ্রী সাহেব গুজরাঁওয়ালায় বাস করতেন। খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিদ্যায় সাধারণ পাদ্রীদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠতার দাবী ছিল। আফসোস, এ পত্রটির অনুলিপিকারকও এর সন-তারিখ লেখার অতি আবশ্যকীয় বিষয়টিতে সংকোচ করেন। তবে নিঃসন্দেহে এটি ১৮৮৪ সালের পরের লেখা নয়। যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর দাবী সমূহে সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবভঙ্গী ও অকৃত্রিম উপস্থাপনায় যে সদা অটল-অবিচল ছিলেন এ পত্রটি তারই এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর এবং তাঁর বিরুদ্ধে বানোয়াট ও মিথ্যা বানিয়ে বলার আপত্তি খন্ডনে এটি এক অতি শক্তিশালী প্রমাণ। 'ওয়া আল-হামদু লিল্লাহে আলা যালেক' (আর এজন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার) –সম্পাদক]।

'হায়াতে আহমদ' গ্রন্থের ২য় খন্ড, ৩য় অধ্যায়ে ১৩৫ পৃষ্ঠায় হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী আরও লিখেছেন :

## বছর কালীন সময়ে নিদর্শন দেখানোর ঘোষণা এবং খ্রিষ্টানদের ভূমিকা :

বছর কালীন সময়ে ঐশী নিদর্শন দেখানোর সম্পর্কে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর আহ্বান ও ঘোষণা প্রসঙ্গে আমি বর্ণনা করেছি যে তাৎক্ষণিকভাবে এর মোকাবিলায় দাঁড়ানোর মত কোন প্রতিক্রিয়া খ্রিষ্টানদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু ইন্দ্রমন (আর্য সমাজী) ও অন্যান্যদের সম্পর্কে যখন ঘোষণা সমূহ প্রকাশিত হলো তখন একজন এ দেশীয় খ্রিষ্টান (পাদ্রী) মিঃ সোফ্‌ট এ মোকাবিলার সম্পর্কে হযরতকে একটি চিঠি লিখেন এবং এতে নিজ সম্মতি ও প্রস্তুতির কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল তার পলায়ন।

এ প্রসঙ্গে পাদ্রী সোফ্‌টকে প্রতিউত্তরে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) যে পত্রটি লিখেছিলেন তা আমি 'মকতুবাতে আহমদীয়া'-এর ৩য় খন্ডে ছেপে দিয়েছিলাম। চিঠিটিতে যেহেতু কোন তারিখ ছিল না সেহেতু তখন আমার ধারণা ছিল এটি সম্ভবত ১৮৮৪ইং সালে লেখা হয়েছিল। কিন্তু হযরতের উত্তর মূলক এ পত্রটিতে জানা যায় এটি সেই বছরকালীন সময়ে নিদর্শন দেখানোর সাথে সম্পর্কিত। কাজেই এটি ১৮৮৫ইং সনের শেষার্ধেরই হতে পারে।

## পাদ্রী সোফ্‌ট কে ছিলেন?

এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একজন এ দেশীয় খ্রিষ্টান ছিলেন। তার নাম ছিল রামচন্দ্র (মাষ্টার রামচন্দ্র অর্থ)। তিনি গোয়ালিয়ার স্টেটের বাসিন্দা ছিলেন। খ্রিষ্টান হওয়ার পর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে সোফ্‌ট রাখেন যাতে করে তিনি তাঁর খ্রিষ্টধর্ম বা পূর্বজীবনকে আড়াল করে রাখতে পারেন। এ ব্যক্তি পরবর্তীতে শাহারানপুর ইত্যাদি জায়গার খ্রিষ্টধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে (প: পাঞ্জাবের) গুজরাঁওয়ালায় নিযুক্ত হন। তাঁর নিজ ধর্মীয় জ্ঞান-গরিমায় ভীষণ গর্ব ছিল। তিনি সেই সস্তা খ্যাতি অর্জনের জন্য হযরতকে তাঁর সে ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে শর্তযুক্ত চিঠি লিখেছিলেন।

হযরত আকদাসের উত্তর ও পাদ্রী সোফ্‌টের নীরবতা :

হযরত আকদাস এর যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি নিম্নে সেটি উপস্থাপন করছি। এ উত্তরটি পাওয়ার পর পাদ্রী সাহেব নীরব হয়ে যান। আর এভাবেই খ্রিষ্টান জাতির ওপর 'ইতমামে হুজ্জত' (যুক্তি প্রমাণের পূর্ণতা) সাধিত হয়।

## পত্র নম্বর ১

পাদ্রী সোফ্‌ট সাহেবের নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

যথাযথ সম্ভাষণের পর। ডাকযোগে আপনার তারিখবিহীন পত্রখানা আমি পেয়েছি। এতে আপনি শুরুতেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কল্পকাহিনীর কথা তুলে দিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও মালিক সর্বশক্তিমান খোদা হলেন হযরত মসীহ্ এবং তিনিই পরিত্রাতা। কিন্তু একজন ভৌতিক দেহের আদম সন্তান, বিনীত ও অক্ষম বান্দার সম্পর্কে আপনারা ধারণা করে বসেন সে-ই কিনা আপনাদের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব প্রতিপালক, আমি চিন্তা করি, এটা কী করে আপনাদের মনঃপূত হয়ে যায়? এতে কী করে আপনাদের প্রবৃত্তি সায় দেয়? হযরত মসীহর সম্পর্কে আপনাদের এমনটি ধারণা করা ঠিক তেমনই যেমন হিন্দুরা রাজা রামচন্দ্র সম্পর্কে ধারণা করে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে হিন্দুরা কৌশল্যার ছেলেকে তাদের পরমেশ্বর বানাচ্ছেন। আপনারা হযরত মরিয়ম সিদ্দীকার পুত্রকে বানাচ্ছেন।

রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ আকাশ ও পৃথিবীর কোন এক কণা পরিমাণও সৃষ্টি করেছেন বলে হিন্দুরা যেমন কখনও প্রমাণ করে দেখান নি তেমনি আজ পর্যন্ত আপনারাও হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে এর কোন প্রমাণ দেখান নি।

আক্ষেপ! মেধা, বিবেকবুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মচিন্তা বোধ ও মনন-এর সহজাত যেসব শক্তি ও ক্ষমতায় আপনাদের প্রকৃতিকে ভূষিত করা হয়েছিল আপনারা সেগুলোর এক কণা পরিমাণও কদর ও মূল্যায়ন করেন নি। আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনাদি পড়ে ও চর্চা করেও সবই ডুবিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের আলো আপনাদের হৃদয়কে একটুও ছুঁতে পারেনি। সরলতা ও অজ্ঞতার যুগের মনগড়া বিষয়গুলোকেই আপনারা এখন পর্যন্ত নিজেদের জীবন বিধান বানিয়ে রেখেছেন। হায়! হযরত মসীহ্, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইত্যাদি, সৃষ্টিপূজারী লোকেরা যাঁদের খোদা বানিয়ে রেখেছে, তাঁরা যদি এ যুগে দুচার দিনের জন্য দুনিয়াতে নিজেদের দর্শন দিয়ে যেতেন, যাতে এ লোকদের অন্তরে নিহিত সহজাত বিচারশক্তি এদের অভিযুক্ত করতো, 'এই আদম সন্তানদের কি খোদা বলে ডাকা উচিত!' অদ্ভুত ব্যাপার যে আপনাদের বিশ্বাসে পুঞ্জিভূত এ যাবতীয় লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আপনারা আবার দাবী করেন আপনাদের এসব বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত! আমি অবাক হচ্ছি, খোদা কিনা তাঁর আদি ও অপরিবর্তনীয় প্রতাপ (জালাল) পরিত্যাগ করে এক নারীর গর্ভে অবতরণ ও নাপাক পথে জন্মগ্রহণ করেছেন ও দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। কেবল তাই নয় বরং তিনি তিনজনও আবার একজনও। তিনি পূর্ণমানবও, আবার পূর্ণখোদাও। যারা এসব বিশ্বাস রাখেন তারা তাদের এ জাতীয় বিশ্বাসকে কী করে যুক্তিযুক্ত বলে সাব্যস্ত করতে পারেন? এমন দর্শন কোন্‌টি যার মাধ্যমে তারা এসব আজে বাজে কথাকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন?

আবার এ-ও লক্ষ্য করা গেছে, আপনারা যখন নিজেদের খেয়াল-খুশি মত গড়া বিশ্বাসের সত্যতা যুক্তিগতভাবে প্রমাণ করতে পারেন না তখন নিরুপায় হয়ে কিতাবের বর্ণনার দিকে ধাবিত হন এবং বলেন, 'এসব বিষয় আমরা পূর্ববর্তী পুস্তকে অর্থাৎ বাইবেলে দেখেছি আর এজন্যই এসব বিষয় আমরা মানি'। কিন্তু এ উত্তরটিও সম্পূর্ণ অবান্তর ও অর্থহীন। কেননা এসব পুস্তকে কখনো এ কথা লিপিবদ্ধ নেই যে হযরত মসীহ্ খোদার (জাত) পুত্র অথবা তিনি স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক (রাব্বুল আলামীন) এবং অন্য সব মানুষ তাঁর বান্দা। বরং বাইবেলে গভীর মনোনিবেশকারী মাত্রই ভালভাবে জানেন, খোদার পুত্র বলে কাউকে ডাকা– এটা এসব পুস্তকের সাধারণ বাগধারা। বরং কোন কোন জায়গায় 'খোদার কন্যাগণ'ও লিখা আছে। আর এক জায়গায় এ-ও লিখা আছে: 'তোমরা সবাই

খোদা'। অতএব এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কী থাকলো?

তাছাড়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই জানেন, কিতাবের বিবরণ ও খবরাদিতে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের কিতাবাদি যে পরিমাণ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং যেসব হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের বিষয় তারা নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছেন– এ সব কারণে উক্ত আশঙ্কা ও সম্ভাবনা অধিকতর জোরালো সাব্যস্ত হয়।

আর এ-ও আপনাদের চিন্তা করা উচিত, যথাযথ প্রমাণ ছাড়া প্রত্যেক লেখা যদি নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে, তাহলে আবার আপনারা সেই সব গালগল্পকে কেন নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, যা হিন্দুদের পুস্তকাদিতে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইত্যাদির অলৌকিক কান্ড ও তাদের বড় বড় কীর্তি সম্পর্কে এখনও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়, যেমন মহাদেবের কেশকুন্ডলি থেকে গঙ্গানদী নির্গত হওয়া, মহাদেবের পাহাড় উত্তোলন করা আর তেমনি অর্জুনের ভাই রাজা ভীমের মোকাবেলায় মহাদেবের কুস্তির জন্য আসা। এ সম্পর্কে পুরাণে এ কল্পকথা লিখা আছে যে, মহাদেবজী মালঞ্চের রূপ ধারণ করে রাজা ভীমের সামনে এসে দাঁড়ান। ভীম তার সঙ্গে লড়তে চান। কিন্তু মহাদেবজী দৌড়ে পালালেন। ভীম[১] তাকে ধাওয়া করলেন। তখন তিনি (মহাদেব) মাটির নিচে ঢুকে গেলেন। এটা দেখে ভীম সজোরে তার লেজ ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'এখন আমি আর যেতে দেবো না'। সুতরাং লেজ ও শরীরের পেছন অংশ তো ভীমের হাতের মুঠোয় থেকে গেলো এবং মুখ নেপালের পাহাড়ে গিয়ে বেরুলো। এ কারণে মুখের পূজা নেপালে হয়ে থাকে এবং লেজ ও দেহের পেছনের অংশের পূজা কেদারনাথে অনুষ্ঠিত হয়।

এখন লক্ষ্য করুন, যে আকীদা-বিশ্বাস আপনারা বানিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ খোদা তাআলার রূহ (আত্মা) হযরত মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর সেটি এক নতুন রূপ ধারণ করে (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ হয়ে যায়–অনুবাদক)। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণ খোদা বনে যান। আবার পূর্ণ মানবও হয়ে যান। এ কল্পকাহিনীটি কি ভীম ও মহাদেবের কল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম?

তারপর আপনারা এ-ও দাবী করেন, মসীহ্র প্রায়শ্চিত্তে ঈমান রাখায় আপনাদের নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে নাজাত বা পরিত্রাণের কোন আলামত ও লক্ষণ দেখতে পাই না। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে দেখিয়ে দিন, ঐশীগ্রহণযোগ্যতার জ্যোতি, আশিস ও

১. রাজা যুধিষ্ঠির-এর ছোট ভাই শিব (উর্দু-হিন্দি অভিধান)

বরকত-এর কী কী নিদর্শন আপনাদের মাঝে দেখা যায়, যেগুলো থেকে অন্যান্য লোক বঞ্চিত হয়ে আছেন? আমি এটা মানি, ঈমানদার ও বেঈমান এবং নাজাতপ্রাপ্ত ও অনাজাতপ্রাপ্তদের মাঝে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। কিন্তু পাদ্রী সাহেব! আপনি নারাজ হবেন না। যেসব চিহ্ন ও লক্ষণ ঈমানদারদের মাঝে হয়ে থাকে ও হওয়া উচিত এবং যেগুলো হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামও ইঞ্জিলের দু'তিন জায়গায় লিখেছেন সেগুলো আপনাদের মাঝে আমি খুঁজে পাই না। বরং সে সব চিহ্ন ও লক্ষণ সত্যিকার মুসলমানদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। আর সদা সর্বদা তাদের মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে। আর সেসব চিহ্ন ও নিদর্শনই প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে এ অধম আপনাদের খিদমতে রেজিস্ট্রিকৃত পত্র দিয়েছে ও বিশ হাজার প্রচারপত্র বিতরণ করেছে। এর পূর্ণ প্রচার ও 'ইতমামে হুজ্জত' তথা যুক্তিপ্রমাণের পূর্ণতা সাধনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করা হয়নি যাতে খোদার কৃপায় সত্য অনুধাবন ও অবলোকনের জন্য আপনারা উৎসাহিত হন। খোদার কাছে গ্রহণীয় ও প্রত্যাখ্যাতদের মাঝে যে পার্থক্য থাকা উচিত তা যেন আপনারা স্বচক্ষে দেখেন আর যাতে উত্তম বৃক্ষের উত্তম ফল ও ফুল আপনারা নিজেরা দেখে নেন। কিন্তু আফসোস! আমার এত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আপনাদের মাঝ থেকে কোন একজনও ময়দানে বেরিয়ে এলেন না। এখন আপনি চিঠি লিখেছেন। দেখা যাক, এর কী পরিণাম হয়।

আপনি আপনার চিঠিতে তিনটি শর্তের কথা লিখেছেন। প্রথমে আপনি লিখেছেন ছয় শ' টাকা অর্থাৎ তিন মাসের বেতন আপনাদের কাছে গুজরাঁওয়ালায় অগ্রিম পাঠানো হোক। এ ছাড়া বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব এ অধমের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং এতে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করা মাত্র তৎক্ষণাৎ আপনি গুজরাঁওয়ালা ফিরে যাবেন। আর যে টাকা (অগ্রিম) পেয়ে থাকবেন তা এ অধমের ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থাকবে না। এ হলো প্রথম শর্ত যা আপনি লিখেছেন। কিন্তু বিনীতভাবে নিবেদন করা যাচ্ছে, বিতর্কিত যে বিষয়ে পরাজিত হওয়ার দরুন টাকা প্রদানের স্বীকৃতি রয়েছে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থায় আপনি টাকা পেতে পারেন না। তবে অবশ্যই এ টাকা আপনার প্রবোধ ও মনের সান্ত্বনার জন্য কোন সরকারী ব্যাংকে জমা দেয়া যেতে পারে অথবা কোনো মহাজনের কাছে গচ্ছিত রাখা যেতে পারে। মোটকথা (আপনার) যেভাবেই ইচ্ছা টাকার ব্যাপারে আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি। কিন্তু আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না। আর এ বিষয়টি অতি সত্য ও ন্যায়সঙ্গতও বটে যে, উভয় পক্ষের মাঝে (বিতর্কিত) যে বিষয়টি মীমাংসাযোগ্য এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টাকা কোন মধ্যস্থতাকারী সালিসের হাতে থাকা উচিত। আশা করি, আপনি যেমন সত্যান্বেষী, তেমনি এ বিষয়টিও বুঝে যাবেন এবং এর বরখেলাপে জিদ ধরবেন না।

আর এ শর্তেরই দ্বিতীয় অংশে আপনি লিখেছেন, বাসস্থান (গৃহ) ইত্যাদির বিষয়ে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ আপনি গুজরাঁওয়ালা ফিরে যাবেন এবং যে টাকা জমা রাখা হবে তা আপনার হয়ে যাবে। আপনার এ শর্তটিও এতো ব্যাপক ওজর ও জটিল ব্যাখ্যাসম্পন্ন যে এক ওজরে মানুষ অনেক কিছুরই অবকাশ পেতে পারে। কেননা ঘর কেন, প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষণ করা অতি সহজ। আপনি বলতে পারেন, এখানকার আবহাওয়া আপনার অনুকূল নয়, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ঘরটিতে অনেক গরম, অমুক জিনিস আপনি সময়মত পান না, অমুক অমুক আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ঘরটিতে অনুপস্থিত ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন এই প্রকারের ছিদ্রান্বেষণের কতটাইবা প্রতিকার করা যাবে? অতএব এ ব্যাপারটির এভাবে ব্যবস্থা হতে পারে যে, আপনি নিজে দুএক দিনের জন্য কাদিয়ানে এসে বাসস্থান ভালভাবে দেখে নেন এবং নিজের প্রয়োজনাদির বিষয়ে সামনা সামনি আলোচনা ও মীমাংসা করে নেন, যাতে আমি আমার যতটুকু সাধ্যে কুলোয় আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে চেষ্টা করতে পারি। এর পরে যেন ছিদ্রান্বেষণের অবকাশ না থাকে। তাছাড়া এ অধম তো কখনো এমনটি দাবী করে না যে, কোন ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে নিজ বাড়ীতে রেখে তার নফসে্-আম্মারার (কুপ্রবৃত্তিমূলক) সুখ ও আনন্দ এবং আরাম করার যেসব উপকরণ সে চাইতে থাকবে তা সবই তার জন্য আমি সরবরাহ করতে থাকবো। বরং এ বিনীত বান্দার অঙ্গীকার হচ্ছে, যে ব্যক্তিই এ অধমের কাছে আসবেন তাঁকে নিজ গৃহের ভাল জায়গা ও নিজ খাবার অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হবে এবং যেভাবে একজন আত্মীয় ও প্রিয় অতিথির যথাসাধ্য আদর-আপ্যায়ন করা হয় সেভাবে তাঁরও করা হবে। নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর সাথে আচার ব্যবহার বজায় রাখা হবে। খাওয়া-দাওয়ায় নিজের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি খেয়াল রাখা হবে। তাঁর যদি এ ধরনের কোন কষ্ট হয় যা এ গ্রামের অধিবাসী হয়ে আমরা সয়ে থাকি এবং যা দূর করা আমাদের সাধ্যাতীত হয় তাহলে সে কষ্টে আমাদের অতিথি আমাদের সাথে শরীক থাকবেন।

আর এ বিষয়টি আপনি বুঝুন বা না বুঝুন কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন, আমরা যখন মাসোহারা দু'শত টাকা দেয়া স্বীকার করে নিয়েছি এবং তা পরিশোধ করার জন্য সর্বত আশ্বাসের ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। তখন প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষতি পূরণের দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের (আসল) কর্তব্য সম্পন্ন করেছি। এরপর বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের যে প্রস্তাবনা, তা নিছক অতিরিক্ত বিষয়াদির শামিল, যা আমরা কেবল উত্তম নৈতিকতাস্বরূপ নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে বরণ করে নিয়েছি। নচেৎ প্রত্যেক

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই জানেন, যে ব্যক্তিকে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ তার অবস্থা অনুযায়ী বরং তার চেয়েও বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তার পক্ষে এরপরও আরো কোন কিছু দাবী করা অসঙ্গত। সে যদি অধিক আরামপ্রিয় ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুরাগী হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে সমীচীন হবে সে যেন নিজে এর ব্যবস্থা করে নেয়। যেমন, সে অন্য কোন জায়গা থেকে চাকরি বাবদ দু'শত টাকা নগদ পেলে সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতো। মোটকথা ক্ষতিপূরণ বাদেও আমাদের পক্ষ থেকে কারও যদি খেদমত (আদর-আপ্যায়ন) করা হয়, সেজন্য তার তো আমাদের কৃতার্থ হওয়া উচিত। কেননা আমরা আসল শর্ত পূরণ করা ছাড়াও তাকে অতিথি হিসেবে রেখেছি। কাজেই তার পক্ষে উল্টো ছিদ্রান্বেষণ করা সমীচীন নয়। কেননা এটা ভদ্রতা, শালীনতা, নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী।

আর আমার কাছে অতি আশ্চর্যজনক বলে মনে হলো, যেসব শর্ত আপনি তুলে ধরেছেন সে রকম যদি কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য কোন ব্যক্তি তুলে ধরতো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু আপনারা তো নিজেরা হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালামের খাদেম ও অনুগামী বলে আখ্যায়িত এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার দাবীদার। অতএব এটা কত বড় ভুল যে আপনারা হযরত মসীহ্র চরিত্র ও আদর্শকে পরিহার করেন। আপনারা কি জানেন না, হযরত মসীহ্ একজন অতি বিনয়ী ও মিসকীন-দরবেশ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর সারা জীবন নিজের জন্য কোন ঘরবাড়ী বানাননি এবং বিলাসিতার কোন প্রকার আসবাবপত্র সংগ্রহ করেননি। তাহলে আপনিই বলুন, তাঁকে অনুসরণ করা আপনার জন্য আবশ্যিক কি না? যতক্ষণ আপনাদের জীবনযাত্রা হযরত মসীহ্র জীবন যাত্রার নমুনায় ও দৃষ্টান্তে পরিণত না হয় ততক্ষণ আপনারা কী করে বলতে পারেন আপনারা হযরত মসীহ্র সত্যিকার অনুসারী? অতএব এখন আপনারা ভেবে দেখুন, আমাকে আপনারা প্রথমেই যে নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য শর্তাবলী দিচ্ছেন তা কত অবান্তর ও অসঙ্গত! আপনারা জেনে রাখুন এ অধম মসীহ্র জীবনাদর্শে পরিচালিত। কোন বাগান-ঘেরা বিলাসবহুল বাড়ী আমার নেই। এ অধমের বাসস্থান সেই প্রকারের ভোগ বিলাসের স্থান হতে পারে না, যে দিকে জগৎপূজারী লোকদের প্রবৃত্তি ধাবিত ও অনুরক্ত। তবে আমার পদমর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথিদের জন্য একান্তভাবে আল্লাহ্র খাতিরে গৃহাদি নির্মাণ করা আছে। যতটুকু সাধ্যে কুলোয় এ অধম তাদের সেবা-যত্নের জন্য উদগ্রীব ও প্রস্তুত রয়েছে। অতএব আপনি যদি এরকম গৃহে বাস করতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে প্রথমে এসে দেখে নেয়া উত্তম হবে। কিন্তু আপনি যদি বিলাসিতাপ্রিয় লোকদের মত আমার কাছে আবদার করেন আপনার জন্য এমন

এক শীশমহল দরকার যা বিলাসিতার সামগ্রী এবং যত্রতত্র টানানো ছবির দ্বারা সজ্জিত থাকবে। নেশায় মত্ত এমন পানীয় দিয়ে বোতল ভরা থাকবে। গৃহের চারদিক নয়নাভিরাম বাগান, এর চারপাশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দশ-বিশজন পরিচারক কৃতদাসদের ন্যায় উপস্থিত থাকবে। তাহলে এ ধরনের বাসগৃহ পেশ করতে আমি অপারগ। তবে একটি অনাড়ম্বর এবং উপরোক্ত বিলাসিতা মুক্ত বাসগৃহ মজুদ রয়েছে।

পুনরায় বলছি, জাঁকজমকপুর্ণ গৃহ ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিহার করা আপনাদের কর্তব্য, যাতে আপনাদের মাঝে হযরত মসীহ্র জীবনের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমি কখনো মনে করি না উক্ত গৃহ আপনার জন্য কষ্টদায়ক হবে। বরং আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত, একজন কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ব্যক্তি এ গৃহে বাস করে কোন অভিযোগ অনুযোগের কথা কখনো বলবে না। কেননা (বাসোপযোগী) প্রশস্ত গৃহ মজুদ এবং (এতে) চলার মত সবকিছু সহজলভ্য রয়েছে। আর এ-ও সম্ভবপর যে, গৃহ পরিদর্শনে আপনি যদি কয়েকটি সাধারণ ও সঙ্গত বিষয়ে আবদার করেন তাহলে তা-ও আল্লাহ্র রহমতে সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক প্রথমে আপনার (কাদিয়ানে) আসা অত্যাবশ্যক।

এরপর আপনি দ্বিতীয় শর্তটি লিখেছেন, 'ইলহাম ও মু'জিযার প্রমাণ এমন হওয়া চাই যেমন জ্যামিতি-র গ্রন্থে প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাতে করে আমাদের অন্তর মানতে বাধ্য হয়।' এ সম্পর্কে প্রথমত অধমের এ কথা স্মরণ রাখবেন, আমরা 'মুজিযা' শব্দ কেবল সেক্ষেত্রেই বলে থাকি যখন কোন অলৌকিক ক্রিয়া কোন নবী ও রসূলের প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু এ অধম[২] নবীও নয়, রসূলও নয়, (বরং) কেবল নিজ নির্দোষ নিষ্পাপ পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একজন নগণ্য সেবক ও অনুগামী মাত্র।

আর এ মহিমান্বিত রসুলেরই বরকত ও আশীর্বাদে এবং তাঁরই অনুবর্তিতার কারণে এসব ঐশী জ্যোতি, আশিস ও কল্যাণ প্রকাশিত হচ্ছে। অতএব এস্থলে 'কারামাত' শব্দটি সমীচীন। মু'জিযা শব্দটি নয়। এভাবেই আমাদের কথাবার্তায় প্রচলিত। আর (নিদর্শন দেখানোর ক্ষেত্রে) আপনারা যে জ্যামিতির মত প্রমাণ (দেখতে) চান এ সম্পর্কে নিবেদন, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহক্রমে যে উজ্জ্বল নিদর্শন আপনাদের দেখানো হবে এর তুলনায় জ্যামিতির প্রমাণাদি অতি তুচ্ছ। কেননা এগুলো কাল্পনিক চক্রভিত্তিক (হয়ে থাকে)। জ্যামিতির প্রমাণের অনেক

২. এটা তাঁর (আ.) সত্যতার প্রমাণ। যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাছে নবুওয়তের বিষয় স্পষ্টভাবে খোলাসা করে দেননি ততক্ষণ তিনি এর দাবী করেন নি (সম্পাদক)।

ক্ষেত্রে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। এ প্রমাণগুলোর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কেউ বললো, 'প্রথমে আপনি যদি প্রমাণ ছাড়াই কোন এক পশু সম্পর্কে স্বীকার করে নেন যে সেটি নোংরা আবর্জনা খেয়ে থাকে, মেঁ মেঁ শব্দ করে এবং এর গায়ে পশম আছে, তাহলে আমরা প্রমাণ করে দিব, সেটি হচ্ছে মেষ শাবক। তেমনি জ্যামিতির ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত প্রদানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ববিরোধ রয়েছে। যেমন, প্রথমে এটি নিজেই লেখে, বিন্দু সেই বস্তু যার কোন ভাগ নেই অর্থাৎ যা বিভাজ্য নয়। আবার এটি অন্যত্র নিজেই সাব্যস্ত করে, প্রত্যেক রেখার সমান সমান পরিমাণের দুটো টুকরো হতে পারে। এখন ধরুন, একটি সরলরেখা ৯টি বিন্দু সমন্বয়ে গঠিত আর জ্যামিতির উক্ত দাবী অনুযায়ী সে রেখাটিকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করতে চাই। এ ক্ষেত্রে হয়তো পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে একটি বিন্দুর দু টুকরো হয়ে যাবে। নয়তো প্রত্যক সরলরেখা দুটো সমভাগে বিভক্ত হতে পারে– জ্যামিতির এ দাবী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। মোটকথা জ্যামিতি শাস্ত্র বহু কাল্পনিক ও প্রমাণবিহীন বিষয়ে ভরপুর, যা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভালভাবে জানেন। কিন্তু ঐশী নিদর্শন তো সেই বিষয় যা স্বয়ং অস্বীকারকারীর সত্তায় কার্যকরী হয়ে তাকে 'হাক্কুল একীন' তথা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানে উপনীত করতে পারে। মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অতএব নিশ্চিত থাকুন, এসব অতি মহান ঐশী নিদর্শনের সাথে জ্যামিতির তুচ্ছ ধ্যান-ধারণার তুলনা করার কোন অবকাশ নেই। ***'চে নিসবাৎ খাক রা বা আলমে পাক'*** (পবিত্র ঊর্ধ্ব জগতের সাথে এ ধরার তুলনাই বা কী – অনুবাদক)। কেবল এ অধমের বর্ণনায় নয় বরং সালিসদের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। যতক্ষণ উভয় পক্ষের ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন সালিসগণ এসব অলৌকিক কান্ড ও ভবিষ্যদ্বাণী মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে বলে সাক্ষ্য না দেন ততক্ষণ আপনারা বিজয়ী এবং এ অধম পরাভূত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণী মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে হবার সমর্থনে সাক্ষ্য পাওয়া গেলে আপনারা পরাজিত এবং আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিজয়ী সাব্যস্ত হবো এবং তৎক্ষণাৎ এখানেই অর্থাৎ কাদিয়ানে আপনাদের ইসলামে দীক্ষিত (হয়ে মুসলমান) হতে হবে।

আপনি আবার চিঠির উপসংহারে লিখেছেন, 'উল্লেখিত শর্তগুলো আপনি গ্রহণ না করলে আপনার অবস্থান এবং এসব শর্ত ভারতবর্ষের কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে'। অতএব হে আমার মেহেরবান! যা যা সত্য ছিল তা সবই আপনার খিদমতে লিখে দেয়া হয়েছে এবং এ অধম আপনার অবস্থাবলী প্রকাশ করানো বা করায় ভয় পায় না। বরং কে জানে আপনার পক্ষ থেকে কবে ও কখন পত্রিকায় এ

বিষয় প্রকাশ করবেন। কিন্তু এ অধম তো আজই এ চিঠির অনুলিপি কয়েকটি পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠাচ্ছে। আর আপনাকে প্রথমেই এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিচ্ছে যাতে আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন না থাকে। এরপর যা কিছু আপনার পক্ষ থেকে প্রকাশ পাবে তাও বিশ দিন অপেক্ষা করার পর কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয়া হবে। আর আপনি যদি একটু আত্মাভিমানবোধ কাজে লাগিয়ে কাদিয়ানে চলে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন, দয়াময় মহান খোদা কার সাথে আছেন এবং তিনি কার সাহায্য ও সমর্থন করেন। আর তখন আপনার কাছে এটাও স্পষ্ট হয়ে পড়বে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি সত্য ও প্রকৃত খোদা কি বস্তুতপক্ষে মরিয়মপুত্র (মসীহ), নাকি অনাদি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও পরম পবিত্র সেই খোদা, যাঁর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। অতএব আমি আপনাকে সেই পরিপূর্ণ ও সর্বতসত্য খোদার কসম দিচ্ছি, আপনি আসুন, অবশ্য অবশ্যই আসুন। উক্ত কসম আপনার হৃদয়ে যদি প্রভাব বিস্তারে কার্যকরী না হয়ে থাকে তাহলে যুক্তি ও অভিযোগের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আপনাকে হযরত মসীহ্র কসম, আপনি আসতে একটুও বিলম্ব করবেন না, যাতে সত্য ও মিথ্যার মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রকটিত হয় এবং সত্যবাদী ও মিথ্যেবাদীদের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়কারী বিষয় আপনাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়। 'ওয়াস্সালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা' (–সত্যপথ অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক– অনুবাদক)

بوقت صبح شود ہچو روز معلومت  کہ باکہ باختۂ عشق در شب دیجور
من ایستادہ ام ایک تو ہم بیاشتاب  کہ تا سیاہ شود روئے کاذب مغرور

উচ্চারণ ঃ বে ওয়াকতে সুবহ সাওয়াদ হামচু রুযে মা'লুমাত,  কেহ বা কেহ বাখতেইয়ে ইশক দার শাব দিজুর
মান ইসতদেহ আম ইনকে তো হাম বেয়া বেশেতাব,  কেহ তা সিয়াহ শাওয়াদ রুয়ে কাজেব মাগরুর।

ভাষান্তর ঃ প্রতিদিনের ন্যায় প্রভাত হয়েছে
আর রাতের আধারে প্রেম বিনষ্ট হয়ে গেছে
তুমি দেখ আমি দাঁড়িয়ে আছি আর তুমিও দ্রুত এসো
যেন মিথ্যাবাদী এবং অহংকারীর মুখ কালো হয়ে যায়।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী
বিনীত, মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান
জেলা- গুরুদাসপুর[৩]

৩. আল হাকাম, ২৪ জুন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩-৬

## পত্র নম্বর ২

# একজন খ্রিষ্টানের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

একজন খ্রিষ্টান ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন 'আঞ্জুমান হিমায়াতে ইসলাম, লাহোর'এর মাধ্যমে করেছিলেন। আঞ্জুমান সে প্রশ্নগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীনের কাছে পাঠায়। প্রভু ও দাস সেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে আঞ্জুমানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু একজন খ্রিষ্টানের চিঠির উত্তর একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল কাজেই সেসব প্রশ্নসহ উত্তর প্রকাশ করা গেল। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (-সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'আল-হাকাম')।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ .

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ

*["বাল্ হুয়া আয়াতুম বাইয়েনাতুন ফি সুদূরিল্লাযীনা উতুল ইল্মা" (সূরা আনকাবূত : ৫০)*

(অর্থ : আসলে যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে এ (কুরআন) তো তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে অঙ্কিত রয়েছে।)]

কয়েক দিন হলো, আব্দুল্লাহ্ জ্যেমস্ নামী একজন খ্রিষ্টান ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আঞ্জুমানকে উত্তর দানের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অতএব সেগুলোর উত্তর এ আঞ্জুমানের তিনজন সম্মানিত সুযোগ্য প্রভাবশালী ও সাহায্যকারী সদস্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা যথাযথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

**১ম প্রশ্ন :** নিজের নবুওয়ত এবং কুরআন মজীদের আল্লাহ্র কালাম (বাণী) হওয়ার বিষয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সন্দিহান হওয়া যেমন সূরা বাকারার ১৪৮ আয়াতে এবং সূরা আনআমের ১১৫ আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে: فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ *'ফালা তাকুনান্না মিনাল মুমতারীন* (-তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না-অনুবাদক)। এতে প্রমণিত হয় যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজ অন্তরে নিশ্চিত জানতেন, তিনি খোদার পয়গম্বর নন। তিনি যদি খোদার পয়গম্বর হতেন অথবা তিনি কখনও কোন মু'জিযা দেখাতেন কিম্বা (তাঁর) মে'রাজ হতো অথবা জিবরাঈল (আ.) কুরআন মজীদ আনতেন, তাহলে তিনি তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে কখনও সন্দিহান হতেন না। এতে কুরআনকে অস্বীকার করা এবং তাঁর নবুওয়তে সন্দিহান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই তিনি আল্লাহ্র রাসূল নন।

**১ম প্রশ্নের উত্তর :** আপত্তিকারী প্রথমে তার দাবীর স্বপক্ষে সূরা বাকারাহ্ থেকে যে (১৪৮ নম্বর) আয়াতের অংশবিশেষ পেশ করেছেন, পূর্ণাকারে সে আয়াতটি হলো : اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ **'আল্ হাক্কু মিররাব্বিকা ফালা তাকুনান্না মিনাল মুমতারীন"** (অর্থ 'এটাই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, অতএব তুমি কখনও সন্দিহান হবে না'–অনুবাদক)। এ আয়াতটির পূর্বাপর অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, এখানে নবুওয়ত ও কুরআন করীমের কোন উল্লেখ নেই। কেবল এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে যে এখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নয় বরং বায়তুল্লাহ্ কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া উচিত। অতএব আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এ আয়াতটিতে বলেছেন, এটাই সত্য বিষয় অর্থাৎ খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া (প্রকৃত) সত্য, যা সূচনা থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এর বর্ণনা রয়েছে। অতএব তুমি (হে এ কিতাবের পাঠক!) এ বিষয়ে সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৪] অতঃপর এ আয়াতের পরেও একই বিষয় সম্পর্কে আয়াতগুলো রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

**"ওয়া মিন হাইসু খারাজতা ফা-ওয়াল্লে ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদিল হারা-ম ওয়া ইন্নাহু লাল-হাক্কু মিররাব্বিকা"** (–আল বাকারা : ১৫০)। অর্থাৎ 'যে দিক থেকেই তুমি বের হও তুমি খানা-কা'বার দিকেই নামায পড়। এটাই তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত সত্য।'

মোট কথা, এটা সুস্পষ্ট যে এসবগুলো আয়াত কেবল খানা কা'বারই সম্পর্কে। অন্য কোন কিছুর প্রসঙ্গে নয়। আর খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্য যে এ আদেশটি দেয়া হয়েছে এটি যেহেতু এক সাধারণ আদেশ, সকল মুসলমানই এ আদেশের আওতাভুক্ত। কাজেই এ সর্বব্যাপক আদেশের কারণে কোন কোন সন্দেহ-সংশয়প্রবণ লোকের সন্দেহ দূর করার জন্য এ আয়াতগুলোতে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তারা যেন এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার না হয় যে পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পড়তে এখন সহসা সে দিক থেকে সরে কেন খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে শুরু করা হলো? কাজেই আল্লাহ্ বলেন, এ কোন নতুন বিষয় নয়, বরং এটি হচ্ছে সেই

৪. এখানে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং ইঞ্জিলেও কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ইঙ্গিতদান করা হয়েছে। দেখুন যোহন : ২২–২৪ : 'যীশু তাকে বললো, হে মহিলা আমার কথায় বিশ্বাস রাখ, সে মুহূর্ত আসন্ন যখন তুমি এ পাহাড়টিতে এবং জিরোশালিমেও পিতার উপাসনা করবে না।'

সুনির্ধারিত বিষয়। এ সম্পর্কে খোদা তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। অতএব এতে সন্দেহ পোষণ করো না।

আপত্তিকারী নিজ দাবীর সমর্থনে যে দ্বিতীয় আয়াতটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি সূরা আনআমের একটি আয়াত। যা এর সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ সহকারে এভাবে রয়েছে:

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

**"আ-ফা গাইরাল্লাহি আবতাগি হাকামাও ওয়া হুয়াল্লাযি আনযালা ইলাইকুমুল কিতাবা মুফাসসালা ওল্লাযীনা আতাইনা হুমুল- কিতা-বা ইয়া'লামুনা আন্নাহু মুনাযযালুম মিররাব্বিকা বিল হাক্কি ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন"** (সূরা আনআম : ১১৫)। অর্থাৎ আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হাকাম (–ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী) অন্বেষণ করবো? অথচ তিনিই সুবিন্যস্ত কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যাদেরকে আমরা কিতাব তথা কুরআন দান করেছি অর্থাৎ যাদেরকে কুরআনের (প্রকৃত) জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়েছি তারা ভালভাবে জানে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে (অবতীর্ন)। অতএব হে পাঠক! তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" এখন এ আয়াত সমূহে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার জানা যায় যে **"ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন** (–অতএব সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না')–এ আয়াতে সম্বোধিত ও লক্ষীভূত হচ্ছে সেই সব লোক, যারা এখনও দৃঢ়বিশ্বাস, ঈমান ও প্রকৃত জ্ঞানের সামান্যটুকুই আয়ত্ত করেছে। বরং উপরের আয়াতগুলো থেকে এ-ও প্রতিভাত হয় যে, এ স্থানে **'ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন'** সম্বলিত নির্দেশটি খোদার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্তি যা কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আয়াতের সূচনায় উক্ত আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে বাক্যটি রয়েছে অর্থাৎ **'আ-ফা গাইরাল্লাহি আবতাগি হাকামান'** (–আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন 'হাকাম' চাইতে পারি–অনুবাদক) এটি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই বাক্য বা উক্তি। অতএব সমগ্র এ আয়াত গুলোর প্রাঞ্জল অনুবাদ হচ্ছে : "আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন 'হাকাম' নির্ধারণ করতে পারি না। যিনি আমার এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সে যে তিনিই যিনি তোমাদের প্রতি সুবিন্যস্ত কিতাব নাযিল করেছেন। অতএব যাদেরকে এই কিতাবের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে এর সমাগত হওয়ার বিষয়ে ভালভাবে জানে। অতএব (হে জ্ঞানহীন ব্যক্তি!) তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

এখন গবেষণায় প্রতীয়মান হলো যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে সন্দেহ পোষণ করেন না। বরং তিনি সন্দেহ পোষণকারীদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ওরূপ করতে নিষেধ করেন। অতএব এরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নিজ রিসালত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কথা আরোপ করা নিছক অজ্ঞতা ও জ্ঞানশুন্যতা অথবা শুধুশুধু বিদ্বেষ ও আক্রোশ নয় তো অন্য কী-ই বা হতে পারে?!

অতঃপর কারও মনে যদি এ ধারণার উদ্রেক হয় যে সন্দেহ পোষণ করা থেকে দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিম বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বারণ করা হয়ে থাকলে তাদেরকে তো 'তুমি' না বলে 'তোমরা সন্দিহান হয়ো না' বলা উচিত ছিল। কারণ দুর্বল ঈমানের মানুষ কেবল একজন নয়, বরং অনেক হয়ে থাকে। কাজেই বহু বচনের পরিবর্তে প্রথম পুরুষ এক বচনে সর্বনাম কেন ব্যবহার করা হলো? এর উত্তর হলো, এই এক বচন দ্বারা শ্রেণীমূলক এক বচন বুঝায়, যা জামাত (দল) অর্থ বহন করে থাকে। আপনারা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন পড়েন তাহলে বেশির ভাগ স্থলে জামাত বা দলকে একজন ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করার সাধারণভাবে প্রচলিত এ বাগধারাটি দেখতে পাবেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ এ আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا
مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا
كَرِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

**"লা তাজ্আল মায়াল্লাহে ইলাহান আ'খারা ফাতাক্উদা মায্মূমাম মাখ্যূলা। ওয়া কাযা রাব্বুকা আন্লা তা'বুদূ ইল্লা ইইয়াহু ওয়া বিল ওয়া- লিদাইনে ইহ্সানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলা-হুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ্ফিওঁ ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা ওয়াখ্ফিয্ লাহুমা জানাহায্ যুল্লে মিনার রাহ্মাতে। ওয়া কুর রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়া-নি সাগীরা"** (সূরা বনী ইস্রাঈল: ২৩-২৫)

অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করবে না। যদি তুমি তেমনটি কর তাহলে তুমি লাঞ্ছিত ও পরিত্যাক্ত হয়ে পড়বে। আর আমার খোদা এটাই চেয়েছেন, তোমরা যেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য না হোক। আর তুমি মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার সামনে (তথা জীবদ্দশায়) তারা উভয়ে বা তাদের একজন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে 'উহ্'-ও বলো না। এবং তাদেরকে বকা-ঝকা করবে না; বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র ও সম্মানসূচক কথা বলবে। আর তুমি মমতা ভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। এবং দোয়া কর, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিল।'

এখন লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্ট এ পথ নির্দেশনা রয়েছে যে এ এক বচনের সম্বোধনটি সমগ্র উম্মতের জন্য রয়েছে। এদেরকেই এ আয়াতগুলোতে অনেক বার 'তুমি' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলোতে সম্বোধিত নন। কারণ এ আয়াতগুলোতে মাতাপিতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ রয়েছে। আর এ তো স্পষ্ট (সুবিদিত) যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাতাপিতা তাঁর শৈশবকালে বরং মাতৃদুগ্ধপানকালীন সময়েই মারা গিয়েছিলেন। অতএব এ (আয়াত) থেকে এবং অন্যান্য আরও আয়াত থেকেও সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, জামা'ত বা সমষ্টিকে এক বচনে সম্বোধন করা কুরআন করীমের একটি সাধারণ ভাবে প্রচলিত বাগধারা। এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণিত হয়ে চলে যায়। এ বাগধারাটি তওরাতের আদেশগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এক বচন সম্বোধনসূচক শব্দের মাধ্যমে আদেশ দান করা হয় এবং এ দিয়ে বনী ইসরাঈলের জামাত বা সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন, যাত্রা পুস্তক ৩৩, ৩৪ অধ্যায়ে বাহ্যত হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : (১১) আজকের দিনে তোমাকে যে আদেশ দান করছি তা তুমি স্মরণ রেখো। (১২) তুমি সাবধান থেকো, যে দেশে (তথা ফিলিস্তিনে) তুমি যাচ্ছো সেখানকার অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ো না। (১৭) তুমি ভেঙ্গে ফেলা উপাস্যগুলোকে নিজের জন্য (আবার) গড়ো না।

এখন এ শ্লোকগুলোর পূর্বাপর লক্ষ্য করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এ শ্লোকগুলোতে যদিও হযরত মূসাকে সম্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এ আদেশগুলো দেয়া হয় নাই। হযরত মূসা

(আ.) তো কিনানেও (ফিলিস্তিনে) যান নাই এবং প্রতিমা পূজার ন্যায় খারাপ কাজ মূসা (আ.)-এর মত প্রতিমাভঙ্গকারী ঐশীপুরুষ কর্তৃক কী করেই বা সংঘটিত হতে পারতো, যে কাজটি থেকে তাকে বারণ করা হয়েছিল? কেননা মূসা (আ.) আল্লাহ্র সেই নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'তুমি আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং আমি তোমাকে তোমার নামেই চিনি। (দেখুন যাত্রা পুস্তক : ১৭ শ্লোক)।

অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এ পদ্ধতিটিই কুরআন করীমেরও। তওরাত ও কুরআন করীমে অধিকাংশ আদেশ এ আকারেই রয়েছে। বাহ্যত হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে সম্বোধন করে সে আদেশগুলো দেয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো উম্মত ও জাতিকে লক্ষ্য করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যারা এ গ্রন্থদ্বয়ের উক্ত বাগধারা সম্বন্ধে অবহিত নয় তারা অজ্ঞতাবশত এটাই মনে করে যে সে কথাগুলো নবীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টি এবং তৎনিহিত ইঙ্গিতসমূহের মাধ্যমে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে তাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তদুপরি যেসব আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণাঙ্গীন দৃঢ়বিশ্বাসের প্রশংসা করেছেন, সেসব আয়াতে দৃষ্টি দিলেও উক্ত আপত্তিটির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন হয়। যেমন এক জায়গায় বলেন, قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ **'কুল ইন্নি আলা বাইয়েনাতিম মিররাব্বি'** (আল আনআম : ৫৮)। অর্থাৎ তুমি বল, আমি আমার রিসালতের পক্ষে প্রকাশ্য প্রমাণ আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছি।' আবার অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, قُلْ هٰذِهٖ سَبِیْلِیْٓ اَدْعُوْٓا اِلَی اللّٰهِ ۣ عَلٰی بَصِیْرَةٍ **'কুল হা-যিহী সাবীলি আদউ ইলাল্লাহে আলা বাসীরাহ্'** (সূরা ইউসুফ : ১০৯) অর্থাৎ তুমি বল, এ হলো আমার পথ। আমি সন্দেহাতীত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি।' আরও এক আয়াতে বলেন,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا

**"ওয়া আনযালাল্লাহু আলাইকাল্ কিতা-বা ওয়াল্ হিকমাতা ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লামু ওয়া কা-না ফযলুল্লাহি আলাইকা আযীমা"**। (আন নিসা : ১১৪) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং হিকমত' তথা কিতাব ও রিসালতের সত্যতার যুক্তি প্রমাণ তোমার ওপর প্রকাশ করেছেন এবং তোমাকে সেই সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি নিজে নিজে জানতে পারতে না। বস্তুত তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র এক অতি মহান অনুগ্রহ।'

এরপর সূরা নাজ্‌মে আল্লাহ্ বলেন : مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى **'মা কাযাবাল ফুওয়া-দু মা-রায়া** (আন্ নাজম : ১২) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى **মা যা-গাল বাসারু ওয়া মা- তাগা। লাকাদ রায়া- মিন আয়া-তি রাব্বিহিল কুবরা** (আন্ নাজম : ১৮, ১৯)। অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয় তাঁর সত্যতার যে সব স্বর্গীয় নিদর্শন অবলোকন করেছিল তার কোন অংশেও অস্বীকার করেনি। অর্থাৎ সন্দিহান হয়নি অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি সত্যের ওপর নিবদ্ধ হয়ে গেল। আর নিশ্চয় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সুমহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিল।'

এখন হে পাঠকবৃন্দ! একটু ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখুন, হে সত্যের প্রেমিকগণ! সত্যপরায়ণতার মাধ্যমে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তাআলা কত পরিষ্কার ভাষায় সুসংবাদ দান করেন যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ নবুওয়তে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন এবং এক্ষেত্রে তাঁকে সুমহান নিদর্শনাবলীও দেখানো হয়েছিল। অতএব উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, সারা কুরআনে সামন্যতমও এবং এক বিন্দুও এমন কথা নেই যাতে প্রমাণ হতে পারে যে আঁ হযরত (সা.) তাঁর নবুওয়ত অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্কে এতটুকুও সন্দিহান ছিলেন। বরং সুনিশ্চিত ও অকাট্য সত্য হলো, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ আশিসময় সত্তায় পরিপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস, স্বচ্ছজ্ঞান ও পূর্ণতম তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার যে দাবী করেছেন এবং এর পরিপূর্ণ প্রমাণ দিয়েছেন তা আজ পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য কোন কিতাবে কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। **'ফা হাল্ মাই ইয়াস্‌মাউ ফা ইউমিনু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ওয়া ইয়াকুনা মিনাল মুসলিমীনাল মুখলাসীন?'** (অর্থৎ, অতএব কে আছে যে শ্রবণ করার পর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়? –অনুবাদক)।

স্পষ্টভাবে জানা উচিত, ইঞ্জিলসমূহে হযরত মসীহ্‌র এমন কতিপয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায়, হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর নবুওয়ত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। যেমন, এ বাক্যটি যা তাঁর অন্তিম মুহূর্তের বাক্য ছিল বলেই ধরা যায় অর্থাৎ ***'এলি এলি লিমা সাবাক্‌তানি"***। এর অর্থ হচ্ছে, 'হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি আমায় কেন ছেড়ে দিলে?' দুনিয়া থেকে বিদায়-মুহূর্তে যখন কিনা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের দৃঢ়বিশ্বাস ও

ঈমানের জ্যোতির্বিকাশের সময় হয়ে থাকে ঠিক তখন তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যটি উচ্চারিত হলো! তাছাড়া জনাবের এ রীতিও ছিল যে শত্রুদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে সে জায়গা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতেন। অথচ খোদা তাআলার তরফ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতিশ্রুতিও পেয়ে ছিলেন। উক্ত বিষয় দুটি থেকে (হযরত মসীহ্‌র) সন্দেহ-সংশয় ও বিস্ময়-বিভ্রাট সুপ্রকাশিত। তদুপরি (ক্রুশীয় ঘটনার আগে) এমন বিষয়ে যার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আগে থেকে তাঁর জানা ছিল, সারা রাত তাঁর কেঁদে কেঁদে দোয়া করার এটা ছাড়া আর কী অর্থ হতে পারে যে প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁকে কেবল সন্দেহই পেয়ে বসতো। এ কথাগুলো শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের (ভিত্তিহীন সব) আপত্তি তোলার কারণে লিখা হলো। নইলে, এ প্রশ্ন গুলোর সহজ সরল উত্তর আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা আমাদের প্রিয় মসীহ্‌–যিনি মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না তাঁর ওপর থেকে এ যাবতীয় আপত্তি কেবল তাঁর সম্পর্কে 'ইশ্বরত্ব' ও 'পুত্রত্ত্বে'র অপনোদনের মাধ্যমে এক পলকে তুলে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের খ্রিষ্টান ভাইদেরকে (এর জন্য) অনেক বেগ পেতে হবে।[৫]

**দ্বিতীয় প্রশ্ন:** মুহাম্মদ (সা.) যদি পয়গম্বর হতেন তাহলে সে সময়কার (লোকদের) প্রশ্নের মুখে অসহায় হয়ে উত্তরে এ কথা বলতেন না, 'খোদা জানেন' অর্থাৎ তাঁর জানা নেই। আর 'আসহাবে-কাহ্‌ফ' অর্থাৎ গুহাবাসীদের সংখ্যা বর্ণনায় তিনি ভুল করতেন না। তা ছাড়া এ কথাও বলতেন না, সূর্য কর্দমাক্ত উৎসে লুকোয় বা ডোবে। অথচ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে নয় কোটি গুণ বড়। এটি কী করে কাদায় লুকোতে পারে?

**দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:** কারও কাছে গোপন থাকা উচিত নয়, প্রশ্নকারী নিদর্শন প্রদর্শনের বিষয়টি অস্বীকার করার লক্ষ্যে যে আয়াত দু'টি থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এতে করে তা কখনও প্রমাণিত হয় না। এর বিপরীতে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে অবশ্যই সেসব নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে যা একজন সত্যবাদী ও পরিপূর্ণ নবীর পক্ষ থেকে হওয়া উচিত। সুতরাং এর ব্যাখ্যা ও প্রকৃত স্বরূপ নিম্নবর্ণিত বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপত্তিকারী তাঁর দাবীর সমর্থনে প্রথম আয়াতটির সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে কাটছাট করে অনুবাদ পেশ করে দিয়েছেন। কাজেই সম্পূর্ণ আয়াতটি এর সাথের আরও

৫. এসব সন্দেহ-সংশয় চারটি ইঞ্জিল থেকে সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে মথির ইঞ্জিলটি সংশয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে (মথি : ২৭ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)।

দুটি আয়াত সহ নিম্নে দেওয়া গেল, যদ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হয় :

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

**ওয়াকালু লও লা উনযিলা আলাইহি আয়াতুম মিররব্বিহি কুল ইন্নামাল আয়া-তু ইন্দাল্লাহি ওয়া ইন্নামা আনা নাযীরুম মুবীন। আওয়া লাম ইয়াকফিহিম আন্না-আনযালনা আলাইকাল কিতা-বা ইউত্‌লা আলাইহিম। ইন্না ফি যা-লিকা লা-রাহমাতাওঁ ওয়া যিক্‌রা- লিকাওমিই ইউ'মিনূন। (আনকাবুত: ৫১, ৫২)**

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى
لَّجَاۗءَهُمُ الْعَذَابُ ۭ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

**ওয়া ইয়াসতা'জিলূনাকা বিল আযা-বি ওয়া লওলা আজালুম মুসাম্মান লাজা-য়া হুমুল আযা-বু ওয়া লাইয়া'তিয়ান্নাহুম বাগতাতাওঁ ওয়া হুম লা ইয়াশউরূন (আনকাবুত: ৫৪) ।**

অর্থাৎ তারা বলে, তার প্রতি নিদর্শনাবলী কেন অবতীর্ণ হলো না? যে সব নিদর্শন যা তোমরা চাও (অর্থাৎ আযাবের নিদর্শন) সেগুলো অবশ্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে এবং বিশেষভাবে তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। অর্থাৎ আমার কাজ কেবল এটুকু, যেন আযাব আসার দিন সম্পর্কে (তোমাদের) সতর্ক করি। আযাব অবতীর্ণ করা আমার কাজ নয়। এরপর আল্লাহ্ বলেন, (যারা নিজেদের ওপর কোন আযাবের নিদর্শন অবতীর্ণ করাতে চায়) তাদের জন্য কি রহমতের নিদর্শন যথেষ্ট নয় যা আমরা (হে রসূল) তোমার প্রতি পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলীর আকর সেই কিতাবরূপে অবতীর্ণ করেছি যা তাদের পড়ে শোনানো হয়? অর্থাৎ কুরআন করীম যা এমন একটি রহমতপূর্ণ নিদর্শন যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় যা অস্বীকারকারীরা আযাবের নিদর্শন দিয়ে পূর্ণ করতে চায়। কেননা মক্কার কাফেররা এ উদ্দেশ্যেই আযাবের নিদর্শন চাইতো যেন তা তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে 'হাক্কুল একীন' তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাদের উপনীত করে। কেবল দেখার ব্যাপারই না থাকে। কেননা কেবল দেখার নিদর্শনে তাদের ধোঁকা লাগার আশঙ্কা ছিল। ভেলকি (ইন্দ্রজাল) ইত্যাদির খেয়ালও হতে পারে। কাজেই (তাদের) এ সন্দেহ উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর করার জন্য (আল্লাহ্)

বলেছেন, এমন নিদর্শনই চাও যা তোমাদের সত্তায় কার্যকরী হয়ে পড়ে। তাই আবার আযাবের নিদর্শনের কী প্রয়োজন? এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য কি রহমতের নিদর্শন যথেষ্ট নয়? অর্থাৎ কুরআন শরীফ যে এর নূর ও তীব্র কিরণ পাতে তোমাদের চোখ ঝল্‌সে দেয় এবং এর সহজাত সৌন্দর্য, গুণাবলী, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ, সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব ও অলৌকিক বৈশিষ্টাবলী তোমাদের এত পরিমাণে দেখায় যার মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তোমরা অক্ষম হয়ে পড়েছ। আর এগুলো তোমাদের ওপর ও তোমাদের জাতির ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলছে[৬] এবং তোমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে বিস্ময়াতীত নানা পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এর

---

৬. এ সব অমূল্য ও অলৌকিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই কুরআন করীম মুজিযা বলে অভিহিত। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত সূরাগুলোতেও বর্ণিত রয়েছে: সূরা আল বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান, সূরা আন্ নিসা, আল মায়েদাহ, আল আনআম, আল আ'রাফ, আল আনফাল, আততৌবা, সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, আর রা'দ, সূরা ইব্রাহীম, আল হিজর, আল ওয়াকিয়া, আন নামাল, আল হাজ্জ, আল বাইয়্যেনা, আল মুজাদিলা। অতএব উদাহরণরূপে কয়েকটি আয়াত দেয়া গেল:

**ইয়াহ্দি বিহিল্লাহু মানিত্তাবায়া রিযওয়ানাহু সুবুলাস সালা-মি ওয়া ইউখরিজুহুম মিনায্‌যুলুমা-তি ইলান নূর। শিফা-উললিমা- ফিস্‌সুদূর। আনযালা মিনাস সামা-য়ি মা-য়ান ফা আহইয়া বিহিল আরযা বা'দা মাওতিহা, আনযালা মিনাস সামায়ি মা-য়ান ফা সা-লাত আওদিয়াতুম বি কাদারিহা। আনযালা মিনাস্ সামা-য়ি মা-য়ান ফাতুসবিহুল আরযু মুখযাররাহ্। তাকশায়িররু মিনহু জুলুদুল্ লাযীনা ইয়াখশাওনা রাব্বাহুম সুম্মা তালীনু জুলুদুহুম ওয়া কুলূবুহুম ইলা যিকরিল্লাহি।**

**আলা বি যিকরিল্লাহি তাতমায়িন্নুল কুলূব। উলাইকা কাতাবা ফি কুলূবিহিমুল ঈমা-না ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহিম মিনহু। কুল নাযযালাহু রূহুল কুদুসি মির রাব্বিকা লিইউসাব্‌বিতাল লাযীনা আ-মানু ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশরা লিলমুসলিমীন। ইন্না- নাহনু নায্‌যালনায যিকরা ওয়া ইন্না- লাহু লাহা-ফিযূন। ফিহা-কুতুবুন কাইয়্যেমা। কুল লাইনিজতামায়াতিল ইনসু ওয়াল জিন্নু আলা অইইয়া'তু বিমিসলি হা-যাল কুরআ-নি লা-ইয়াতূনা বিমিসলিহি ওয়া লাও কা-না বা'যুহুম বিবা'যিন যাহীরা।** অর্থাৎ কুরআন করীমের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং মানুষ (অন্ধকার থেকে বেরিয়ে) নূরের দিকে পরিচালিত হয়। কুরআন প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ভাল করে। খোদা তাআলা এমন এক পানি অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে মৃতভূমি সজীব হয়ে উঠছে। এমন পানি অবতীর্ণ করেছেন যদ্বারা প্রত্যেক উপত্যকা তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এমন বাণী অবতীর্ণ করেছেন যা দিয়ে পচা-গলা ভূমি সবুজ ও সজীব হয়ে উঠেছে। এর দরুন খোদাভীরু বান্দাদের গায়ের চামড়া শিউরে ওঠে। এর পর তাদের চামড়া এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কোমল হয়ে পড়ে। স্মরণ রেখো, কুরআনের মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। যারা কুরআনের অনুসারী হয়ে যায় তাদের অন্তঃকরণে ঈমান লিখে দেয়া হয় এবং রূহুলকুদুস তাদের সঙ্গী ও সহায় হয়। রূহুলকুদুসই কুরআন অবতীর্ণ করেছে যেন কুরআন মু'মিনদের হৃদয় সুদৃঢ় করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্যে হেদায়াত ও সুসংবাদবহ নিদর্শন হয়। আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করবো। অর্থাৎ বাহ্যিক ভাবেও এবং তত্ত্বগত দিক দিয়ে গুণগতমানেও কুরআন সদাসর্বদা এর আসল অবস্থায় থাকবে এবং এর ওপর ঐশী নিরাপত্তার ছায়া বিরাজমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, পবিত্র কুরআনে সার্বিক সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ এবং সেই যাবতীয় সত্য রয়েছে যা হক্কানী গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাওয়া যায়। আর এর অনুরূপ (কিতাব) প্রণয়নে কোন মানুষ ও জিন সক্ষম নয় যদিও তারা এ কাজের জন্য একে অন্যের সহায়ক হয়ে যায়।

ফলশ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে মৃত হয়ে পড়ে থাকা লোকেরা জীবন লাভ করে চলেছে। আর বংশ পরম্পরায় যারা অন্ধই থেকে আসছিল সেসব মাতৃগর্ভজাত অন্ধরা চোখ মেলছে। কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার নানা ধরনের রোগব্যাধি থেকে তারা আরোগ্য হয়ে চলেছে। বদ্ধমূল কুসংস্কার ও বিদ্বেষবৎ কঠিন কুষ্ঠ এতে নিরাময় হয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে নূর পাওয়া যায়। আঁধার দুর হয়। ঐশী মিলন সহজলভ্য হয় এবং এর লক্ষণাবলী উদ্ভাসিত হয়। কাজেই চিরস্থায়ী জীবন দানকারী এই রহমতের নিদর্শন ছেড়ে তোমরা কেন আযাব ও মৃত্যুর নিদর্শন চাও? এরপর আল্লাহ বলেন, এ জাতি তো ঝটপট আযাবই কামনা করে। রহমতের নিদর্শনের মাধ্যমে উপকৃত হতে চায় না। তাদের বলে দাও, আযাবের নিদর্শনাবলী নির্ধারিত সময়ের অধীন হয়ে থাকে। এ বিধান না থাকলে আযাব সংক্রান্ত নিদর্শনও কবেই অবতীর্ণ হয়ে যেতো। তবে আযাব অবশ্যই আসবে। আর এমন সময়ে আসবে যখন এরা ঠাওরও করতে পারবে না। এখন ন্যায়সঙ্গতভাবে লক্ষ্য করুন এ আয়াতটিতে কোথায় মু'জিযা প্রদর্শনে অস্বীকার করা হয়েছে? এ আয়াতসমূহতো উচ্চ স্বরে ঘোষণা করছে, কাফিররা ধ্বংস ও আযাবের নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। অতএব প্রথমত তাদের বলা হলো : দেখ! তোমাদের মাঝে জীবন প্রদায়ক নিদর্শন মজুদ রয়েছে অর্থাৎ কুরআন। এটি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের ধ্বংস করতে চায় না। বরং চিরস্থায়ী জীবন দান করে। কিন্তু আযাবের নিদর্শন যখন তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হবে, সেটি তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। কাজেই অনর্থক কেন মরে যেতে চাও। তবু তোমরা যদি আযাবই চাও, তাহলে স্মরণ রেখো, সেটিও শীঘ্র আসবে। অতএব আল্লাহ জাল্লাশানুহু এ আয়াতগুলোতে আযাবের নিদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর (সেই সাথে) কুরআন করীমে যেসব নিদর্শন রয়েছে যা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়ে নিজ অলৌকিক প্রভাব তাদের মাঝে প্রতিফলিত করে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আপত্তিকারী মনে করেন, এ আয়াতটিতে **'লা নাফিয়া জিনস'** দিয়ে যে মু'জিযার অস্বীকৃতি বুঝায় এতে আবশ্যকীয়ভাবে যাবতীয় মু'জিয়ার অস্বীকৃতি এসে পড়ে– এটা কেবল আরবী ব্যকরণ সম্পর্কে (তাঁর) অজ্ঞতা মাত্র। স্মরণ রাখা উচিত **'লা নাফি'**-এর প্রয়োগ কেবল সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যা বক্তার কল্পনায় নির্দিষ্ট থাকে, যদিও বা তা সে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে থাকুক অথবা ইঙ্গিতে বলে থাকুক। যেমন কোন ব্যক্তি বললো, এখন শীতের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এতে সুস্পষ্ট যে, তার স্থানীয় বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে তা বলেছে, যদিও বাহ্যত তার শহর বা এলাকার নামও সে

নেয়নি। কিন্তু তার এ বাক্য থেকে এমনটি মনে করা যে, তার দাবী হলো, সমস্ত পার্বত্য (ও শীত প্রধান) দেশগুলো থেকেও শীত চলে গেছে এবং সর্বত্র প্রখর রোদ পড়তে আরম্ভ করেছে। আর এর জন্য এ যুক্তি পেশ করা, যে 'লা' সে ব্যবহার করেছে সেটি **'নাফি জিনসের' 'লা'**। কাজেই এর প্রভাব দুনিয়াজাহানে পড়া উচিত। এমনটি সঠিক নয়।

মক্কার পরাজিত প্রতিমা উপাসকরা তো পরিশেষে আঁ হযরত (সা.)-এর রিসালত ও মু'জিযাগুলোকে (প্রকৃত) মু'জিযা হিসেবে মেনে নেয়। অস্বীকার করার যুগেও তারা নিছক শুষ্ক (কট্টর) অস্বীকারকারী ছিল না, বরং রোম ও ইরানে গিয়েও তারা আঁ হযরত (সা.)-কে বিস্ময়াবাক অনুভূতি থেকে যাদুকর বলে বেড়াতো, যদিও তা অসঙ্গত আঙ্গিকেই বলতো। তথাপি মু'জিযা বা নিদর্শনাবলীর কথা তারা স্বীকার করে নিতো। এরকম স্বীকৃতির উল্লেখ কুরআন করীমেও রয়েছে। মুহাম্মদী নবুওয়তের অতি উজ্জ্বল জ্যোতির নিচে চাপা পড়া তাদের ক্ষীণ ও দুর্বল বক্তব্যে কেনই বা তারা **'লা নাফি জিনস'** প্রয়োগ করতে যাবে? তাদের যদি এমনই অতি মাত্রায় অস্বীকারপূর্ণ মনোভাব হতো তা হলে তারা পরিশেষে অতি উচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতো না। তারা তাদের সে দৃঢ় বিশ্বাসকে নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে ও জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। কুফর ও অবিশ্বাসকালীন তাদের যেসব কথা কুরআন করীমে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা এটাই যে, তারা নিজেদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার দরুন ধোঁকায় পড়ে আঁ হযরত (সা.)-কে যাদুকর বলে ডাকতো। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ **ওয়া-ইঁ ইয়ারাও আয়াতাঁ ইউ'রিযু ওয়া ইয়াকুলু সিহ্রুম মুস্তামির** (কামার : ৩) অর্থাৎ তারা কোন নিদর্শন দেখা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা আস্ত যাদু। আবার অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ **ওয়া আজেবূ আন জা-য়াহুম মুনযিরুম মিনহুম ওয়া কা-লাল কা-ফেরূনা হা-যা সা-হেরুন কাযযা-ব** (সাদ : ৫)। অর্থাৎ তাদেরই একজনকে তাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে বলে তারা অবাক হয়। আর অবিশ্বাসীরা বলে, সে যাদুকর মিথ্যেবাদী। এখন স্পষ্ট যে, তারা নিদর্শনাবলী দেখে আঁ হযরত (সা.) কে যাদুকর বলতো, তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে সেসব নিদর্শনকেই তারা মু'জিযা বলে মেনেও নিল এবং আরবের গোটা উপদ্বীপ মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র মু'জিযাসমূহের (সত্যতার) সর্বকালের জন্য সাক্ষী হয়ে গেলো। এমন লোকদের পক্ষে আবার কী করে সম্ভব যে তারা ঢালাওভাবে নিদর্শন

গুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো এবং মু'জিযা অস্বীকারে এমন **'লা নাফিয়া'** ব্যবহার করতো যা তাদের সাহস ও ক্ষমতার আওতায় পড়ে না এবং তাদের সার্বিক মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অচিন্তনীয়। বরং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কুরআন করীমে যেখানে এ রসূলের ওপর কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না বলে কাফিরদের আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সাথে সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে তাদের বলার উদ্দেশ্য হলো, যেসব নিদর্শন তারা চায় সেগুলো কেন অবতীর্ণ হয় না।[৭] মোটকথা উল্লেখিত আয়াতের **'লা নাফিয়া'কে** আপনি এর রীতিনীতির আওতার বহু দূরে নিয়ে গেছেন। এ রকম 'লা নাফিয়া' আরবরা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তাদের অন্তর তো ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। তাই পরিশেষে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কেবল অল্প কয়েকজনই তাদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুত আযাবে উপনীত হয়েছিল। স্মরণ থাকা উচিত, এমন **'লা নাফিয়া'** হযরত মসীহ্‌র কথায়ও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ফরিসীরা (ইহুদী উলামা) নিদর্শন দেখতে চাইলে সে আক্ষেপ ভরে বললো, 'এ যুগের লোক কেন নিদর্শন চায়? আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, এ যুগের লোকদের কোন নিদর্শন দেয়া হবে না'। দেখুন মার্ক : ৮ অধ্যায়, ১১ শ্লোক। এখন লক্ষ্য করুন হযরত মসীহ্ কত পরিষ্কারভাষায় অস্বীকার করেছেন। আপনি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। আপনার আপত্তি এ আপত্তিটির সামনে কোন কিছুই নয়। কেননা আপনি কেবল কাফেরদের অস্বীকারটি পেশ করেছেন। তাও আবার ঢালাওভাবে অস্বীকার নয়, বরং বিশেষ ধরনের নিদর্শনাবলী সম্পর্কিত অস্বীকার। আর এও স্পষ্ট যে শত্রুর অস্বীকার সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরযোগ্য হয় না।

---

৭. স্পষ্ট হোক, কুরআন করীমে অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে নিদর্শন চাওয়ার প্রশ্নের উল্লেখ দু'একটি জায়গায় নয় বরং বিভিন্ন জায়গায় একই প্রশ্ন করা হয়েছে। এখন সবগুলো জায়গা সামগ্রিকভাবে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, মক্কার অবিশ্বাসীরা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে তিন ধরনের নিদর্শনের দাবী জানাতো:

১) আযাবরূপে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশি মতে মক্কার কাফিররা যেসব নিদর্শন দাবী করেছিল।

২) দ্বিতীয়ত যেসব নিদর্শন আযাব অথবা আযাবের সূচনারূপে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩) তৃতীয়ত যেসব আযাবের কারণে গায়েবি পর্দা (তথা অদৃশ্যে বিশ্বাসের পর্দা) সম্পূর্ণভাবে উঠে যায়। এভাবে উঠে যাওয়াটা 'ঈমান বিলগায়েব'-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অতএব আযাবের নিদর্শন প্রকাশের জন্য (কাফিরদের পক্ষ থেকে) যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলোর উত্তর কুরআন শরীফে এটাই দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অপেক্ষা কর, আযাব অবতীর্ণ হবে। তবে সে ধরনের আযাব অবতীর্ণ করায় অস্বীকার করা হয়েছে যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তবুও আযাব অবতীর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যা পরিশেষে গাযওয়া (তথা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ)-গুলোর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের নিদর্শন দেখাতে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এ রকম প্রশ্নের উত্তর যে অস্বীকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতো না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা কাফিররা বলতো 'আমরা কেবল তখন ঈমান আনবো যখন এমন নিদর্শন দেখবো যাতে ভূমি থেকে

কেননা শত্রু বাস্তব ঘটনা বিরুদ্ধ কথাও বলে ফেলে। কিন্তু হযরত মসীহ্ তো নিজ মুখে নিদর্শন দেখাতে অস্বীকার করেছেন এবং নিদর্শন দেখানোর বিষয়টিকে নির্দিষ্ট এক যুগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বলেছেন, 'এ যুগের লোকদেরকে কোন নিদর্শন দেয়া যাবে না'। অতএব নিদর্শন অস্বীকার বিষয়ে এর চেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা আর কী বা হতে পারে এবং এই **'লা নাফিয়া'র** চেয়েও বেশি স্পষ্ট **'লা নাফিয়া'** আর কী হতে পারে?

---

আকাশ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সিঁড়ি নির্মাণ করে তা দিয়ে তুমি আমাদের দেখতে দেখতে আকাশে উঠে যাও আর আমরা তোমার কেবল আকাশে উঠে যাওয়া কখনো গ্রহণ করে নেব না যতক্ষণ তুমি আকাশ থেকে এমন একটি কিতাব না আন, যা আমরা নিজেদের হাতে নিয়ে পড়ে দেখবো। অথবা এমনটি কর, যেন সিরিয়া ও ইরাকের মত মক্কার মাটি দিয়েও নদ-নদী বয়ে যায়। কেননা মক্কায় সব সময় পানির কষ্ট থাকে। আর এ ছাড়াও পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের পরলোকগত বুযুর্গদের সবাই যেন পুনর্জীবিত হয়ে চলে আসে। আর তাদের মাঝে যেন কুসাই বিন কিলাবও থাকে। কেননা সে বৃদ্ধ সর্বদা সত্য কথা বলতো। তার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করবো, তোমার দাবী সত্যি না মিথ্যা। এসব কঠিন কঠিন মনগড়া নিদর্শনের জন্য তারা দাবী জানাতো যা উপর্যোপরি ভাবে শর্তযুক্ত ছিল। এসব কিছুর উল্লেখ কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য আরবের দুষ্কৃতিপরায়ণদের এ ধরনের আবেদন আমাদের প্রভু ও নেতা নবী (সা.)-এর উজ্জ্বল মু'জিযা ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রিসালতের পদমর্যাদার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিশেষ। আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সত্যতার জ্যোতি এসব জ্ঞানান্ধকে কত যে অক্ষম ও উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল তা খোদা তাআলাই ভাল জানেন। আর তাঁর স্বপক্ষে কত যে ঐশী সাহায্য সহায়তা ও আশিসের বারি বর্ষণ হচ্ছিল। যার ফলে চোখে তারা সর্ষে ফুল দেখতে আরম্ভ করেছিল এবং এই প্রভাব ও প্রতাপের দরুন মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া ও পালানোর উদ্দেশ্যে নিদর্শনের জন্য সেইসব অবান্তর দাবী উত্থাপন করতো। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের নিদর্শন দেখানো হচ্ছে **'ঈমান বিল গায়েব'** (অদৃশ্যে বিশ্বাস)-এর পরিপন্থী। এমনিতে অবশ্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত এমন সিঁড়ি রেখে দিতে সক্ষম, যা সবাই দেখতে পায়। আর তেমনিভাবে তিনি দু চার হাজার কেন, দুই কোটি লোকও পুনর্জীবিত করে তাদের মুখ দিয়ে তাদের সন্তানসন্ততির সামনে (মুহম্মদী) নবুওয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়াতেও সক্ষম। এসবই তিনি করতে পারেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, এভাবে পরিপূর্ণ প্রকাশের দরুন সওয়াব ও প্রতিদানের ভিত্তি **'ঈমান বিল গায়েব'**-এর প্রক্রিয়া তিরোহিত হয় এবং দুনিয়া হাশরের নমুনায় পরিণত হয়ে পড়ে। অতএব কিয়ামতের ময়দানে পরিপূর্ণ প্রকাশের সময় যেভাবে ঈমান কোন কাজে আসে না। তেমনি (নিদর্শনের ক্ষেত্রে) উল্লেখিত পরিপূর্ণ ঐশী প্রকাশের দরুনও ঈমান আনয়ন নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়। বরং ঈমান ততক্ষণ পর্যন্তই ঈমান বলে অভিহিত হয়, যতক্ষণ কিছুটা গোপনীয়তাও অবশিষ্ট থাকে। আর যখন সব পর্দাই উঠে গেল তখন ঈমান আর ঈমান থাকে না। এ কারণেই সব নবী 'ঈমান বিল গায়েব'-এর নীতি অনুযায়ী মু'জিযা দেখিয়ে এসেছেন। কোন নবী একটি কোন গোটা শহরবাসীকে পুনর্জীবিত করে তাদের দিয়ে নিজের নবুওয়তের অনুকূলে সাক্ষ্য দাঁড় করাননি অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে জনসমক্ষে তাতে বেয়ে উঠে দুনিয়াবাসীকে কখনো তামাশা দেখাননি।

এরপর আপত্তিকারী দ্বিতীয় আয়াতের অনুবাদ পেশ করেছেন। এতেও আগের ও পরের আয়াতগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাতে আপত্তি জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আসল আয়াত এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন, আয়াতটিতে এমন একটি শব্দও নেই যা মু'জিযার অস্বীকার নির্দেশ করে। বরং সব শব্দ সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, ঐশী নিদর্শনাবলী অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব এর সংলগ্ন আয়াতগুলোসহ সে আয়াতটি হচ্ছে–

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ
مَسْطُورًا ○ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُّرْسِلَ بِالْأٰيٰتِ إِلَّا أَنْ
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ○

**'ওয়া ইম্‌মিন কারইয়াতিন ইল্লা নাহনু মুহলিকূহা কাবলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি আও মুয়াযযিবুহা আযাবান শাদীদান কা-না যা-লিকা ফিল কিতাবি মাসতূরা। ওয়া মা মানাআনা আন নুরসিলা বিল আয়াতি ইল্লা আন কাযযাবা বিহাল আওওয়ালূনা ওয়া আতাইনা সামূদান না-কাতা মুবসিরাতান ফা যালামূ বিহা ওয়ামা নুরসিলু বিল আয়া-তি ইল্লা তাখভীফা** (বনি ইস্রাঈল : ৫৯, ৬০)।

আল্লাহজাল্লা শানুহু বলেন, কিয়ামত দিবসের পূর্বে প্রত্যেক জনপদকে আমরা অবধারিতভাবে এমনিতেই ধ্বংস করে দেব অথবা (সেখানে) কঠোর আযাব অবতীর্ণ করবো। কিতাবে এটাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আপাতত আমরা (আযাবের আকারে পূর্বের জাতিগুলোতে ঘটে যাওয়া) কতগুলো শাস্তিমূলক নিদর্শন কেবল এ কারণেই পাঠাই না যে, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। অতএব আমরা সামূদকে সত্য নিদর্শনরূপে একটি উটনি দিয়েছিলাম। এটা আযাবের ভূমিকা বিশেষ ছিল। এটির প্রতি তারা জুলুম করলো। অর্থাৎ যে উটনিটির অবাধে চারা খাওয়া ও পানি পান করার দরুন হিজর শহরে বসবাসকারী সামুদ জাতির লোকেরা পানীয় পানি ও গবাদি পশুর চারাগাছের অভাবজনিত এক কঠিন কষ্ট, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিপদে পড়ে গিয়েছিল। শাস্তিমূলক নিদর্শন তো কেবল ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ শাস্তিমূলক নিদর্শন কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই হয়ে থাকে। কাজেই

এমন শাস্তিমূলক নিদর্শন চাওয়ায় কী লাভ যা দেখে পূর্ববর্তী জাতিরা (তা) প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা দেখে তারা ভীত হয় নি?

এ স্থলে যেন প্রকাশ থাকে, নিদর্শন দু'রকম হয়ে থাকে– (১) ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তিমূলক নিদর্শন, যাকে 'কহ্রী নিদর্শনও বলা যায়; (২) সুসংবাদ ও প্রশান্তিমূলক নিদর্শন। একে 'রহমতের নিদর্শন'ও বলা যায়। ভীতিপ্রদর্শনমূলক নিদর্শন কঠোর ও উগ্র অস্বীকারকারী, বক্রহৃদয়, অবাধ্য, অবিশ্বাসী ও ফেরাউনস্বভাববিশিষ্ট লোকদের জন্য প্রকাশ করা হয় যাতে তারা ভীত হয় এবং খোদা তাআলার পরাক্রম ও প্রতাপের ভয় তাদের হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে। সুসংবাদমূলক নিদর্শন সেই সব সত্যান্বেষী ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের জন্য প্রকাশিত হয় যাদের অন্তর সবিনয়ে বিশ্বাসে পূর্ণতা লাভ এবং ঈমান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যাশী থাকে। সুসংবাদমূলক নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না বরং নিজ আনুগত্যপরায়ণ বান্দাদের আশ্বস্ত করা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দেওয়া এবং বেকুল হৃদয়ে স্নেহ ও মমতার হাত রাখা ও প্রশান্তি দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন মাজীদের মাধ্যমে মু'মিন সবসময় সুসংবাদমূলক নিদর্শন পেতে থাকে এবং ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসে উন্নতি লাভ করতে থাকে। সুসংবাদমূলক নিদর্শনগুলোর দ্বারা মু'মিন স্বস্তি পায় এবং এতে মানুষের স্বভাবজাত ব্যকুলতা দূর হতে থাকে। তার হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের অনুবর্তিতার কল্যাণে মু'মিন তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সুসংবাদমূলক নিদর্শন লাভ করতে থাকে এবং আরাম ও প্রশান্তিদায়ক নিদর্শন তার ওপর অবতীর্ণ হতে থাকে, যাতে সে একীন ও মা'রেফতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে 'হক্কুল একীন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান)-এর পর্যায়ে উপনীত হয়। সুসংবাদমূলক নিদর্শনে এক মজার বিষয় হচ্ছে, এগুলোর অবতরণে মু'মিন যেমন দৃঢ়বিশ্বাসে, সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বে ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়, তেমনি এ শ্রেণীর নিদর্শনাবলীতে ভরে থাকা গোপন ও প্রকাশ্য ঐশী অনুগ্রহ, আশিস ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করার কারণে প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তারা প্রতিনিয়ত বেড়ে ওঠতে থাকে। অতএব প্রকৃত পক্ষে এসব রহমতের নিদর্শনই অতি মর্যাদাপূর্ণ, অতি প্রভাবশীল ও কল্যাণময় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল উপায়বিশেষ যা আল্লাহর দিকে তাঁর পথিকদের পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও সাক্ষাৎ ভালবাসার সেই মার্গে পৌঁছে দেয় যা অলিআল্লাহ্দের জন্য চূড়ান্ত মার্গ হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে সুসংবাদবহ নিদর্শনের কথা বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআন একে সীমিত বলে উল্লেখ করে নি বরং এর সত্যিকার অনুসারীগণ

সদাসর্বদা এসব নিদর্শন পেতে থাকবে বলে এক চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি দান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

**লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাতে লা তাবদীলা লিকালিমা-তিল্লাহ যা-লিকা হুয়াল ফওযুল আযীম** (ইউনুস : ৬৫)। অর্থাৎ মু'মিনরা পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও সুসংবাদ (-বহ নিদর্শন) পেতে থাকবে। আর এগুলোর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশীপ্রেমের পথে অপরিসীম উন্নতি লাভ করতে থাকবে। এগুলো হচ্ছে খোদার কথা যা কখনো টলবে না। আর সুসংবাদবহ নিদর্শনাবলী পাওয়াই হলো মহান সফলতা (অর্থাৎ এটাই এক সে বিষয় যা মু'মিনকে ঐশীপ্রেম ও জ্ঞানতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়)।

জানা উচিত, আপত্তিকারীর উপস্থাপিত আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা কেবল ভীতি প্রদর্শন মূলক (আযাবের) নিদর্শনের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন আয়াতটিতে وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا **ওয়া মা নুরসিলু বিল আয়া-তি ইল্লা তাখভীফা** (বনি ইস্রাঈল : ৬০) (আমরা ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শনাবলী পাঠিয়ে থাকি –অনুবাদক) বাক্যটি থেকে স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা খোদা তাআলার যাবতীয় নিদর্শন আযাবের নিদর্শনের মাঝেই সীমিত বলে মনে করে যদি এ আয়াতের এ অর্থ করা হয় যে 'আমরা যাবতীয় নিদর্শন কেবল ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকি এবং এর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না' তাহলে নিঃসন্দেহে এ অর্থ প্রকাশ্যভাবে ভ্রান্ত। একটু আগেই যেমন বর্ণিত হয়েছে, নিদর্শন দুটি উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়ে থাকে। ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে। এ দু'রকম নিদর্শনের বিষয়ই কুরআন মাজীদ ও বাইবেলে যত্রতত্র প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব নিদর্শন যখন দু'প্রকারের তখন উপরোল্লেখিত আয়াতে 'আলআয়াত' শব্দটি (যার অর্থ 'সেইসব নিদর্শন') আবশ্যকীয়ভাবে এ অর্থেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হবে যে, 'সেইসব নিদর্শন' বলতে আযাবের নিদর্শনকে বুঝায়। কেননা এ অর্থ গ্রহণ না করলে আবশ্যকীয়ভাবে ঐশীক্ষমতাধীন সমুদয় নিদর্শন ভীতি প্রদর্শনমূলক শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ বলে মানতে হবে। অথচ ভীতি প্রদর্শনমূলক শ্রেণীতেই সমুদয় নিদর্শন সীমাবদ্ধ বলে মনে করা সম্পূর্ণভাবে ঘটনা বিরোধী। এটা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীও সঠিক বলে গণ্য হতে পারে না এবং কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ও পবিত্রচেতা ব্যক্তির বিবেক অনুযায়ীও (সঠিক) হতে পারে না।

এখন যেহেতু পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল উপরোক্ত আয়াতে নিদর্শনের দু'টি শ্রেণীর মাঝে কেবল ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শনেরই উল্লেখ রয়েছে তাই মীমাংসাযোগ্য এ দ্বিতীয় বিষয়টি রয়ে গেলো যে এই **('মা মানা'আনা')** আয়াতটির কি এ অর্থ মনে করা উচিত হবে, ভীতিপ্রদর্শমূলক (আযাবের) কোন নিদর্শনই আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নি? অথবা এমনটি মনে করা উচিত হবে যে, উক্ত শ্রেণীর নিদর্শনাবলীর মাঝে সেসব নিদর্শন প্রদর্শিত হয় নি যা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোকে দেখানো হয়েছিল? অথবা এ তৃতীয় অর্থটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য যে, উভয় ধরনের ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শন আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, তবে সেই বিশেষ ধরনের কোন কোন নিদর্শন দেখানো হয় নি যেগুলো দেখে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মু'জিযা হিসেবে মনে করে নি?

অতএব জানা উচিত আলোচ্য আয়াতগুলোতে দৃষ্টিপাতে পুরোপুরি স্বচ্ছতার সাথে প্রতিভাত হয় যে, প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত অর্থ দু'টি কোনভাবেই সঠিক নয়। কেননা উল্লেখিত আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা যে, 'আমরা পাঠাতে সক্ষম এমন সব ধরনের ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই যাবতীয় আযাবের নিদর্শন, যেগুলো পাঠাতে আমরা অসীম ক্ষমতা রাখি সেগুলোও এ কারণে পাঠাইনি যে তা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ অস্বীকার করেছিল'– এ অর্থটি সর্বৈব ভ্রান্ত। কেননা এটা স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ কেবল সেসব নিদর্শনই অস্বীকার করেছিল যা তারা নিজেরা দেখেছিল। কারণ অস্বীকারের জন্য অস্বীকারকৃত কোন বিষয় প্রথমে চাক্ষুষভাবে দেখা আবশ্যকীয়। যে নিদর্শন তারা এখনও দেখেইনি তা কী করে অস্বীকার করতে পারে? অথচ অদেখা নিদর্শনাবলীর মাঝে এমন উচ্চপর্যায়ের নিদর্শনও ঐশী ক্ষমতাধীন রয়েছে যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেগুলোর সামনে সবার মাথা নত হয়ে যায়। কেননা খোদা তাআলা সব ধরনের নিদর্শনই দেখাতে পারেন। তাছাড়া ঐশী ক্ষমতা প্রসূত নিদর্শনাবলী যেহেতু অনন্ত ও অপরিসীম, কাজেই একথা কী করে সঠিক হতে পারে যে, সীমিত সময়ে সেসবগুলো তারা দেখেও ছিল এবং সেগুলো প্রত্যাখ্যানও করেছিল। সীমিত সময়ে তো সে বস্তুই দেখা যাবে যা সীমিত আকারে থাকবে। যা হোক আবশ্যকীয়ভাবে এ আয়াতের এ অর্থই সঠিক হবে : পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা যে কিছুসংখ্যক নিদর্শন দেখেছিল এবং প্রত্যাখ্যানও করেছিল, সেগুলো পুনরায় দেখানো বৃথা বলে মনে করা হয়। যেমন কিনা প্রকাশ্য ইঙ্গিতটিতেও এ অর্থই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ এ স্থলে যে

সামূদজাতির উটনির কথা খোদা তাআলা উল্লেখ করেছেন সেটি এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ (বহন করে) যে, এ আয়াতটিতে বিগত ও প্রত্যাখ্যানকৃত নিদর্শনগুলোর উল্লেখ রয়েছে। আর সেগুলো ছিল ভীতিপ্রদর্শনমূলক আযাবের নিদর্শন। এ (শেষোক্ত) তৃতীয় অর্থটিই সঠিক ও যথার্থ।

তারপর এ স্থলে আরেকটি বিষয় ন্যায়পরায়ণ লোকদের লক্ষণীয় রয়েছে। এতেকরে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ **'ওয়া মা মানা'আনা আননুরসিলা বিলআয়া-তি'** (বনি ইস্রাঈল : ৬০) আয়াতটিতে ঐশী নিদর্শনাবলীর অস্বীকারের পরিবর্তে বরং এর স্বীকৃতিই সাব্যস্ত হয়। কেননা **'আলআয়া-ত'** শব্দটিতে যে **'আলিফ-লাম'** এসেছে এটি আরবী ব্যাকরণ-এর নিয়মবিধির কারণে দুটি অর্থ বহন করে। এতে হয়তো 'সমগ্র' বুঝাবে অথবা 'বিশেষ' বুঝাবে। 'সমগ্র' অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতটির অর্থ হবে পূর্ববর্তীদের এ সমুদয় নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে নিদর্শন পাঠাতে বাধা দিয়েছে। আর 'বিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতটির অর্থ হবে, অবিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী বিশেষ নিদর্শনাবলী পাঠাতে কেবল পূর্ববর্তীদের সেগুলো অস্বীকার করাটাই আমাদের বাধা দিয়েছিল। যাহোক এ উভয় ক্ষেত্রেই নিদর্শনাবলীর অবতরণ প্রমাণিত। কেননা যদি এ অর্থ হয় যে, আমরা সমুদয় নিদর্শন বিগত জাতিদের অস্বীকার করার দরুন পাঠাইনি এতে কিছুসংখ্যক নিদর্শন পাঠানো প্রমাণিত হয়। যেমন কেউ যদি বলে আমি আমার সব মাল যায়েদকে দেইনি এতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে সে তার মালের কিছু অংশ যায়েদকে অবশ্যই দিয়েছে। আর যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, কিছু সংখ্যক বিশেষ নিদর্শন আমরা পাঠাইনি তাহলে এতেও অন্য কিছু সংখ্যক নিদর্শন পাঠানো প্রমাণিত হয়, যেমন কেউ যদি বলে, 'কোন কোন বিশেষ বস্তু আমি যায়েদকে দেই নি' এতে পরিষ্কার বুঝায় অন্য কোন কোন জিনিস অবশ্যই দিয়েছি। মোটকথা যে ব্যক্তি এ আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টি দিবে, প্রথমেই (সে দেখতে পাবে) কি-ভাবে এগুলো উভয় দিকের আযাব ও শাস্তিমূলক নিদর্শনের বৃত্তান্ত তুলে ধরছে। এরপর সে আবার দৃষ্টি দেয় এবং লক্ষ্য করে, বিভিন্ন সময়কালে খোদা তাআলার অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত যাবতীয় নিদর্শন ও বিস্ময়কর কর্মকান্ড সমূহ যে গণনাতীত, পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের সীমিত যুগে এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল– এমনটি অর্থ করা কি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? এরপর সে যেন তৃতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতার সাথে চিন্তা করে, এ স্থলে কি কেবল ভীতি প্রদর্শনমূলক আযাবের নিদর্শনের এক বর্ণনা দেয়া হয়েছে না কি সুসংবাদমূলক ও রহমতের নিদর্শনাবলীরও কিছু উল্লেখ রয়েছে? এরপর চতুর্থবার

চোখ তুলে **'আল্‌ আয়াত'** শব্দের **আলিফ লাম**-এর দিকেও তাকায় (এবং ভাবে) এতে কী অর্থ দাঁড়াচ্ছে? এভাবে চারবার দৃষ্টি দেয়ার পর গোঁড়ামী ও বিদ্বেষবশত সত্যপ্রিয়তার গুণ থেকে ছিটকে পড়া ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই নিজ অন্তরে কেবল একটি নয় বরং হাজার হাজার সাক্ষ্য অনুভব করতে দেখবে যে, না-বাচক শব্দটি নিদর্শনাবলীর কেবল বিশেষ একটি শ্রেণীর 'নফী' অর্থাৎ অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর ওপর এর কোন প্রভাব নেই। বরং এতে সেগুলো প্রদর্শনের কথাই বলা হয়েছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন, এখন এ অবিশ্বাসীরা যেসব ভীতিপ্রদর্শনমূলক নিদর্শন দেখাতে বলেছে সেগুলো কেবল এ কারণে দেখানো হবে না যে পূর্ববর্তী উম্মতরা সেগুলো অস্বীকার করেছে। কাজেই যেসব নিদর্শন অগ্রাহ্য করা হয়েছে, এখন বার বার সেগুলো অবতীর্ণ করা দুর্বলতার পরিচায়ক এবং অসীম কুদরতের অধিকারী আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে আযাবের নিদর্শনাবলী অবশ্যই অবতীর্ণ হবে কিন্তু ভিন্ন রঙে ও ভিন্ন চেহারায়। হযরত মূসা (আ.) বা হযরত নূহ (আ.) ও লূত (আ.)-এর জাতি অথবা আদ ও সামূদ জাতির অবিকল সেসব নিদর্শন প্রকাশ করার কী প্রয়োজন? সুতরাং এ আয়াত সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা অন্যান্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন :

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ ○ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ
قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ
قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ
اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ
اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ
عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○ وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ
اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ
اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ
اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

ওয়া ইন ইয়ারাও কুল্লা আয়াতিল লা ইউমিনূ বিহা হাত্তা ইযা জা-উকা ইউজা-দিলূনাকা (আনআম : ২৬)। ওয়া ইযা জা-য়াতহুম আয়াতুন কালূ লান নু'মিনা হাত্তা নু'তা মিসলা মা উতিয়া রসূলুল্লাহি, আল্লাহু আ'লামু হাইসু ইয়াজআলু রিসা লাতাহু (আনআম : ১২৫)। কুল ইন্নি আলা বয়্যিনাতিম মিররাব্বি ওয়া কায্যাবতুম বিহি মা ইন্দি মা তাসতা' জিলূনা বিহি ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহি ইয়াকুসসুল হাক্কা ওয়া হুয়া খাইরুল ফাসেলীন (আনআম : ৫৮)। কাদ জা-য়াকুম বাসা-য়িরু মির রাব্বিকুম ফামানূ আবসারা ফা লি নাফসিহি ওয়া মান আমিয়া ফা আলাইহা ওয়া মা আনা আলাইকুম বিহাফীয (আনআম : ১০৫)। ওয়া ইয়াসতা'জিলূনা বিল আযা-বি (আনকবুত : ৫৪)। কুল হুয়াল কা-দিরু আলা আইঁ ইয়াবয়াসা আলাইকুম আযাবান মিন ফওকিকুম আও মিন তাহ্তি আরজু-লিকুম আও ইয়ালবিসাকুম শিয়ায়াও ওয়া ইউযীকা বা'যাকুম বা'সা বা'যিন (আনআম: ৬৬) কুলিল হামদু লিল্লাহি সাইউরিকুম আয়া-তিহি ফাতা'রিফূনাহা (আল নামাল : ৯৪) কুল লাকুম মিয়াদু ইওয়ামিন লা তাসতাখিরুনা আনহু সায়াতাও ওয়া লা তাসতাকদিমূন (সাবা : ৩১)। ওয়া ইয়াসতামবিউনাকা আহাক্কুন হুয়া কুল য়ী ওয়া রাব্বি ইন্নাহু লাহাক্কুঁ ওয়ামা আনতুম বিমু'জিযীন (ইউনুস : ৫৪)। সানুরীহিম আয়া-তিনা ফিল আফা-কি ওয়া ফি আনফূসিহিম হাত্তা ইয়াতাবাইয়ানা লাহুম আন্নাহুল হাক্কু (হামীম আস্সাজদাহ্ : ৫৪)। খুলিকাল ইনসানু মিন আজাল সাউরীকুম আয়া-তী ফালা তাসতা' জিলূন (আল-আম্বিয়া: ৩৮)।

অর্থাৎ এসব লোক যাবতীয় নির্দশন দেখেও ঈমান আনে না। এরপর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে। আর যখন কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বলে, আমরা কখনো মানবো না যতক্ষণ আমরাও সেসব বিষয় পেয়ে না যাই যা রসূলরা পেয়ে থাকে। বল, আমি পুরোপুরি প্রমাণ নিয়ে আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছি। আর তোমরা সে প্রমাণ দেখেও প্রত্যাখ্যান করছো। যা তোমরা শীঘ্র চাচ্ছো (অর্থাৎ আযাব) এটা তো আমার এখতিয়ারের বহির্ভুত। চূড়ান্ত আদেশ জারি করার ক্ষমতাতো আল্লাহরই। তিনিই সত্য প্রকাশ করে দিবেন। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। তিনি একদিন আমার ও তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন। আল্লাহ্ আমার রিসালতের স্বপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী তোমাদের দান করেছেন। অতএব যে-ই এগুলো সনাক্ত করে সে নিজেরই উপকার করে। আর যে-ই অন্ধ হয়ে যায় এর অপকার তারই ওপর বর্তায়। আমি তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নই। আর তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করে। তিনিই তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের পায়ের নিচ দিয়ে

তোমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম। আর তোমাদের দু'দলে বিভক্ত করে একে অন্যর সঙ্গে যুদ্ধের স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম। সব প্রশংসা আল্লাহর, তিনি তোমাদের এমন নিদর্শনাবলী দেখাবেন যা তোমরা সনাক্ত করতে পারবে। আর বলে দাও, তোমাদের জন্য ঠিক এক বছরের মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে।[৮] এ থেকে তোমরা পিছু হটতেও পারবে না এবং এগোতেও পারবে না। তারা জিজ্ঞেস করে এ কি সত্য? তুমি বল, হ্যাঁ, আমার প্রভু প্রতিপালকের কসম, এটা সত্য এবং তোমরা আল্লাহকে কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধা দিতে পারবে না। অচিরেই তাদেরকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, তাদের দেশের চারপাশেও এবং তাদের নিজেদের মাঝেও। অবশেষে এ নবী যে সত্য, তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে। তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবে রয়েছে। আমি অচিরে আমার নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখাবো। অতএব আমার কাছে তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

এখন লক্ষ্য করুন, এ আয়াতসমূহে প্রয়োজনীয় নিদর্শনাবলী দেখানোর বিষয়ে কত স্পষ্ট ও অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে এমন প্রকাশ্য নিদর্শন দেখানো হবে যা তোমরা অনায়াসে ভালভাবে সনাক্ত করে নেবে। কেউ যদি বলে, আযাবের নিদর্শন সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো একদিন পূর্ণ হবে। আর আমরা এ-ও স্বীকার করি, সেসব প্রতিশ্রুতি তখনই পূর্ণও হয়ে গেছে যখন খোদা তাআলা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্বল ও অসহায় অবস্থাকে দূর করে দিলেন, গুটি কয়েকজন থেকে তাদেরকে কয়েক হাজারে পরিণত করে দিলেন এবং তাদের মাধ্যমে মক্কার সেই কাফেরদের সবাইকে নিপাত করে দিলেন যারা মক্কায় তাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার-অনাচারের যুগে অতি অহংকারভরে বারবার আযাবের নিদর্শন চেয়েছিল। কিন্তু (প্রশ্ন হলো) এসব নিদর্শন ছাড়া আঁ হযরত (সা.) অন্যান্য নিদর্শনও দেখিয়েছিলেন এর প্রমাণ কুরআন থেকে কোথায় পাওয়া যায়? অতএব জানা উচিত নিদর্শনাবলী দেখানোর উল্লেখ কুরআন করীমের বহু জায়গায় এসেছে। কোন কোন জায়গায় পূর্বে দেখানো নিদর্শনাবলীরও উল্লেখ করেছে। দেখুন আয়াত كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ **কামা লাম ইউমিনূ বিহি আওওয়ালা মাররাতিন** [অর্থাৎ প্রথমেও (যেমন) তারা তার সত্যতার নিদর্শন দেখে তার প্রতি ঈমান আনেনি–অনুবাদক (সূরা আন্‌আম: ১১১)]। কোন কোন জায়গায় অবিশ্বাসীদের অন্যায়-অবিচারের কথা উল্লেখ করে

৮. 'ইয়াওম' বলতে এখানে এক বছর বুঝায়। বাইবেলেও এ বাগধারা দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঠিক এক বছর পরেই বদরের যুদ্ধের আযাব মক্কাবাসীর উপর অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ।

(নিদর্শনের প্রতি) তাদের এ ধরনের স্বীকৃতি বর্ণনা করেছে : "তারা নিদর্শনাবলী দেখে বলে, 'এটা যাদু'"। দেখুন আয়াত: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ **ওয়া ইইয়ারাও আয়াতান ইউ'রিযু ওয়া ইয়াকূলূ সিহরুম মুসতামির** (সূরা কামার: ৩)। কোন কোন জায়গায় নিদর্শনাবলী দেখে অবিশ্বাসীরা স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআন তাদের সে সাক্ষ্য তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

**ওয়া শাহেদূ আন্নার রাসূলা হাক্কুও ওয়া জা-য়াহুমুল বাইয়্যনা-ত** (আলে ইমরান: ৮৭) অর্থাৎ 'তারা রসূলের সত্য হওয়ার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। আর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী তাদের কাছে এসে গেছে।' কোন কোন জায়গায় কুরআন কোন কোন নিদর্শন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়। যেমন 'শক্কুল কামার' তথা চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার মু'জিযা। এটি ছিল এক মহান নিদর্শন এবং ঐশী ক্ষমতাবিকাশের এক (অভিনব) দৃষ্টান্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা 'সুরমা চশমে আরিয়া' পুস্তকে তুলে ধরেছি। যিনি বিশদভাবে জানতে চান তিনি দেখে নিতে পারেন। এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে, যেসব লোক আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে সব সময় নিজেদের মনগড়া নিদর্শনের দাবী জানাতো, তাদেরই অধিকাংশ অবশেষে আঁ হযরত (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর (সত্যতার) সাক্ষীও হয়ে গিয়েছিল। কেননা পরিশেষে তারাই আবার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে দীনে ইসলামকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার দিয়েছিল। আর তারাই মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থাবলীতে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করায়। কাজেই এ যুগের লোকদের এটা কতো অদ্ভূত আচরণ যে এরা ইসলামের সেই সব বুযুর্গদের অজ্ঞতার যুগের অস্বীকারগুলো আপত্তিরূপে বার বার তুলে ধরে। অথচ তারা এগুলো পরিহার করে তওবা করেছিলেন। কিন্তু এরা তাঁদের সেসব সাক্ষ্য মেনে নেয় না যা তাঁরা সত্য পথে আসার পর তুলে ধরেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ তো চতুর্দিকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে। এগুলো কিভাবে গোপন থাকতে পারে? যেসব মু'জিযা সাহাবা কিরামের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত, কেবল সেগুলোই তিন হাজার সংখ্যায় রয়েছে, আর ভবিষ্যদ্বাণী তো প্রায় দশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক হবে যা নিজ নিজ সময়ে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং হয়ে চলেছে। তাছাড়া কুরআন করীমের এমন বিপুল সংখ্যক মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা এ যুগেও আমাদের জন্য প্রকাশ্য বিষয়াদির মত প্রতীয়মান হয়। কেউ এগুলো অস্বীকার করতে পারবে না। অতএব এগুলো : (১) আযাবের নিদর্শন হিসেবে যে-সব মু'জিযা সে-সময়ের কাফিরদের দেখানো হয়েছিল

সেগুলো আমাদের জন্যও প্রকৃতপক্ষে এমনই নিদর্শন বিশেষ যাকে চাক্ষুষ নিদর্শনই বলা চলে। কেননা এগুলো অতি নিশ্চিৎ ভূমিকা সমূহের চূড়ান্ত এক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বিশেষ, যা পক্ষ ও বিপক্ষ কেউ-ই কখনও অস্বীকার করতে পারে না। আর মু'জিযার ভিত্তিরূপে এ ভূমিকাটি এত স্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধ যে এসব আযাবের নিদর্শন সে-সময় চাওয়া হয়েছিল যখন আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর গুটিকয়েক সাথী মক্কায় সত্যের প্রচারের দরুন নিজেরা শত সহস্র কষ্টে ও দুঃখ-দুর্ধশায় জর্জরিত অবস্থায় ছিলেন। সেদিনগুলো ইসলাম ধর্মের এমন দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের দিন ছিল যে স্বয়ং মক্কার কাফিররা হাসি বিদ্রুপ করে মুসলমানদের বলে বেড়াতো, 'তোমরা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক তাহলে আমাদের হাত দিয়ে তোমরা কেন এত দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিমূলক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছো? আর যে খোদার ওপর তোমরা ভরসা করে থাক তিনি কেন তোমাদের সাহায্য করেন না? কেন তোমরা এত অল্পসংখ্যক দল হয়ে আছ যা অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে? তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের ওপর কেন আযাব অবতীর্ণ হয় না? এসব প্রশ্নের উত্তরে মুসলমানদের সেই চরম সঙ্কটপূর্ণ সময়ে কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় যা কিছু কাফিরদের বলা হয়েছে তা হলো সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অসাধারণ মাহাত্ম্যকে বুঝার জন্য দ্বিতীয় ভূমিকা। সে যুগটি ছিল আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) জন্যে এত নাজুক যে প্রতিনিয়ত তাদের প্রাণ নাশের আশঙ্কা ছিল এবং চারদিক থেকে বিফলতা তাদের ঘিরে ফেলছিল। সুতরাং এরূপ যুগে কাফেরদের বারবার আযাবের নিদর্শন চাওয়ার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় তাদের বলে দেয়া হয়েছিল, অচিরে ইসলামের বিজয় ও তোমাদের শাস্তিপ্রাপ্তির নিদর্শন তোমাদের দেখানো হবে। আর ইসলাম যে এখন এক বীজের মত দেখা যায় তা একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আর যারা আযাবের নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে তারা তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারে কাটা পড়বে এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কুফরী মতবাদ ও কাফেরদের থেকে পরিষ্কার করা হবে। আর সর্বৈব ক্ষমতা মু'মিনদের হাতে এসে যাবে। খোদা তাআলা দীন-ইসলামকে আরব দেশে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যে প্রতিমা-উপাসনা আর কখনও সৃষ্টি হবে না। বর্তমান ভীতির অবস্থা সম্পূর্ণভাবে শান্তি ও নিরপত্তায় বদলে যাবে। আর ইসলাম শক্তি লাভ করবে এবং প্রবলতর হতে থাকবে। অবশেষে অন্যান্য দেশে নিজ বিজয় ও সাহায্যের ছায়া ছড়িয়ে দেবে এবং দূর-দূরান্ত ব্যাপী এর বিজয়ধারা প্রবাহিত হয়ে পড়বে। (ইসলামের) এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা দুনিয়ার শেষ মহূর্ত অবধি বিলুপ্ত হবে না।

এখন যে-ব্যক্তি এ নিদর্শনের ভূমিকামূলক উভয় অংশে দৃষ্টি নিক্ষেপে জেনে নেবে, যে যুগে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়েছিল তখন ইসলামের কী রকম দুর্দশা, বিফলতা ও বিপদের অবস্থা ছিল। আর যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা তখনকার অবস্থার কত বিপরীত ও কল্পনাতীত বরং প্রকাশ্যভাবে নিছক অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এরপর শত্রু ও মিত্রের হাতে সংরক্ষিত ইসলামের ইতিহাসের দিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকালে তারা দেখতে পাবেন স্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। অগণিত মানবহৃদয়ে এর প্রতাপপূর্ণ প্রভাব পড়েছে এবং পৃথিবীর পূর্বাংশে ও পশ্চিমাংশে সর্বাত্মক শক্তি ও পরাক্রমের সাথে এর প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটেছে। কাজেই তারা এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সর্বোতভাবে একটি সুনিশ্চিত চাক্ষুষ মু'জিযা বলে আখ্যা দেবে যাতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

(২) কুরআন মাজীদের যে দ্বিতীয় মু'জিযা আমাদের জন্যে প্রকাশ্য ও চাক্ষুষ বিষয়সুলভ মর্যাদা রাখে তা হলো সেইসব অদ্ভূত পরিবর্তন যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন করীমের কল্যাণময় অনুবর্তিতায় ও আঁ হযরত (সা.)-এর সাহচর্যের প্রভাবে সাহাবা কিরামের জীবনে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন এ বিষয়টিতে লক্ষ্য করি যে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে এসব লোক কিরূপ ছিল এবং তারা কী রীতিনীতি ও স্বভাব চরিত্রের লোক ছিলেন, তারপর আঁ হযরত (সা.)-এর সাহচর্য ও কুরআন করীমের অনুবর্তিতার কল্যাণে তারা কী রূপ ধারণ করেছিলেন। নৈতিক চরিত্রে, আকীদা-বিশ্বাসে, চালচলনে ও আচার-আচরণে এবং সব ধরনের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যে মন্দ অবস্থা থেকে বেরিয়ে পবিত্র অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অতএব যে মহান ও আসাধারণ প্রভাব তাদের মরচে ধরা অস্তিত্বকে এক অদ্ভূত সজীবতা ও উজ্জ্বলতা দান করেছিল তা দেখে স্বীকার করতে হয় এ রূপান্তর এক অলৌকিক ব্যাপার ছিল যা খোদা তাআলার বিশেষ হস্তক্ষেপে সাধিত হয়েছিল। কুরআন মজীদে খোদা তাআলা বলেন, 'আমি তাদের মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে জীবিত করি। জাহান্নামের গহ্বরে পড়ে যেতে দেখে তাদের ভয়াবহ অবস্থা হতে উদ্ধার করি। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করে সুস্থ করে তুলি। অন্ধকারে দেখতে পেয়ে তাদের আলো দান করি।' খোদা তাআলা এ অলৌকিকতাকে তুলে ধরার জন্য কুরআন করীমে এক দিকে আরবের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে নানা ধরনের খারাপ অবস্থায় ছিল সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্য দিকে এ লোকদের সেই পবিত্র অবস্থাবলীও বর্ণনা করেছেন যা ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ কুফরীর যুগে

তাদের পূর্বাবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং এর পাশাপাশি তাদের সেই সব অবস্থা পাঠ করবে যা ইসলাম গ্রহণের পর দৃশ্যমান হয়েছিল সে তাদের উভয় ধরনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সুনিশ্চিতভাবে বুঝে যাবে যে এ পরিবর্তন হলো এমন এক অলৌকিক ব্যাপার যা মু'জিযা বলে অভিহিত হওয়া উচিত।

(৩) কুরআন শরীফের যে তৃতীয় মু'জিযা আমাদের সামনে রয়েছে তা হলো এর শাশ্বত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব। এসবই এর মর্মস্পর্শী, প্রাঞ্জল ও বাগবিদগ্ধ ভাষায় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মু'জিযাটি কুরআন করীমে অতি জোরালোভাবে ও জাঁকজমকের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সব শ্রেণীর মানুষ ও জিন একত্র হয়েও এর সদৃশ (কিতাব) প্রণয়ন করতে চাইলে তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। এ মু'জিযার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, তেরশ' বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে তবু আজ অবধি কুরআন মজীদের এ আহ্বান দুনিয়ার সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং সজোরে ঢাক বাজিয়ে **'হাল মিন মুবারিয'** (কোন প্রতিদ্বন্দ্বি আছে কি) বলে চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোন দিক থেকে কখনো কোন সাড়া শব্দ শোনা যায় না। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সমগ্র মানবীয় শক্তি কুরআন মজীদের মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম। বরং কুরআন করীমের শতশত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাত্র একটি উপস্থাপন করে যদি এর সদৃশ্য চাওয়া হয় তা হলে দুর্বল ভিত্তিবিশিষ্ট মানবকুলের পক্ষে এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশেরও সদৃশ্য উপস্থিত করা কখনো সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ কুরআন করীমের একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো পবিত্র কুরআন যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের আধার। হক ও হিকমত (সত্যতা ও প্রজ্ঞা) সংক্রান্ত এমন কোন ধর্মীয় সত্যতা নেই যা কুরআন করীমে মজুদ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন ব্যক্তি কে আছে যে উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্য কোন গ্রন্থ দেখাতে পারে? এ বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে অর্থাৎ কুরআন মজীদ যে সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় তত্ত্বাবলীর আকর তাহলে সে সন্দেহপোষণকারী খ্রিষ্টান হোন বা আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী হোন বা নাস্তিক তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আশ্বস্ত হতে পারেন। আমরা আশ্বস্ত করানোর জন্য দায়বদ্ধ। শর্ত এটুকুই তিনি যেন সত্যান্বেষী হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাইবেলে যতগুলো পবিত্র তত্ত্ব রয়েছে অথবা দার্শনিকদের পুস্তকে যত প্রকার সত্য ও প্রজ্ঞার কথা রয়েছে তা (যত দূর সম্ভব) আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে অথবা হিন্দুদের বেদ ইত্যাদিতে ঘটনাচক্রে যেসব সত্য এসে গেছে বা আসেনি তবে যেগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি অথবা সূফীদের শতশত কিতাবে

হিকমত ও মা'রেফতের যতগুলো তত্ত্বকথা আমরা অবহিত হয়েছি তা সবই কুরআন করীমে দেখতে পাই। এসব তত্ত্ব-তথ্য বরাবর ত্রিশ বছর ব্যাপী অতি গভীর ও ব্যাপক গবেষণায় আমাদের আয়ত্ত হয়েছে। এতে আমাদের কাছে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনের প্রভাব রাখে এমন কোন আধ্যাত্মিক সত্য নেই যা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ কেবল আমাদেরই অভিজ্ঞতা নয় বরং এটাই কুরআন করীমের দাবী। এর যাচাই বাছাই কেবল আমিই করিনি বরং শত সহস্র বিজ্ঞ উলামা শুরু থেকে করে আসছেন। তারাও এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন।

(৪) কুরআন শরীফের চতুর্থ মু'জিযা হলো এর সেই সব আধ্যাত্মিক প্রভাব, যা এতে চিরসংরক্ষিত রয়েছে। অর্থাৎ এর অনুবর্তীগণ ঐশী গ্রহণযোগ্যতার উঁচু মর্যাদায় উপনীত হয়ে থাকেন এবং ঐশী বাক্যালাপে তাদের ভূষিত করা হয়। খোদা তাআলা তাদের দোয়া শোনেন এবং স্নেহ ও কৃপাভরে তাদের উত্তর দান করেন। আর অদৃশ্যের কতিপয় গোপন কথা নবীদের মত তাদেরও অবহিত করেন। নিজ সাহায্য ও সহায়তার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে অন্যান্য লোকের তুলনায় তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেন। এটি এমন এক নিদর্শন যা কিয়ামতকাল অবধি উম্মত মুহাম্মদীয়ায় কায়েম থাকবে। অতএব এটি সর্বদা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এখনও বিদ্যমান রয়েছে ও নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াতে এখনও এমন ব্যক্তি রয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে নিজ বিশেষ সাহায্য-সমর্থনে সামর্থ্যবান করে স্বচ্ছ ও সত্য ইলহাম, সুসংবাদ ও কাশ্ফ তথা দিব্যদর্শনে ভূষিত করে থাকেন।

এখন হে সত্যান্বেষী ও সত্য নিদর্শনাবলীর জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিরা! ন্যায়বিচারের চোখ দিয়ে দেখ এবং একটু পবিত্র চিত্তে চিন্তা কর, আল্লাহ্ কর্তৃক কুরআন মজীদে বর্ণিত নিদর্শনাবলী যে কত উচ্চ পর্যায়ের ও কত উঁচু মানের এবং এগুলো প্রত্যেক যুগের জন্যই কত দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতুল্য। আগের নবীদের মু'জিযা সমূহের এখন আর চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। সেগুলো কেবল কেসসা কাহিনী মাত্র। সেগুলোর মৌলিকতা কতটুক সঠিক তা খোদা তাআলাই ভাল জানেন। বিশেষত ইঞ্জিলে লেখা হযরত মসীহর মু'জিযাসমূহ গল্প-কাহিনীরূপে অতিরঞ্জিত হওয়ার পাশাপাশি এমন সব সন্দেহ সংশয়ের লক্ষ্যস্থল, যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এগুলোকে দেখানো বড়ই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও আমরা যদি বড়জোর স্বীকারও করে নেই প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোতে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে যেমন বর্ণিত হয়েছে খোঁড়া, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ ইত্যাদি রুগী তাঁর

ছোঁয়াতে ভাল হয়ে যেতো এসব বর্ণনাই অতিশয়োক্তি শুন্য ও বাস্তবে সংঘটিত এবং এর অন্য কোন অর্থ নেই তবু এতে হযরত মসীহর বড় কোন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। প্রথমত সে কালে এমন একটি পুকুরও ছিল যাতে এক বিশেষ সময়ে ডুব দিলে ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী তৎক্ষণাৎ সাধারণভাবে সব রোগবালাই দূর হয়ে যেতো। তাছাড়া দীর্ঘ যুগের গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে রোগবিলুপ্তিকরণের নিপুণতা (ও যোগ্যতা) অন্যান্য বিদ্যার মতই এক ধরনের বিদ্যা। এতে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ লোক এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে প্রচন্ড মনোসংযোগ ও মানসিক শক্তি ব্যয় করার ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্মোহিত করার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অতএব নবুওয়তের সাথে এ বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এক্ষেত্রে মহা-পুণ্যবান ব্যক্তি হওয়াও জরুরী নয়। প্রাচীনকাল থেকে এ বিদ্যা প্রচলিত হয়ে চলে আসছে। মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ বুযুর্গ যেমন **'ফুসূসুল হিকাম'** পুস্তক প্রণেতা মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী এবং নকশবন্দীদের কতিপয় বুযুর্গ একাজে বিশেষ দক্ষ হিসেবে গত হয়েছেন। তারা এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে তাদের সময়কালে তাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। বরং তাদের কারো কারো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তারা তাদের পরিপূর্ণ মনোসংযোগের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সদ্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন করে দেখিয়ে দিতেন[৯] এবং দু' তিন শ' রুগীকে নিজের ডানে বামে বসিয়ে কেবল এক দৃষ্টি নিক্ষেপে সুস্থ করে দিতেন। আর তাদের মাঝে যারা অনুশীলনে দুর্বল হতেন তারা হাত লাগিয়ে বা কাপড় ছুঁয়ে আরোগ্য দান করতেন। এ বিদ্যা চর্চায় সম্মোহনকারী ব্যক্তি রুগীর ওপর প্রভাব ফেলার সময় তাঁর নিজের ভেতর থেকে কোন শক্তি বের হয়ে যেতে অনুভব করতেন। অনেক সময় রুগীরও অনুভব হয় তার ভেতর থেকে একটা বিষয় বা কোন পদার্থ সঞ্চালিত হয়ে দেহের নিম্নাঙ্গে নেমে যাচ্ছে। পরিশেষে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ বিদ্যা প্রসঙ্গে ইসলামী সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আমার ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী থাকতে পারে। সাম্প্রতিককালে ইংরেজরা মেসমেরিজম কৌশলবিদ্যা বের করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও এ জ্ঞানেরই একটা শাখা। ইঞ্জিলে দৃষ্টি দিলে জানা যায়, এ বিদ্যায় হযরত মসীহর কিছুটা দক্ষতা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ছিল না। সে যুগের মানুষ অত্যন্ত সাদাসিধা এবং এ বিদ্যা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এ

৯. মনোসংযোগের কার্যবিধির মাধ্যমে সদ্য মৃতদের কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার জন্যে জীবিত হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী নয়। যেমন আমরা স্বয়ং কোন কোন জীব মরে যাবার পর কোন ওষুধ প্রয়োগে এদের জীবিত হতে চাক্ষুষভাবে দেখে থাকি। সে ক্ষেত্রে আবার মানুষের জীবিত হওয়া কী কঠিন বিষয়! আর কেনই বা কল্পনাতীত হবে?

কারণেই সে যুগে এ বিদ্যার আমলকে সীমাতিরিক্ত প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যতই এ বিদ্যার স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে, ততই মানুষের এ সম্পর্কীয় বিশ্বাসে ভাটা পড়তে থাকে। পরিশেষে অনেকে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন এ ধরনের চর্চার মাধ্যমে রুগীদের সুস্থ করা বা উন্মাদদের আরোগ্য দান করা মোটেও বড় কোন বিষয় নয়। বরং এ ক্ষেত্রে ঈমানদার হওয়াও জরুরী নয়। নবুওয়ত বা বেলায়াতের অনুকূলে এটি কোন প্রমাণ হতে পারে তা দূরের কথা। তাদের এটাও মন্তব্য যে, দৈহিক রোগব্যাধি নির্মূলকরণ কার্যবিধির পরিপূর্ণ চর্চা বা অনুশীলন এবং এ কাজেই নিজেকে রাতদিন নিয়োজিত রাখা রূহানী উন্নতির জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। কাজেই এ শ্রেণীর ব্যক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা ও তরবিয়তের কাজ খুব কমই হয়ে থাকে। তার আত্মিক জ্যোতির্ময় শক্তির চরম অবনতি ঘটে। ধারণা হতে পারে এ কারণেই বুঝি হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর আধ্যাত্মিক তরবিয়ত ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অতি দুর্বল সাব্যস্ত হন। যেমন পাদ্রী টেইলার সাহেব যিনি পদর্মাদার দিক দিয়ে আর সেই সাথে নিজস্ব (সহজাত) যোগ্যতার কারণে একজন স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হন তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করে লিখেছেন, হযরত মসীহর রূহানী তরবিয়ত ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল বলে সাব্যস্ত হয়। হাওয়ারী নামে অভিহিত তাঁর সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্যরা তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের গড়ে ওঠার এবং মানবীয় বৃত্তিগুলোর পূর্ণ বিকাশের কোন উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন নি। (হায়! হযরত মসীহ্ যদি তাঁর সেই বাহ্যিক রোগ-ব্যধি বিলুপ্তিকরণের কাজটির দিকে কম মনোযোগ দিতেন আর সে মনোসংযোগকেই নিজের শিষ্যদের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রোগব্যাধি নিরসণে প্রয়োগ করতেন, বিশেষত ইহুদা ইস্ক্রিউতির ক্ষেত্রে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিজ্ঞ পাদ্রী সাহেব এ-ও বলেন, আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের সাথে আধ্যাত্মিক তরবিয়ত তথা শিক্ষাদীক্ষা লাভ ও ধর্মীয় দৃঢ়তা দেখানোর বিষয়ে হাওয়ারীদের তুলনা করলে আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে হরযত মসীহর শিষ্যগণ আধ্যাত্মিকভাবে সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত অপরিপক্ক ও পশ্চাদপদ। হযরত মসীহর সাহচর্য তাদের মানসিক ও আত্মিক শক্তিগুলোর তেমন কোন বিকাশ ঘটাতে পারে নি, যা আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মোকাবিলায় একটুও প্রশংসনীয় হতে পারতো। বরং হাওয়ারীদের পদেপদে কাপুরুষতা, বিশ্বাসের দুর্বলতা, মানসিক সংকীর্ণতা, পার্থিব লোভলালসা ও অবিশ্বস্ততা সংঘটিত হতে থাকে। কিন্তু আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন নবীর অনুসারীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অতএব এটা

পরিপূর্ণভাবে সাধিত সেই তরবিতেরই প্রভাব ছিল যা তাদের সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিল। তেমনিভাবে বহুসংখ্যক জ্ঞানী গুণী ইংরেজ সম্প্রতি তাদের প্রণীত পুস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আরবী নবী (সা.) সম্পর্কে বহুল বর্ণিত তাঁর মু'জিযাসমূহ থেকে পৃথক করে আমরা যদি কেবল আল্লাহতে তাঁর মনোনিবেশ ও নির্ভরশীলতা, তাঁর সহজাত দৃঢ়চিত্ততা, তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র শিক্ষা, ঐশী প্রভাবশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অসংখ্য মানুষকে তাঁর সুধরে দেয়া এবং তাঁর প্রতি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ঐশী সাহায্য-সহায়তার বিষয়গুলোই লক্ষ্য করি তাহলেও আমাদের ন্যায়বিচার বোধ আমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত উক্ত বিষয়গুলোও অলৌকিক ও মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। আর সত্য ও প্রকৃত নবুওয়তকে সনাক্ত করার সপক্ষে এগুলো জোরালো ও যথেষ্ট নিদর্শন বটে। খোদা তাআলা কোন মানুষের সহায়ক না হলে সে এসব বিষয়ে কখনো পরিপূর্ণতা ও সফলতা লাভ করতে পারে না, এমন দৃশ্য ও অদৃশ্য সাহায্য-সহায়তায় ভূষিতও হতে পারে না।

## তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (সা.) কখনো কোন নিদর্শন লাভ করেননি। যেমন সূরা আনকাবূতে উল্লেখিত রয়েছে : 'আর তারা বলে, কেন তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রতি নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হলো না? অর্থাৎ কোন একটিও না', (কেননা এ আয়াতে **'লা নাফিয়া জিনস'** রয়েছে যা কোন একটি শ্রেণীর সবটাকেই অস্বীকার করে)। আর সূরা বণী ইস্রাঈলেও রয়েছে : 'পূর্ববর্তীরা নিদর্শন অস্বীকার করেছে বিধায় তা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছি'। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, খোদা কোন মু'জিযা দান করেননি। প্রকৃতপক্ষে কোন মু'জিযা লাভ করে থাকলে তারা (অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকরা) নবুওয়ত ও কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হতো না?

উত্তর: খ্রিষ্টান ভদ্রলোক তাঁর ভাষায় বর্ণিত আপত্তিটিতে যে ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করেছেন তা আসলে আপত্তি নয়, বরং তা হলো তিনটি ভুল-বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি যা যথার্থ চিন্তা-ভাবনার অভাবে তার মনে দানা বেঁধেছে। নিম্নে আমরা সেই সব বিভ্রান্তি নিরসন করছি: প্রথম বিভ্রান্তির নিরসনে উত্তর হলো, সত্য নবীর আদৌ এ চিহ্ন নয় যে, খোদা তাআলার মত প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে স্বকীয়ভাবে তাঁরও জানা থাকবে। বরং অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব ক্ষমতায় ও নিজ সহজাত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অদৃশ্যে জ্ঞানবান অর্থাৎ আলেমূল গায়েব হওয়া

কেবল আল্লাহ্ তাআলার সত্তারই বৈশিষ্ট্য। আদিকাল থেকে **'আহলে হক'** (সত্যের ধারক প্রকৃত জ্ঞানীগণ) **'ওয়াজেবুল ওয়াজুদ'** (অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে অস্তিত্ববান) খোদার গায়েবের জ্ঞান সম্বন্ধে **'ওয়াজুবে যাতি'** তথা আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য বলে আকীদা রাখেন এবং অন্যসব সৃষ্টজীবের বেলায় আবশ্যিকভাবে অসম্ভব এবং আল্লাহ্ **'আযযা ইসমুহু'র** মাধ্যমে সম্ভব বলেও বিশ্বাস পোষণ করেন। অর্থাৎ 'আলেমুল গায়েব' হওয়া খোদা তাআলার সত্তার জন্য অপরিহার্য বরং তাঁর অনাদি অনন্ত সহজাত বৈশিষ্ট বলেই তাদের বিশ্বাস। কিন্তু সমূদয় সৃষ্টবস্তু যাদের অস্তিত্ব স্বভাবত ধ্বংসশীল **(হালেকা তুযযাত)** এবং যাদের মৌলিকতা অবাস্তব **(বাতেলাতুল হাকীকাত)** উক্ত গুণে এবং অন্যান্য ঐশী গুণাবলীতেও মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের অংশীদার হওয়া জায়েয (বৈধ) নয়। কেননা সত্তার দিক দিয়ে যেমন সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের শরীক হওয়া অসম্ভব, তেমনি গুণাবলীর দিক দিয়েও অসম্ভব। অতএব যারা সৃষ্টজীবের অন্তর্ভুক্ত তাদের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্বের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলেমুল গায়েব' হওয়া অসম্ভব বিষয়াদির শামিল, তারা নবীই হোন বা মুহাদ্দাস (ঐশীবাণী প্রাপক) অথবা ওলী। তবে আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম যোগে অদৃশ্য, অজানা বিষয় ও রহাস্যাদি জানার সৌভাগ্য চিরকালই বিশিষ্ট মনোনীত বান্দারা লাভ করে এসেছেন। আর এটা আমরা একমাত্র আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারীদের মাঝেই বিদ্যমান বলে দেখতে পাই। অন্য কারও মাঝে দেখতে পাই না।

আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম এভাবেই জারী রয়েছে যে, তিনি কখনো কখনো নিজ গোপন বিষয় ও রহস্যাদির কিয়দংশ তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জ্ঞাত করে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ নির্ধারিত সময়ে তাঁদের ওপর 'গায়েব' তথা অদৃশ্যের কল্যাণ-ধারা থেকে মৃদু বর্ষণ হয়ে থাকে। বরং এর মাধ্যমেই আল্লাহর পরিপূর্ণ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের নিরীক্ষা ও সনাক্ত করা হয় অর্থাৎ কোন কোন সময় ভবিষ্যতের গোপন বিষয়াদি বা কিছু গুপ্তরহস্য সম্পর্কে তাদের জানানো হয়। কিন্তু এমনটি তাদের ক্ষমতা বা ইচ্ছায় হয় না। বরং কেবল খোদা তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতা ও ইচ্ছায় এসব নেয়ামত (কল্যাণ) তারা লাভ করে থাকেন।

যারা তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী চলেন ও তাঁরই হয়ে যান এবং তাঁর মাঝেই বিলীন হয়ে যান, তাদের সাথে সে অসীম কল্যাণময় খোদার রীতি এমনটি রয়েছে যে অধিকাংশ সময়ই তাদের (দোয়া) শোনেন এবং নিজের অতীত কাজ অথবা ভবিষ্যতের ইচ্ছা তাদের কাছে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক জানানো ছাড়া (নিজে নিজে) তাদের কিছুই জানা হয় না। তারা যদিও খোদা তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে

থাকেন, কিন্তু তারা তো খোদা নন। কেবল বোঝালেই বোঝেন, জানালেই জানেন, দেখালেই দেখেন, বলালেই বলেন। তারা নিজ সত্তায় কিছুই নন। মহান ঐশীশক্তি যখন নিজ ইলহাম (তথা বাণী)-এর মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তখনই তারা বলেন। আর যখন তাদের দেখানো হয় তখনই তারা দেখেন। আর যখন শোনানো হয় তখনই তারা শোনেন এবং খোদা তাআলা যতক্ষণ কোন গোপন বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত না করেন ততক্ষণ সে বিষয় সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা থাকে না। নবীদের সবার জীবনবৃত্তান্তে এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হযরত মসীহ (আ.)-এর দিকেই লক্ষ্য করুন কিভাবে তিনি তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, 'সেই দিন ও মুহূর্ত সম্বন্ধে পিতা ছাড়া আকাশে বিদ্যমান ফেরেশতারাও জানে না এবং পুত্র ও অন্য কেউও জানে না' (মার্ক, অধ্যায় ১৩, শ্লোক ৩২)। তিনি আরও বলেন, 'আমি নিজে থেকে কিছুই করি না (অর্থাৎ কিছু করতে পারি না)। কিন্তু যা আমার পিতা আমায় শিখিয়েছেন কেবল সেসব কথাই আমি বলি। কাউকে সত্যপরায়ণদের মর্যাদায় উপনীত করা আমার সাধ্যাতীত। আমাকে কেন পুণ্যবান বল? পুণ্যবান কেবল একজনই অর্থাৎ খোদা' (মার্ক, অধ্যায় ১০, শ্লোক ৮)।

মোটকথা, কোন নবী সার্বভৌম ক্ষমতাবান অথবা আলেমূল গায়েব (অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত) হওয়ার দাবী করেননি। লক্ষ্য করুন সেই অক্ষম বান্দার দিকে যাকে মসীহ্ হিসেবে অভিহিত করা হয়, আর অজ্ঞ সৃষ্টি উপসকরা যাকে খোদা হিসেবে মনে করে বসেছে তিনি যে একজন দুর্বল ও কমজোর বান্দা এবং মৌলিক ভাবে কোনো গুণের অধিকারী নন তা তিনি কিরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সুপ্রকাশিত করেছেন! আর সর্বশেষ যে স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর জীবন অধ্যায়ের অবসান ঘটে তা কত মনোরম ভাষায় বিদ্যমান! সুতরাং ইঞ্জিলে লিখা আছে, তিনি (তাঁর গ্রেফতারী পরওয়ানার খবর পেয়ে) উদ্বিগ্ন হলেন ও অত্যন্ত মর্মপীড়ায় জর্জরিত হতে লাগলেন এবং তাদের (অর্থাৎ হাওয়ারীদের) বললেন, মৃত্যুর ন্যায় আমার মর্মবেদনা বোধ হচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন (অর্থাৎ সিজদা করেন) এবং দোয়া করেন, 'সম্ভব হলে এ মুহূর্তটি যেন আমার ওপর থেকে টলে যায়। হে পিতা, সবই তোমার পক্ষে সম্ভব। এ পেয়ালা আমার কাছ থেকে টলিয়ে দাও অর্থাৎ তুমি সর্বশক্তিমান এবং আমি দুর্বল ও অক্ষম বান্দা। তুমি টলালে এ বিপদ টলে যেতে পারে।' অবশেষে তিনি **'এলি এলি লিমা সাবাকতানি'** বলে প্রাণ দিলেন। এ ব্যক্যটির অনুবাদ হলো, হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! আমায় কেন ছেড়ে দিলে?' (মথি, অধ্যায় ২৭, শ্লোক ৪৬)

এখন দেখুন দোয়া যদিও কবুল হয়নি কেননা, 'তকদীর মুবরাম' তথা অপরিবর্তনীয় নিয়তি ছিল, একজন অক্ষম অসহায় সৃষ্টজীবের পক্ষে সৃষ্টিকর্তার চূড়ান্ত ইচ্ছার মুখে কী-ই বা করার ছিল! কিন্তু হযরত মসীহ্ তাঁর বিনয় ও বন্দেগীর স্বীকৃতিকে এ আশায় চরম সীমায় পৌঁছে দেন যে হয়তো কবুল হয়ে যাবে। আগে থেকেই যদি তাঁর জানা থাকতো যে দোয়া অগ্রাহ্য হবে এবং কখনো গৃহীত হবে না, তাহলে তিনি সারারাত ভোর পর্যন্ত নিজের সুরক্ষার জন্য কেনই বা দোয়া করলেন? আর কেনইবা নিজেকে এবং তাঁর শিষ্যদেরও অতি তাগিদের সাথে এ বৃথা কষ্টের মধ্যে ফেললেন?

অতএব আপত্তি উত্থাপনকারীর উক্তি অনুযায়ী তাঁর (অর্থাৎ হযরত মসীহর) মনে এ ধারণাই ছিল যে পরিণাম সম্পর্কে খোদা তাআলাই জানেন। তিনি (কিছুই) জানেন না। তেমনি গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ্‌র জ্ঞান না থাকায় কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাঁর ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত বলেই সেগুলো সঠিক বলে সাব্যস্ত হতো না। যেমন, তিনি বলেছিলেন 'নতুন সৃষ্টির মাঝে যখন মনুষ্যপুত্র নিজ প্রতাপের সিংহাসনে আসীন হবেন তখন (হে আমার দ্বাদশ হাওয়ারী) তোমরাও বারোটি সিংহাসনে আসীন হবে' (মথি, অধ্যায় ২০, শ্লোক ২৮)। কিন্তু এ ইঞ্জিল থেকেই স্পষ্টত জানা যায়, ইহুদা ইস্কিউতির ভাগ্যে সে সিংহাসন জুটেনি। সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার সংবাদ যদিও সে নিজ কানে শুনেছিল, কিন্তু সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য তার ঘটেনি। অতএব যথার্থভাবে এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সে ব্যক্তির মুর্তাদ হবার ও মন্দ পরিণতি হওয়ার সম্পর্কে হযরত মসীহর পূর্ব থেকে জানা থাকলে কেনইবা তিনি সিংহাসনারোহণের মিথ্যা সংবাদ শুনাতেন? আর তেমনি একবার তিনি দূর থেকে এক ডুমুর বৃক্ষ দেখে এর ফল খাওয়ার ইচ্ছায় এর কাছে গিয়ে দেখেন ও জানতে পারেন এটিতে একটিও ডুমুর নেই। তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগান্বিত অবস্থায় সে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেন। কিন্তু এর কোন কুফল সেটিতে প্রকাশিত হয়নি। গায়েবের জ্ঞান যদি তাঁর থাকতো তাহলে তিনি ফলবিহীন গাছটির দিকে এর ফল খাওয়ার ইচ্ছায় কেনই বা গেলেন?

তেমনি একবার এক মহিলা তাঁর কাপড়ের আঁচল স্পর্শ করলে তিনি চারপাশে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কে আমার আঁচল স্পর্শ করেছে? অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর জানা থাকলে স্পর্শকারীর পরিচয় জানা তাঁর জন্য কোন ব্যাপার ছিল না। আর একবার তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন, 'এ যুগের মানুষ মারা যাবার আগেই এ সবকিছু (অর্থাৎ এ পৃথিবীতে মসীহর পুনরাগমন, নক্ষত্রপাত ইত্যাদি) ঘটে যাবে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না, সে যুগে কোন নক্ষত্রও আকাশ থেকে

পৃথিবীতে (ভেঙ্গে) পড়েনি এবং হযরত মসীহও বিচার কার্যের উদ্দেশ্যে এ দুনিয়ায় আসেননি। সে শতাব্দী কেন, তারপর আরো আঠারোটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় গত হতে চলেছে। অতএব অদৃশ্য বিষয়ে হযরত মসীহ যে অজ্ঞ ছিলেন এ সম্পর্কে এ কয়টি সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এগুলো অন্য কোন কিতাব থেকে নেয়া হয়নি বরং চারটি ইঞ্জিল দেখে আমি লিখেছি। অন্যান্য বনি-ইস্রাঈলী নবীরও একই অবস্থা। হযরত ইয়াকূব (আ.) নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজ গ্রামের (পার্শ্ববর্তী) বনে তার পুত্রের (অর্থাৎ ইউসুফের) ওপর দিয়ে কত কী (বিপদ) ঘটে যাচ্ছিল এর কিছুই জানতে পারেননি। হযরত দানিয়েল নবুখদনিৎসরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তার কাছে প্রকাশ করে দেননি ততদিন সে স্বপ্নের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি।

অতএব এ গবেষণায় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, নবীর একথা বলা যে অমুক বিষয় খোদা জানেন, আমি জানি না। তা সর্বতঃ সত্য ও স্বস্থানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য এবং সর্বতোভাবে এ নবীর মর্যাদা ও তাঁর সত্য উপাসক হওয়ার প্রমাণ বিশেষ। আর এসব কথায় তার নবুয়তের পদমর্যাদায় কোন রকম ত্রুটি ঘটার পরিবর্তে বরং তার মহান প্রভুর সমীপে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। তবে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞাত করানোর মাধ্যমে যেসব ঐশী গোপন রহস্যের বিষয় লাভ হয়ে থাকে এর কতটা আঁ হযরত (সা.)-এর লাভ হয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান আপনার কাম্য হলে আমি এর যথোপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে প্রস্তুত। তওরাত ইঞ্জিল তথা গোটা বাইবেলে নবীদের যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে এর চেয়ে হাজার খানিক হাদীসে লিপিবদ্ধ আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সংখ্যায় ও গুণগত মানে বেশি রয়েছে। যথাযথভাবে সংকলিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। আর সংক্ষেপে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলোর পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক এবং অতি জোরালো ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা কুরআন করীমে মজুদ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত মুসলমানদের হাতে এগুলো কেবল কিসসা কাহিনী রূপেই থেকে যায়নি বরং তারা তো প্রত্যেক শতাব্দীতে বিজাতিদের বলে আসছে এবং এখনও বলে যে, এসব ঐশী কল্যাণ ইসলামে চিরস্থায়ীভাবে অব্যাহত রয়েছে। হে ভাইয়েরা! আসুন প্রথমে পরীক্ষা করুন এরপর গ্রহণ করুন। কিন্তু এই ক্রমাগত আহ্বানের প্রতি কেউ কর্ণপাত করেন না অথচ অকাট্য ঐশী যুক্তিপ্রমাণ তাদের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা তাদের ডাকি, তারা এগিয়ে আসেন না। আমরা তাদের দেখাই তারা দেখেন না। তারা চোখ কান আমাদের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে নিয়েছেন যাতে না শুনেন না দেখেন এবং না হেদায়াত গ্রহণ করেন।

আপত্তিকারীর দ্বিতীয় বিভ্রমটি হলো কুরআন করীমে আসহাবে কাহ্ফ তথা গুহাবাসীদের সম্পর্কে ভুল সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এটা তার নিছক দাবী। কুরআনের বর্ণনাটি কেন ভুল এ সম্পর্কে আপত্তিকারী কিছুই লিখেননি। এর মোকাবেলায় সঠিক বর্ণনা কোন্‌টি এবং তা সঠিক হওয়ার কী যুক্তিপ্রমাণ যাতে তার উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এবং যাতে এর যথাযথ উত্তর দেয়া যায়, কুরআনের বর্ণনার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীর কোন তত্ত্ব-তথ্য থাকলে তা অজুহাত সহ পেশ করা উচিত ছিল। অজুহাত পেশ না করে একে কেবল ভুল বলে আখ্যা দেয়া সত্যান্বেষী ব্যক্তির কাজ নয়।

তৃতীয় বিভ্রম যা আপত্তিকারীর মনে উদ্রেক হয়েছে তা হলো, কুরআন করীমে এক বাদশার ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে, যিনি ভ্রমণ করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে তিনি সূর্যকে কর্দমাক্ত এক জলাশয়ে ডুবে যেতে দেখতে পেলেন। এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান মহোদয় রূপক বিষয় থেকে বাস্তবের দিকে ঘুরে গিয়ে এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সূর্য এতো বিশাল হয়েও এমন ছোট্ট কর্দমাক্ত জলাশয়ে কী করে লুকালো? তার এ কথাটি এমনই যেমন কেউ যদি বলে, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ (আ.)-কে খোদার ভেড়া বলে লেখা আছে এটা কী করে হতে পারে? ভেড়া তো এমন কেউই হতে পারে যার মাথায় সিং এবং দেহ জুড়ে পশম ইত্যাদিও থাকবে এবং সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় অধোমুখ হয়ে বিচরণ করবে। আর সে সেইসব কিছু খাবে যা ভেড়া খেয়ে থাকে।

হে মহোদয়, আপনি কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনলেন কুরআন করীম কর্দমাক্ত জলাশয়ে সূর্য ডুবে ছিল বলে দাবী করেছে? কুরআন করীম তো কেবল কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা তুলে ধরার পদ্ধতিতে এটুকু বলেছে, সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে ডুবছে বলে মনে হয়েছে। এতে কেবল সে ব্যক্তির পর্যবেক্ষণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সে এমন এক জায়গায় পৌঁছলো যেখানে সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূর্য কোন পাহাড় কিম্বা জনপদ বা বৃক্ষরাজির আড়ালে লুকোতে দেখা যাচ্ছিল না, বরং কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তমিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। এমনটি বলার উদ্দেশ্য হলো, সে জায়গায় নিকটবর্তী কোন জনপদ বৃক্ষরাজি বা পাহাড়-পর্বত ছিল না। যত দূর ব্যাপী দৃষ্টি কাজ করে এসব কিছুর কোনটির চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে দেখা যায় নি। কেবল বিস্তর এক কর্দমাক্ত জলাশয় ছিল যাতে সূর্য অস্তমিত হতে দেখা যায়।

এ আয়াতগুলোর পূর্বাপর বিষয়বস্তুর যোগসূত্রের দিকে লক্ষ্য করুন, এখানে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধানের বর্ণনাও রয়েছে বটে। তবে (তথ্যগতভাবে) কেবল এক

ব্যক্তির দূরদূরান্ত ব্যাপী ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে। আর এসব বিষয় বর্ণনা করার মাধ্যমে মূলত এ (ঐতিহাসিক) তথ্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে সে ব্যক্তি এক অনাবাদ এলাকায় পৌঁছেছিলেন। অতএব এ ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব তথ্যের প্রসঙ্গ তুলে দেয়া একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বই আর কী? যেমন কেউ যদি বলে, 'আজ রাতে মেঘ ইত্যাদি না থাকায় আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল এবং তারকাগুলো আকাশের বিন্দু কণার মত ঝলমল করতে দেখাচ্ছিল। আর সে জ্যোতির্বিদ্যার বই পুস্তক খুলে বসে এবং এ বলে ঝগড়া বাঁধায় তারকা কি বিন্দু কণার সমান? তার এই কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ বলে গণ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য বাস্তবধর্মী বিষয় বর্ণনা করা নয় বরং মানুষের রূপকার্থে কথা বলার ন্যায় সে-ও এ কথাটি বলেছে। হে যারা নিজেদের 'ইশায়ে রব্বানী' (ইস্টার) অনুষ্ঠানে হযরত মসীহর রক্ত পান কর এবং তাঁর মাংসও খেয়ে থাক তোমরা কি রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে এখনও জান না প্রতিটি দেশে মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনে রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারের দুয়ার যে সুপ্রশস্ত তা সবারই জানা? 'ওহী ইলাহী' রূপকাশ্রিত সেইসব বাগধারাই অবলম্বন করে যা জনসাধারণ সরলভাবে নিজেদের দৈনন্দিন প্রাসঙ্গিক কথোপকথনে অবলম্বন করে থাকে। সর্বত্র দর্শনের সূক্ষ্ম পরিভাষার অনুসরণ করা ঐশীবাণীর নিয়মিত পদ্ধতি নয়। কেননা জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করেই তার বক্তব্য। তাই মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বুঝার ক্ষমতানুযায়ী এবং তাদের বাগধারায় কথা বলা আবশ্যক। শাশ্বত সত্য সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্ব এবং অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ বর্ণনা করা যথাস্থ। কিন্তু বাগধারা ছেড়ে দেয়া এবং প্রচলিত রূপক ও অলঙ্কারিক ভাষা সম্পূর্ণ পরিহার করা কখনো সে ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নয় যার জন্য জনমানবের রুচি অনুযায়ী কথা বলা তার পদাধিকার মূলক অবশ্য কর্তব্য। যাতে তারা তার কথা বোঝে এবং তাদের হৃদয়ে তা রেখাপাত করে। কাজেই এটা সর্বস্বীকৃত যে, এমন কোন ঐশী গ্রন্থ নেই যাতে রূপকাশ্রিত বাগধারাকে পরিহার করা হয়েছে বা এমনটি করা সঙ্গত বলে গণ্য করা হয়েছে। দুনিয়াতে কোথাও কি কোন ঐশীবাণী এমনটি এসেছে? আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই, আমরা নিজেরা দৈনন্দিন কথোপকথনে শত শত রূপক ও অলঙ্কারিক ভাষায় কথা বলে থাকি এবং কেউ এতে আপত্তি উত্থাপন করে না। যেমন বলা হয়ে থাকে : 'হেলাল' (প্রথম রাতের চাঁদ-অনুবাদক) চুলের মত সরু; তারকাগুলো বিন্দু কণাবৎ; চাঁদ মেঘের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে কিংবা 'এখনই দিনের উদয় হলে সূর্য এ বেলায় এক হাত পরিমাণ উপরে ওঠেছে অথবা আমরা পোলাওয়ের এক গামলা বা শরবতের এক গ্লাস খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু এসব কথায় কারো মনে এ খট্‌কা বাঁধে না, হেলাল কী করে চুলের মত সরু হতে পারে?

তারকাগুলো কিভাবে বিন্দুবৎ হতে পারে? অথবা চাঁদ কী করে মেঘের ভেতর লুকোতে পারে? প্রবল বেগবান সূর্য তো এক মুহূর্তে শতসহস্র মাইল দ্রুত বেগে চলে। সে এক বেলায় কী করে মাত্র এক হাত পরিমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে? কিংবা পোলাওয়ের গামলা খাওয়াতে বা শরবতের গ্লাস পান করায় কেউ এমনটি মনে করে না যে গামলা ও গ্লাস টুকরো টুকরো করে খেয়েছে। বরং এটাই মনে করবে এগুলোর মধ্যে যে পোলাও বা শরবত রয়েছে কেবল তাই খেয়েছে। অত্যন্ত পরিষ্কার বিষয়ে আপত্তি তোলা কোন বিজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীও পছন্দ করেন না। ন্যায়পরায়ন খ্রিষ্টানদের কাছে আমরা নিজেরা শুনেছি এ ধরনের আপত্তি তাদের মাঝে সেইসব লোকই করে থাকে যারা অজ্ঞ অথবা চরম পর্যায়ের গোঁড়া। আল্লাহর বাণীতে রূপকভাবে কোন কিছু বর্ণিত হলে সেটিকে (স্থূল) বাস্তবার্থে ধরে নিয়ে আপত্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা কি কোন সত্যান্বেষীর পরিচয় হতে পারে? এভাবে তো কোন ঐশী গ্রন্থই আপত্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না। সামুদ্রিক জাহাজে সফরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন এ বিচিত্র দৃশ্য দেখে থাকেন যে সূর্য পানি থেকেই উদিত হয় এবং পানিতেই অস্ত যায়। আর এমনটি দেখে তারা প্রায়শ একে অন্যকে বলে থাকেন, 'এটি উদিত হলো, আবার পানিতেই ডুবে গেলো।' এখন এটা স্পষ্ট যে, এ কথোপকথনের সময় জ্যোতির্বিদ্যার বই পুস্তক তাদের সামনে খুলে সৌর জগতের তথ্য ফলাতে বসার মানে হলো উত্তরে এ কথা শোনা: 'হে পাগল! এ জ্ঞান কি কেবল তোমারই জানা? আমাদের জানা নেই?'

খ্রিষ্টান মহোদয় কুরআন করীমের বিরুদ্ধে তো আপত্তি করলেন কিন্তু ইঞ্জিলের সেসব জায়গার কথা ভুলে গেলেন যেগুলোতে সত্যি সত্যি ও যথার্থই আপত্তি ওঠে। যেমন উদাহরণ রূপে দেখুন মথি ও মার্কের ইঞ্জিলে লেখা আছে "মসীহকে তোমরা মানুষের বিচার কার্যের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে তখন নামতে দেখবে যখন সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে চাঁদ তার আলো দেবে না ও নক্ষত্রগুলো (আকাশ থেকে পৃথিবীতে) খসে পড়বে।" এখন জ্যোতির্বিদ্যাই এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায় যে সব তারকা পৃথিবীতে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে পড়লে সেগুলোর আঘাতে কি মানুষের কোন কষ্ট বা ক্ষতি হবে না বরং সবাই তখন নিরাপদ ও জীবিতই থাকবে? অথচ একটি নক্ষত্রের পতন ঘটলেও পৃথিবীবাসীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া এটাও চিন্তা করার বিষয় যে নক্ষত্ররাজির পতন পৃথিবীবাসীকে যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে তখন 'আমাকে তোমরা মেঘ পুঞ্জে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে'– হযরত মসীহর এ উক্তি কী করে সত্য সাব্যস্ত হবে? মানুষ যখন সহস্র সহস্র নক্ষত্রের নিচে চাপা পড়ে মরে পড়ে থাকবে তখন মসীহকে অবতীর্ণ হতে কে দেখবে? আর পৃথিবী যে নক্ষত্ররাজির আকর্ষণেই

প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা কিভাবে নিজ স্বাভাবিক ও সঠিক অবস্থায় বজায় থাকবে? আর মসীহ্ (ইঞ্জিলে যেমন লেখা আছে) কী করে মানোনীত লোকদের দূর দূর থেকে আহ্বান করবেন এবং কাদের তিনি তিরস্কার ও সতর্ক করবেন? কেননা নক্ষত্ররাজির পতন তো প্রকাশ্যভাবে সবার মৃত্যু ও সবকিছুর ধ্বংস বরং গোটা পৃথিবীর ওলট পালট হয়ে যাওয়ার কারণ হবে। এখন লক্ষ্য করুন, (ইঞ্জিলের) এসব বর্ণনা জ্যোতির্বিদ্যার পরিপন্থী কি না? তেমনি জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে আরো একটি আপত্তি ওঠে। সেটি হলো মথির ইঞ্জিলে লিখা আছে, 'যে নক্ষত্রটি তারা (অর্থাৎ অগ্নি উপাসকরা) ইউরোপে দেখেছিল সেটি তাদের সম্মুখ দিয়ে এগোচ্ছিল। আর যেখানে ছেলেটি (অর্থাৎ শিশু মসীহ) ছিল সেখানে গিয়ে থেমে গেল' (মথি, অধ্যায় ২, শ্লোক ৯)।

এখন খ্রিষ্টান মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে দিন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী এ অদ্ভূত তারকাটির নাম কী, যা অগ্নি উপাসকদের পদাঙ্কে ও তাদের সাথে সাথে চলতো? আর এটা কী ধরনের চলা এবং এর সে কী রকম গতি ছিল? আর এভাবে এর চলা (জোতির্বিদ্যার) কোন্ নিয়ম নীতি অনুযায়ী সাব্যস্ত ও স্বীকৃত? আমি জানি না মথির ইঞ্জিল এরূপ তারকা সম্পর্কে জ্যোতির্বিদদের পশ্চাদধাবন থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে। কোনো কোনো খ্রিষ্টান মহোদয় নিরূপায় হয়ে এ উত্তর দেন, "এটি হযরত মসীহর উক্তি নয়, বরং মথির ভাষ্য। আর এটিকে আমরা ঐশীবাণী বলে বিশ্বাস করি না।" এটি এক চমৎকার উত্তর। এতে ইঞ্জিলের ঐশীবাণী হওয়ার মুখোশ খুলে গেছে। আর আমি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিয়েও বলছি এটা যদিও মসীহর উক্তি নয়, বরং এটি মথির ভাষ্য। কিন্তু (ঐশীবাণী বলে স্বীকৃত) হযরত মসীহর সেই উক্তিওতো হুবহু এরই মত ও এরই অনুরূপ (যা ইতঃপূর্বে আমার পক্ষ থেকে আপত্তিসহ বর্ণিত হয়েছে)। সম্ভব হলে সেটিকেই জ্যোতির্বিদ্যার নিয়ম বিধি সম্মত বলে সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিন। আর সেই সাথে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে এ ভাষ্যটি ঐশীবাণী নয়, বরং মানুষের পক্ষ থেকে ইঞ্জিলে মিশানো হয়েছে। এমতে যেসব ইঞ্জিল আপনাদের হাতে রয়েছে সেগুলোকে আপনারা কেন আবার এগুলোর যাবতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত করেন? কেন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন না যে হযরত মসীহর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি কথা ছাড়া ইঞ্জিলে আর যা কিছু লেখা আছে তা সবই সংকলনকারীরা কেবল তাদের খেয়াল খুশিমত ও নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী লিখেছেন? এগুলো ভুল-ত্রুটিমুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন কিনা পাদ্রী সাহেবানের সাধারণ লেখা থেকে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে এ অভিমতটির সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি ছড়ানো হয়েছে অর্থাৎ সর্ব সম্মতিক্রমে ইঞ্জিলগুলোর সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে এগুলোতে

ঐতিহাসিকভাবে যেসব মু'জিযার উল্লেখ পাওয়া যায় তা কোনো ঐশীবাণী নয় বরং ইঞ্জিল সংকলকগণ নিজেদের ধারণা বা শ্রুতি ইত্যাদি বাহ্যিক সূত্রগুলোর মাধ্যমে লিখে দিয়েছেন। মোটকথা পাদ্রী সাহেবান তাদের এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে আক্রমণগুলো থেকে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই চারি ইঞ্জিলের প্রত্যেকটিতে এর প্রায় দশ ভাগই মানুষের বাণী এবং মাত্র একভাগ খোদার বাণী বলে মেনে নিয়েছেন। আর এসব স্বীকৃতির কারণে তাদের যেসব ক্ষতি বরণ করতে হয়েছে সেগুলোর একটি হলো, যিশুর মু'জিযাসমূহ তাদের হাতছাড়া হয়ে পড়েছে। এ সব মু'জিযার কোনো সন্তোষজনক সনদ ও পর্যাপ্ত প্রমাণ তাদের কাছে আর থাকলো না। কেননা ইঞ্জিল লিখকগণ যদিও ঐতিহাসিকভাবে কেবল নিজেদের পক্ষ থেকে সাজিয়ে মসীহর মু'জিযাসমূহ ইঞ্জিলগুলোতে লিখেছেন। কিন্তু ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত মসীহর নিজস্ব বর্ণনা হাওয়ারীদের বর্ণনার সর্বতোভাবে বিপরীত ও পরিপন্থী বরং এগুলো স্ববিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়। কারণ ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত মসীহ্ তাঁর নিজস্ব বর্ণনায় জায়গায় জায়গায় মু'জিযা দেখাতে কেবল অস্বীকারই করেছেন এবং মু'জিযা প্রার্থনাকারীদের কোন মু'জিযা দেখানো হবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হিরোডিসও মসীহর কাছে মু'জিযা দেখতে চাইলে তিনি তাকে তা দেখান নি। তেমনি আরও অনেকে তাঁর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছে এবং নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর কাছে অনুরোধও করেছে। কিন্তু তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন এবং কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। বরং তিনি ইহুদীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে সারা রাত জেগে খোদা তাআলার কাছে নিদর্শন প্রার্থনা করেন। কিন্তু এ নিদর্শনটিও তিনি লাভ করতে পারেন নি এবং তাঁর দোয়া অগ্রাহ্য করা হয়।

এরপর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলে ইহুদীরা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে নিবেদন জানায় তিনি যদি এ মুহূর্তে ক্রুশ থেকে জীবিতাবস্থায় নেমে আসেন তাহলে তারা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তিনি (ক্রুশ থেকে) নামতে পারেন নি। অতএব এ যাবতীয় ঘটনা থেকে সুস্পষ্টত প্রতিভাত হয়, ইঞ্জিলে যে কতিপয় ঐশীবাণী রয়েছে তা হযরত মসীহর মু'জিযার অধিকারী হওয়ার অস্বীকার করে। আর যদি এমন কোন বাণী থাকেও যা মসীহ্র মো'জিযার অধিকারী হওয়ার ধারণা দিতে পারে তা আসলে বহুবিধ অর্থ-বোধক বাক্য। এগুলোর প্রত্যেকটির বিভিন্ন রকম আরো অর্থও হতে পারে। আর যেসব মু'জিযা ইঞ্জিল প্রণয়নকারীগণ নিজস্ব ভাবে বর্ননা করেছেন সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থে নেয়াও আবশ্যিক বলে মনে হয় না অথবা এগুলোকে অহেতুক জোর করে সেইসব মু'জিযার সত্যায়ন হিসেবে গণ্য করাও জরুরী বলে সাব্যস্ত হয় না। আর বিশেষভাবে মসীহর মুখ নিঃসৃত এমন

কোনো বাক্য নেই যা সুস্পষ্টভাবে মু'জিযাগুলোর বাস্তবায়ন সাব্যস্ত করে। বরং হযরত মসীহর জোরালো ও বিশেষ বিশেষ বাক্য এ সাক্ষ্যই দেয় যে তাঁর পক্ষ থেকে কোন একটি নিদর্শনও প্রকাশিত হয় নি। [কুরআন শরীফে কেবল সেই মসীহর নিদর্শনাবলীর সত্যায়ন রয়েছে যিনি কখনো খোদা হওয়ার দাবী করেন নি। কেননা মসীহ (নামে) একাধিক ব্যক্তি হয়েছেন এবং হয়ে থাকবেন। তা ছাড়া পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ব্যাপক অর্থবোধক সত্যায়ন কখনো ইঞ্জিল লিখকদের বর্ণনার সত্যায়ন নয়]। অবাক লাগে, খ্রিষ্টানরা কেন হযরত মসীহর সেইসব বাণীতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন না যেগুলো হযরত মসীহর বিশেষ বাণী ও ঐশীবাণী এবং তাঁরই মুখনিঃসৃত বলে অভিহিত। আর যেগুলো ঐশীবাণী নয় বলে খ্রিষ্টানরা নিজেরা স্বীকার করেন সেগুলোতে তাঁরা কেন আস্থা রাখেন? বরং যেগুলো কেবল ঐতিহাসিক ধারায় ইঞ্জিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত অথচ সর্বতোভাবে ঐশীবাণীর বহির্ভূত এবং ঐশীবাণীর বাক্যাবলীর সাথে যেগুলো বিরোধপূর্ণ সেগুলোর ওপরই কেন তারা অতি মাত্রায় জোর দেন? অতএব ঐশীবাণী এবং অ-ঐশীবাণীমূলক বাক্যাবলীতে পারস্পরিক বিরোধ থাকলে এর প্রতিকারের এক মাত্র পথ হলো যেসব বাক্য ঐশীবাণী নয় সেগুলো অনাস্থাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সেগুলোকে কেবল ইঞ্জিল প্রণয়নকারীদের অতিশয়োক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে বিশ্বাসোপযোগী মনে করা হবে না। সুতরাং ইঞ্জিলের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অতিশয়োক্তি করা একটা সুস্পষ্ট বিষয়। যেমন যোহনের ইঞ্জিলের সর্বশেষ শ্লোকটি হলো: যীশুর আরও অনেক কর্মকান্ড রয়েছে। সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিখা হলে সেসব বর্ণনাসম্বলিত পুস্তক জগতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। দেখুন এ যে কতো ভয়ঙ্কর অতিশয়োক্তি : 'পৃথিবী ও আকাশসমূহের মত সব অদ্ভুত কর্মকান্ড তো এ জগতে সঙ্কুলান হয়ে গেলো কিন্তু মসীহর তিন কি আড়াই বছর স্থায়ী জীবনের ঘটনাবলীর দুনিয়াতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। যারা এ ধরনের অতিশয়োক্তি করেন তাদের বর্ণনা কী করে আস্থাভাজন হতে পারে?

হিন্দুরাও তাদের অবতারদের সম্পর্কে এ ধরণের বই-পুস্তকই রচনা করেছিলো। আর সেগুলোতে তারা সুকৌশলে মিথ্যার বেসাতি সাজিয়ে দিয়েছিলো। এর দরুন এ জাতির ওপরও অত্যন্ত তীব্র ও জোরালো প্রভাব পড়েছিল। সুতরাং দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাম ও কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে। সংকলিত যেসব পুস্তক অজস্র মিথ্যায় ভরা থাকে সেগুলো হলো প্রকৃতপক্ষে সেইসব কবরের মত যা উপর দিয়ে খুব পালিশ করা হয় এবং দেখতে সাদা-ঝকঝকে কিন্তু ভিতর দিয়ে খালি হয়ে থাকে। এগুলোর ভিতরের অবস্থা শত শত বছর পরবর্তী লোকেরা কী করেই বা জানতে পারতো, যাদের হাতে এসব স্বরচিত

বই-পুস্তক এখন কল্যাণজনক ও নিঃস্বার্থ দেখিয়ে তুলে দেয়া হয় যেন এ অবস্থায় ও আকারেই এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এগুলোর সমষ্টি আসলে কিভাবে তৈরী করা হয়েছে সে সম্পর্কে ওরা কীই বা জানতো। দুনিয়াতে এমন প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন লোক অতি বিরল যারা সব পর্দা ভেদ করে ভেতরে গভীরে ঢুকে যায় ও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয় এবং চোরকে ধরে ফেলে। বস্তুত বানানো মিথ্যার যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত মানবাত্মা এতো বেশি সংখ্যক যে তা অনুমান করা কঠিন। এভাবেই এক জগৎ (বিরাট জনগোষ্ঠী) ধ্বংস হয়ে যায় এবং হয়ে চলেছে। অজ্ঞ লোকেরা কোন কিছুর প্রমাণসিদ্ধ বা প্রমাণবিহীন হওয়ার জরুরী বিষয়টিতে এতটুকুও মনোযোগ নিবদ্ধ করেনি এবং মানবীয় ফন্দি দুরভিসন্ধি ও প্রক্ষেপ সংক্রান্ত মানুষের মাঝে যে একটা চিরায়ত স্বভাবজাত প্রবণতা আদিকাল থেকে চলে আসছে সে সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে চায় নি। আর এভাবেই শয়তানের ফাঁদে তারা নিজেদের জড়িয়েছে। কোন সরল সোজা ব্যক্তির কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে তাকে দশ বিশ লাখ টাকার সোনা বানিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কথিত সেই ধূর্ত রাসায়নিকের মত এ জাতীয় ফন্দিবাজ প্রতারকরাও অজ্ঞ লোকদের সত্য ও পবিত্র ঈমান হরণ করে এবং বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই এমন এক মিথ্যা বুযুর্গি ও মিথ্যা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এভাবে শেষমেষ তারা প্রতারণা, ধূর্ততা ও সংসারপূজায় 'নফসে আম্মারার' (তথা মন্দ কাজের আদেশ দানকারী আত্মার -অনুবাদক) পথ অনুসরণের মাধ্যমে এদেরকে নিজেদের চেয়েও নিকৃষ্ট বানিয়ে দেয়।

পরিশেষে এ গুঢ়তত্ত্বটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে সংঘটিত অলৌকিক ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এক কণা পরিমাণ সাক্ষ্য মসীহর মু'জিযা ইত্যাদি সম্পর্কে ইঞ্জিলের এক বিরাট স্তুপের চেয়ে এ কারণেই সহস্রগুণ অধিক মর্যাদা রাখে। কেননা সব গবেষক পাদ্রীর স্বীকৃতি অনুযায়ী ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা হলো স্বয়ং হাওয়ারীদের নিজেদেরই কথা। তদুপরি সেগুলো তাদের স্বচক্ষে দেখাও নয় এবং কোথাও বর্ণনাকারীদের কোন 'সনদ'ও (অর্থাৎ ধারাবাহিক শৃঙ্খলও) তুলে ধরা হয় নি। আর কোথাও স্বচক্ষে দেখার দাবীও করা হয় নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে আঁ হযরত (সা.)-এর মু'জিযা সম্পর্কে যাকিছু লিখা হয়েছে তা সবই বিশেষভাবে স্বয়ং পরম সত্যবাদী ও পবিত্র খোদা তাআলার নির্দোষ সাক্ষ্য বিশেষ। তা যদি কেবল একটি আয়াতই হতো তবুও যথেষ্ট হতো। কিন্তু সব প্রশংসা আল্লাহরই যে এ সব সাক্ষ্য সারা কুরআন জুড়ে রয়েছে। এখন তুলনা করে দেখা আবশ্যক কোথায় খোদা তাআলার পবিত্র সাক্ষ্য যেখানে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আর কোথায় (ইঞ্জিলগুলোর) বানানো প্রকাশ্য মিথ্যা ও

অতিশয়োক্তিপূর্ণ সাক্ষ্যসমূহ। **'বনাযদীক দানায়ে বেদার দেল। ফার্সী জূয়ে সীম বেহতার আয সাদ তোদা গিল'**। (অর্থাৎ বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে স্বর্ণের একটি উৎস শত স্তূপ মাটির চেয়েও উত্তম-অনুবাদক)। মনগড়া বানানো কথায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমন অনেক কিছুই ঘটেছে এবং ঘটে থাকে।

স্বয়ং খ্রিষ্টানগণ নিজেরাই স্বীকার করেন প্রারম্ভিক যুগে তাদের মাঝে অনেকেই নিজেদের প্রণীত পুস্তকে তাদের বুযুর্গদের সম্পর্কে বহু ধরনের বৈশিষ্ট্য লিখে সে সব পুস্তক খোদা তাআলার প্রতি আরোপ করতে থাকেন। তারপর দাবী করে দেয়া হতো যে এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) কিতাব[১০]। অতএব খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের যখন এমন জালিয়াতি করার পুরাতন অভ্যাসই চলে আসছে তখন মথি ইত্যাদি ইঞ্জিলগুলোকে কেনই বা এ অভ্যাসের (গন্ডীর) বাইরে

১০. ইঞ্জিলগুলোতে হযরত মসীহ্র অলৌকিক কাণ্ড (মু'জিযা) সম্পর্কে যে সব অসঙ্গত ও প্রমাণবিহীন অতিশয়োক্তি এবং তাঁর সম্পর্কে যে সব অযথা প্রশংসা পরিলক্ষিত হয় এ সব বিষয় ইঞ্জিলগুলোতে কবে এবং কোন সময়ে সংযোজিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা কঠিন। যদিও খ্রিষ্টানরা স্বীকার করেন যে স্বয়ং ইঞ্জিন প্রণয়নকারীগণই এ সব কথা নিজ পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন। কিন্তু এ অধমের ধারণা, এ সব টীকা টিপ্পনি ধীরে ধীরে সংযোজিত হয়েছে এবং জালিয়াতকারী প্রতারকরা পরবর্তীতে এর প্রচুর সুযোগ লাভ করে থাকে। তবে স্থায়ীভাবে যে কয়টি জালি পুস্তক ঐশীবাণী বলে খ্যাতি লাভ করেছে সেগুলো খ্রিষ্টান ও ইহুদী মহোদয়গণ প্রারম্ভিক কালেই প্রণয়ন করে প্রকাশ করে ছিলেন। সুতরাং এ জালিয়াতির সুবাদেই একটি ইঞ্জিলের পরিবর্তে বহু সংখ্যক ইঞ্জিল প্রকাশিত হলো। স্বয়ং খ্রিষ্টানদেরই বর্ণনা যে মসীহ্র পরবর্তীকালে অনেকগুলো জাল ইঞ্জিল প্রণীত হয়েছে। যেমন– এগুলোর মধ্যে একটি বর্ণবাসের ইঞ্জিলও রয়েছে। এ হলো খ্রিষ্টানদের বর্ণনা। কিন্তু আমার মতে (উল্লেখিত) এ ইঞ্জিলসমূহে এবং প্রচলিত চারটি ইঞ্জিলে যেহেতু বহুল পরিমাণে স্ববিরোধ রয়েছে, এমনকি বর্ণবাসের ইঞ্জিল মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বলেও অস্বীকার করে এবং ত্রিত্ববাদের মতবাদেরও বিরোধী এবং মসীহর ঈশ্বরত্ব ও পুত্রত্বের বিশ্বাসটিও স্বীকার করে না। আখেরু যযামান নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় সুসংবাদ দেয়। কাজেই খ্রিষ্টানরা যে ইঞ্জিনগুলোকে প্রচলিত করেছিল সেগুলোই সত্য এবং যেগুলো এর বিরোধী তা সবই মিথ্যা তাদের এই প্রমাণ বিহীন দাবীটি কী করে মেনে নেয়া যায়? তাছাড়া খ্রিষ্টানদের মধ্যে যখন জালিয়াত করার এতই জোরে শোরে প্রচলন ছিল যে কিছু সংখ্যক সিদ্ধহস্ত ওস্তাদ গোটা গোটা ইঞ্জিলও নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা করে সাধারণভাবে জাতির মাঝে প্রকাশ ও বিস্তার দিয়েছেন এবং এতে করে তাদের গায়ে (কলঙ্কের) ছিঁটা ফোটাও পড়েনি। তাই তাদের কাছে কোন কিতাবকে প্রক্ষিপ্ত করে ফেলা কোন ব্যাপারই ছিল না। তদুপরি এও যখন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে মসীহ্র জীবদ্দশায় এসব ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ হয় নি বরং মসীহর মৃত্যুর ষাট-সত্তর বছর পর অথবা বর্ণনার ভিন্নতা অনুযায়ী এর কিছু কম বা বেশি সময় পর চার ইঞ্জিলের সমষ্টি দুনিয়ায় জন্মলাভ করে, এতে করে এ ইঞ্জিলগুলোর সম্পর্কে আরও অধিক সন্দেহের উদ্রেক হয়। কেননা এ বিষয়ের প্রমাণ দেয়া কঠিন যে সে সময় পর্যন্ত হাওয়ারীগণ জীবিত ছিলেন অথবা তাদের শক্তি-সামর্থ্য বহাল ছিল। এখন আমি এ সব কেস্সা সংক্ষেপ করে পাঠকদের এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বারটি ইঞ্জিল জাল এবং যে চারটি ইঞ্জিল তারা প্রচার করছেন এগুলো জালিয়াতি ও প্রক্ষেপ মুক্ত এ বিষয়টির খ্রিষ্টানগণ কখনও সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেননি। বরং এ চারটির সম্পর্কেও তারা নিজেরা স্বীকার করেন যে এগুলো খোদা তাআলার নিখুঁত বাণী নয়। তারা যদি এমনটি স্বীকার নাও করতেন তবুও ইঞ্জিলগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কেননা অন্য ইঞ্জিলগুলো জাল এবং এ চারটি জাল নয় এ বিষয়ের প্রমাণের দায়ভার তাদের ওপর ন্যাস্ত। এ থেকে তারা এখনো মুক্ত হতে পারেন নি।

রাখা হবে এর কোন কারণ আছে বলে জানা যায় না। অথচ সেই মহাজনের মত, যার দিনপঞ্জি ও খাতাপত্র যেমন হিসাবের প্রকাশ্য গরমিল ও সন্দেহ-সংশয়ের দরুন (নিজ) গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়, তদ্রূপ এ চার ইঞ্জিলের প্রত্যেকটি থেকেই (উল্লেখিত তাদের) সেই কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ছে যা তারা গোপন করতে চেয়েছিল। এ কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকায় চিন্তাশীল লোকদের মনে সন্দেহ-সংশয়ের এক ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। আর যে ত্রুটিপূর্ণ, পরিবর্তিত ও জড় খোদার দিকে ইঞ্জিল মানুষকে আহ্বান জানায় তা গ্রহণ করার চেয়ে নাস্তিক হিসেবে থাকা তারা বেশি পছন্দ করে। সুতরাং আমার এক জ্ঞানী ইংরেজ বন্ধু আমেরিকা থেকে তার কয়েকটি পত্রের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে সেসব দেশে বিজ্ঞ লোকদের এমন কেউ নেই যিনি খ্রিষ্টধর্মকে ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্যত ও আগ্রহী নন। আর যদিও খ্রিষ্টানরা বিকৃত ও প্রক্ষিপ্তভাবে কুরআন করীম অনুবাদ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশ করেছে তথাপি এতে যে নূর লুকিয়ে আছে তা পবিত্রচেতা লোকদের হৃদয়ে কাজ করছে। মোটকথা, আমেরিকা ও ইউরোপ আজকাল এক অস্থির অবস্থায় রয়েছে। ইঞ্জিলের প্রকৃত সত্যের বিরোধী বিশ্বাসগুলো তাদের দারুণ অস্থিরতার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। অবশেষে তাদের কেউ কেউ এ ধারণাও প্রকাশ করেছে যে মসীহ বা ঈসা নামে আসলে কখনো কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করেন নি। বরং এতে সূর্যকে বুঝায় এবং বারজন হাওয়ারী বলতে আকাশের বারটি 'বুরূজ' (কক্ষপথ) বুঝায়।

অতঃপর এই খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিশেষত এ বিষয়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে হযরত মসীহ্ ঈমানদারদের জন্য যেসব চিহ্ন নির্ধারণ করে ছিলেন সেগুলোর একটিও এলোকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মসীহ্ বলেছিলেন, তোমরা আমার অনুবর্তিতা করলে প্রত্যেক প্রকার আশিস ও বরকত এবং ঐশীগ্রহণযোগ্যতায় আমারই রূপ ধারণ করে ফেলবে। আর মু'জিযা ও কবুলিয়তের নিদর্শনাবলী তোমাদের দান করা হবে। আর তোমাদের মু'মিন হবার এটাই চিহ্ন হবে যে তোমরা নানা ধরনের ঐশী নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হবে। তোমরা যা চাইবে তোমাদের জন্য তা-ই ঘটবে এবং কোন বিষয়ই তোমাদের জন্য অসম্ভব হবে না। কিন্তু খ্রিষ্টানদের হাতে এসব আশিসের কিছুই নেই। তারা সেই খোদা সম্পর্কে নিছক অজ্ঞ যিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দোয়া শোনেন, স্নেহ ও রহমতপূর্ণ উত্তর সরাসরি তাদের দান করেন ও অদ্ভূত অদ্ভূত কাজ তাদের স্বপক্ষে সাধিত করে দেখান। কিন্তু পূর্ববর্তী সত্যপরায়ণদের যারা স্থলাভিষিক্ত ও

উত্তরাধিকারী খাঁটি মুসলমান তারাও সেই খোদাকে চিনেন, তাঁর রহমতের নিদর্শনাবলী দেখে থাকেন এবং নিজেদের বিরুদ্ধবাদীদের সামনে তাঁরা অন্ধকারের মোকাবেলায় সূর্যের ন্যায় স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। আমরা বার বার লিখে আসছি এ দাবীটিকে প্রমাণবিহীন বলে মনে করা উচিত নয়। সত্য ও মিথ্যা ধর্মের মধ্যে আকাশে একটি পার্থক্য রয়েছে এবং আরেকটি রয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর পার্থক্য বলতে সেই পার্থক্যকে বুঝায় যা মানুষের বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধি এবং এ জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম এর ব্যাখ্যা করে। অতএব খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামকে যখন এ মাপকাঠিতে যাচাই করা হয় তখন স্পষ্টত সাব্যস্ত হয়, ইসলাম হলো সেই প্রকৃতিসম্মত ধর্ম যার নীতি ও শিক্ষায় কোন বানোয়াট ও কষ্টকল্পনার লেশ মাত্র নেই এবং যার হুকুম-আহকামে কোন অভিনব ও কৃত্রিম বিষয় নেই। আর এমন কোন বিষয়ও নেই যা জোরপূর্বক স্বীকার করানো হয়। আর খোদা তাআলা যেমন বহুস্থলে নিজেই বলেছেন, কুরআন শরীফ প্রাকৃতিক বিধানের সমূদয় জ্ঞানতত্ত্ব এবং এর যাবতীয় সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়, এর গভীর রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটন করে এবং এর পরিপন্থী নতুন কোন বিষয় উপস্থাপন করে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরই সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব উন্মোচিত করে। এর বিপরীতে ইঞ্জিলের বরাতে দেয়া খ্রিষ্টানদের শিক্ষা এমন এক নতুন খোদা তুলে ধরছে যাঁর আত্মহত্যায় জগদ্বাসীর গোনাহ ও আযাব থেকে পরিত্রাণ নির্ভরশীল, যাঁর দুঃখকষ্ট সোয়ায় মানুষের সুখ নির্ভরশীল এবং তাঁর বেইজ্জত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় মানুষের সম্মান লাভ নির্ভরশীল বলে ধারণা করা হয়েছে। আবার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন অদ্ভুত খোদা যার জীবনের একাংশ জড়দেহ ও এর দোষত্রুটি মুক্তাবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে এবং তাঁর জীবনের অপরাংশ (কোন অজ্ঞাত দুর্ভাগ্যের কারণে) চিরস্থায়ী জড়দেহ বরণ ও সীমায়িত হওয়ার বন্দীত্বের শিকার হয়ে পড়েছে, এবং রক্ত মাংস হাড় গোড় ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর (আত্মার) জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। আর চিরস্থায়ীভাবে তাঁর এই জড়দেহ ধারণের কারণে তাঁকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়। অবশেষে দুঃখ-কষ্টের আতিশয্যে তিনি মারা যান। তারপর জীবিত হন এবং সেই জড়দেহ আবার তাঁকে ধারণ করে ফেলে যা তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখবে। এর কবল থেকে কখনো তিনি মুক্তি পাবেন না। এখন লক্ষ্য করুন, কোন সৎপ্রকৃতির লোক কি এ বিশ্বাসটিকে গ্রহণ করতে পারে? কোন পবিত্র বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি কি এর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে? প্রাকৃতিক নিয়মের কোন এক কণা পরিমাণও কি নিরঞ্জন ও অপরিবর্তনীয় খোদার ক্ষেত্রে এমন অঘটন ও বিপদ আপদকে বিধেয় বলে সাব্যস্ত করতে পারে যে এক একটি জগতকে সৃষ্টি করতে ও তাদের পরিত্রাণ দিতে তাঁকে সর্বদা এক বার করে

আবশ্যকীয়ভাবে মরতে হয়? আত্মহত্যা ছাড়া তিনি তাঁর কল্যাণ বিতরণের কোন গুণ প্রকাশ করতে পারেন না এবং ইহকালে কি পরকালে কখনো তাঁর সৃষ্টজীবকে কোন সুখ দিতে পারেন না? এটা সুস্পষ্ট যে বান্দাদের প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণের উদ্দেশ্যে যখন তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় তখন এতে সাব্যস্ত হয়, আবশ্যকীয়ভাবে সর্বদা তাঁর মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং আগেও অসংখ্যবার তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকবেন। আর এ কারণে হিন্দুদের পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁর গুণাবলী রহিত হওয়াও সাব্যস্ত হয়। এখন নিজেরাই ভেবে দেখেন, এমন অসহায় ও অক্ষম সত্তা কি খোদা হতে পারেন যিনি আত্মহত্যা ছাড়া তার সৃষ্টজীবকে কখনো এবং কোন যুগেই কোন উপকার করতে পারেন না? দুর্বলতা ও আসহায়ত্বের এহেন অবস্থা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষেত্রে শোভনীয় হতে পারে? অতঃপর দেখুন খ্রিষ্টানদের খোদার মৃত্যুর কী পরিণতি এবং ফলাফল শুণ্য। তাদের খোদার প্রাণ গেল কিন্তু শয়তানের অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়া-কলাপের চুল পরিমাণও নড়চড় হলো না। সেই শয়তান এবং তার চেলা চামুন্ডা যেমন পূর্বে ছিল এখনো তেমনই রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যাচার, মদ্যপান,[১১] জুয়া, পার্থিব মোহ গ্রস্থতা, বেঈমানী, অবিশ্বাস, শেরক, কুফরী, নাস্তিকতা এবং অন্যান্য শত শত অপরাধ মসীহর ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্বে যেমন ছিল তেমনি জোরে শোরে এখনো আছে বরং অনেকগুণ বেশি। যেমন লক্ষ্য করুন, খ্রিষ্টানদের খোদা যখন জীবিত ছিলেন সেই যুগে খ্রিষ্টানদের অবস্থা ভাল ছিল তখনই কিনা সেই খোদার মৃত্যু ঘটলো যা প্রায়শ্চিত্ত বলে অভিহিত। আর তখন

১১. সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়, বৃটিশ রাষ্ট্রে প্রতি বছর তের কোটি ষাট হাজার পাউন্ড অর্থ মদ তৈরী ও মদ্যপানে ব্যয় করা হয় (এবং একজন সাংবাদিক এম. এ.-এর প্রতিবেদনে প্রকাশ যে) মদ্যপানের কারণে লন্ডনে শত শত আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। শুধু লন্ডন নগরীতে বসবাসকারী ত্রিশ লাখের মাঝে সম্ভবত (মাত্র) দশ হাজার লোক হবে যারা মদখোর নয়। নচেৎ নারী পুরুষ সবাই স্বোৎসাহে স্বাধীনভাবে মদ খায় এবং খাওয়ায়। লন্ডনবাসীদের এমন কোন সভা, অনুষ্ঠান ও সমাবেশ নেই যেখানে সবার আগে ব্রাণ্ডী ইত্যাদি মদের বিশেষ আয়োজন করা হয় না। মদ্যপানকে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তদুপরি লন্ডনের বড় বড় পাদ্রী ও প্রধান ব্যক্তিবর্গও ধার্মিক বলে পরিচিত হয়েও মদ্যপানে প্রথম সাড়িতে থাকেন। মি. নিকলেট সাহেবের বদৌলতে যতগুলো অনুষ্ঠানে আমার যোগাদানের সুযোগ ঘটেছে সেসব গুলোতেই অবশ্যই দু চারজন যুবক পাদ্রী এবং রেভারেণ্ডকেও যোগদান করতে দেখেছি। লন্ডনে মাদ্যপানকে কোন দোষের বলে গণ্য করা হয় না এবং এতো প্রকাশ্যে মদ্যপান প্রচলিত যে আমি লন্ডনে ভ্রমণকালে নিজ চোখে অধিকাংশ ইংরেজকে পথে পথে মদের বোতল হাতে উন্মত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তেমনি লন্ডনের সড়কগুলোতে হাতে মদের বোতল ধরা মাতাল অবস্থায় নারীদেরকেও দেখা যায়। রীতিমত ভালো বহু ভদ্র লোককে বাজারে নর্দমা গুলোতেও মদমত্ততায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতেও দেখা যায়। মদ্য পানের বদৌলতে লন্ডনে এত বেশি সংখ্যক আত্মহত্যা সংঘটিত হতে থাকে যে প্রত্যেক বছর এর এক মহামারি লেগে যায় (রাহবারে হিন্দ, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

থেকেই বিস্ময়করভাবে শয়তান এই জাতির ওপর চেপে বসলো এবং পাপাচার, অবাধ্যতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র দুয়ার খুলে গেলো। সুতরাং খ্রিষ্টানগণ নিজেরাই স্বীকার করেন। যেমন 'মিযানুল হক' পুস্তকের প্রণেতা পাদ্রী ফেণ্ডর বলেন, খ্রিষ্টানদের পাপাধিক্য, তাদের অভ্যন্তরীণ দুরাচার, অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম ছড়িয়ে পড়ার কারণেই মুহাম্মদ (সা.) খ্রিষ্টানদের সতর্ককরণ ও শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব এসব বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, বেশির ভাগ অবাধ্যতা ও পাপাচারের ঝড় মসীহর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার পরেই খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রবাহিত হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, মসীহর মৃত্যু এতোদ্দেশ্যে ছিল না যে এতে পাপের তীব্রতায় কিছু ঘাট্‌তি সূচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মানুষ প্রচুর মদপান বা অনেক ব্যভিচার করে থাকলেও এবং সংসারলিপ্ত হলেও মসীহর (ক্রুশীয়) মৃত্যু ঘটার পর সেই সব রকম পাপ দূর হয়ে

---

তেমনিভাবে এক ভদ্রলোক লণ্ডনে সাধারণভাবে সংঘটিত ব্যভিচার এবং (এর ফলে) প্রতি বছর প্রায় সত্তর হাজার সংখ্যায় অবৈধ সন্তান জন্মলাভের কথা উল্লেখ করে এসব লোকের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার অনুল্লেখযোগ্য বিবরণ লিখেছেন। আরও লিখেছেন যে, ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের যদি দশ ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে এদের নয় ভাগ লোকই নাস্তিক। যারা ধর্মের গণ্ডিমুক্ত। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও বিচারদিবসে বিশ্বাসকে তারা বিদায় দিয়ে বসেছে। নাস্তিকতার এ ব্যাধি ইউরোপে দৈনন্দিন বেড়ে চলেছে। আর মনে হয়, বৃটিশ সরকারের উদারনীতি এর প্রতি কোন ঘৃণা পোষণ করে না। অবশেষে কতিপয় কট্টর নাস্তিক পার্লামেন্টে সমাসীন হয়েছে এবং এজন্য কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। পর পুরুষদের যুবতী মেয়েদের চুম্বন খাওয়া শুধু বৈধই নয় বরং ইউরোপের নতুন সভ্যতার একটি শোভনীয় বিষয় বলে স্বীকৃত। কেউ দাবির সাথে বলতে পারে না যে ইংল্যান্ডে এমন কোন নারীও আছেন যাকে তার ভর যৌবনে কোন পরপুরুষ চুম্বন দেয়নি। কতিপয় কট্টর নাস্তিক বৃটিশ পার্লামেন্টের আসনেও বসে গেছেন। প্রকাশ্য নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ইউরোপের নতুন সভ্যতায় সাধারণভাবে স্বীকৃত। আর ওয়েপ আলেকজেন্ডার সাহেব (আমার নামে) এক পত্রে লিখেছেন, সংসারলিপ্ততা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে এ দেশের সে সব লোক যারা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত তাদের মাঝে আমার দৃষ্টিতে এমন একজনও নেই, আখেরাতের প্রতি যার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। বরং তাদের সবাইকে আপাদমস্তক সংসার পূজায় মত্ত বলে দেখা যায়। এখন এসব বর্ননায় স্পষ্ট হয় যে, মসীহর (কথিত) আত্মদানের যেসব সুপ্রভাব পাদ্রী মহোদয়েরা হিন্দুস্তানে গিয়ে সরলচেতা লোকদের শুনিয়ে থাকেন তা সর্বৈব পাদ্রীসাহেবদের বানানো মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য এটাই যে, প্রায়শ্চিত্তের শিক্ষা গ্রহণ করে খ্রিষ্টানদের মনমানসিকতা যেদিকে ধাবিত হয়েছে তা এটাই যে মদ্যপান বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। খোদা তাআলার সেই খাঁটি উপাসনা যা সত্যনিষ্ঠ হয়ে পালন করা হয় এ জাতীয় সব বিষয় উধাও এবং রহিত হয়ে পড়েছে। তবে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ সভ্যতা ইউরোপে অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ পারস্পরিক সামঝোতা বিরুদ্ধ (তথা আওতাবহির্ভূত) যেসব অপরাধ ও অপকর্ম রয়েছে যেমন চুরি, হত্যা ও জোরপূর্বক ব্যভিচার, বলৎকার ইত্যাদি যা রাষ্ট্রীয় আইনে দেশের জনকল্যাণের প্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এসব পাপাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিকার এ কারণবশত নয় যে মসীহর প্রায়শ্চিত্ত এতে কোন প্রভাব ফেলেছে। বরং আইন-কানুনের ভয় এবং সামাজিক চাপেরই প্রভাব রয়েছে। উল্লেখিত বাধানিষেধ না থাকলে খ্রিষ্টান মহোদয়গণ অবাধে সবকিছুই করে বেড়াতেন। তথাপি এসব অপরাধই অন্যান্য দেশের মত ইউরোপেও সংঘটিত হতে থাকে। সার্বিক প্রতিকার হয় এমনতো বলা যায় না।

যাবে। কেননা এ বিষয়টি আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আজ মদ্যপান, জাগতিক মোহগ্রস্ততা, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোতে যে মাত্রায় এসে দাঁড়িয়েছে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো ভাবতে পারেন না যে মসীহর (ক্রুশীয়) মৃত্যুর পূর্বে পাপাচার ও দুষ্কর্মের ঝড় সে হারেই প্রবাহিত ছিল। বরং এর সহস্রতম অংশও প্রমাণ করা যাবে না। ইঞ্জিলগুলোতে গভীর দৃষ্টিপাতে সর্বতোভাবে এ সত্যটি বেরিয়ে আসে যে ইহুদীদের হাতে তিনি ধরা পড়ুন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হোন মসীহ্ তা কখনো চান নি। কেননা তা-ই যদি তাঁর কাঙ্ক্ষিত হতো তাহলে সারা রাত কেন তিনি সেই বিপদটা দূর করে দিতে কাঁদতে থাকেন? কেন তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন হে পিতা, তোমার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, এ পাত্রটি আমা থেকে টলিয়ে দাও। বরং এটাই সত্য যে, মসীহ্ অনিচ্ছায় ঘটনাচক্রে ধরা পড়েন এবং তিনি মৃত্যু ঘটার সময় পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে এ দোয়াই করেন 'এলি এ্যালি লিমা সাবাকতানী'– অর্থাৎ হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি আমাকে কেন ছেড়ে দিলে?

এতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় মসীহ্ জীবিত থাকতে চেয়েছিলেন। দুনিয়াতে আরও কিছু দিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে ছটফট করছিল, যেন কোন উপায়ে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি এই সফরের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে এও চিন্তা করার বিষয় যে খ্রিষ্টানদের সাব্যস্তকৃত ধারায় জাতির খাতিরে মারা যাওয়ায় মসীহর কি-ই বা লাভ হয়েছিল এবং এতে জাতিরই বা কী উপকার সাধিত হয়েছিল? বরং তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জাতির মাঝে অনেক রকম সংশোধনমূলক কাজ করতে পারতেন। বড় বড় দোষ তাদের থেকে দূর করে দেখাতেন। কিন্তু তাঁর এই অকাল মৃত্যুর কারণে শত শত ফেৎনা ও সমস্যার সৃষ্টি হলো এবং এমন সব খারাপির উদ্ভব হলো। তাঁর মৃত্যু এ ছাড়া আর কী-ই বা সাধন করে দেখাল? যার কারণে এক জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলো। এটা সত্য যে সাহসী লোকেরা জাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গও করে থাকেন অথবা জাতির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে ধ্বংসও করে ফেলেন। কিন্তু সেই বৃথা ও অহেতুক ধারায় নয় যা মসীহর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। বরং যে ব্যক্তি বিজ্ঞোচিতভাবে প্রাণ বিসর্জন করেন বা ধ্বংসের মুখোমুখি হন তিনি অবশ্যই আত্মোৎসর্গের জন্য ন্যায়সঙ্গত, পছন্দনীয় ও কল্যাণজনক এবং প্রকাশ্য জনহিতকর কোন উত্তম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এতে তিনি কষ্টের শিকার হোন অথবা নিহতই হোন না কেন তথাপি তার জাতি বিপদাবলী থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তবে এমনটি তো হওয়া উচিত নয় যে, তিনি

ফাঁস নিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে বা কোন কুয়োয় পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করবেন আর মনে করবেন তার আত্মহত্যা জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হবে। এ রকম করাটা তো পাগলদের কাজ। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণদের কাজ হতে পারে না। বরং এ ধরনের মৃত্যু হারাম ও অপমৃত্যু হয়ে থাকে। কোন নিতান্ত অজ্ঞ বা অতি সরল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ রকম ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। আমি সত্য সত্য বলছি, অনেক মানুষের রক্ষার জন্য কোন দৃঢ় সংকল্পশালী সিদ্ধপুরুষের মৃত্যু কোন ন্যায়সঙ্গত ও সুখ্যাত পদ্ধতিতেই ঘটুক না কেন তবুও তা শুভ নয়। বরং তা বিপদের এবং শোকের কারণ। আর সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হতে থাকে তিনি যদি আত্মহত্যার জন্য মনস্থ করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ তাআলার এক মহাপাপী এবং তাঁর পাপ এ রকম অন্যান্য অপরাধীর চেয়েও অনেক কঠিন। অতএব এ শ্রেণীর প্রত্যেক সিদ্ধপুরুষের পক্ষে আবশ্যকীয়ভাবে নিজের জন্য খোদা তাআলার দরবারে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা উচিত। যাতে তিনি মানুষের কল্যাণার্থে সেইসব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন যার উদ্দীপনা তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে দুষ্কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মারা যাওয়া তার জন্য শ্রেয়, যাতে তার দুষ্কর্মের পরিধি বাড়তে না থাকে এবং মানুষ তার নিত্যকার ফেৎনার দরুন ধ্বংস না হয়।

আর যদি প্রশ্ন করা হয়, মানবজাতির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশার্থে সঙ্গত পন্থায় ও জরুরী অবস্থায় সব নবী-রসূলের মাঝে কোন্ নবী নিজেকে অধিকতর ধ্বংসের কবলে ফেলেছেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হতে চেয়েছেন? হযরত মসীহ্ বা অন্য কোন নবী, না কি আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)? তাহলে জেনে রাখুন এ প্রশ্নের উত্তর এক অসাধারণ আবেগ, উদ্দীপনা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আমার হৃদয়ে বিদ্যমান। এটি অনেক দীর্ঘ কলেবর সাপেক্ষ। তাই আমি আক্ষেপের সাথে তা এখানে লিপিবদ্ধ করতে বিরত রয়েছি। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তা বহনে অপারগ। ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর (সর্ব সক্ষম আল্লাহ চাইলে) যদি আয়ু সহায়তা করে তাহলে আগামীতে এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্টভাবে আলাদা এক পুস্তক প্রণয়ন করবো। তবে আমি অতি সংক্ষেপে এখানে সুসংবাদ দিচ্ছি, সেই পূর্ণ মানব যিনি সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গকারী তিনি হলেন আমাদের নবী করীম অর্থাৎ সৈয়্যদনা ও মাওলানা, ওহীদুনা ও ফারীদুনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ উল মুস্তাফা আর রাসূলুন নাবীউল উম্মীউল আরাবীউল কার্শী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (অর্থাৎ আমাদের মনিব, অবিভাবক,

আমাদের প্রিয় ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা, রসূল ও নবী উম্মী কুরায়শী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ।

এস্থলে আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সত্য ও মিথ্যা ধর্মের পার্থক্য নির্ণয়কারী বিষয়সমূহ অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে বিচার নিষ্পত্তি হতে পারে সেগুলোর কিছু লিখে দিয়েছি। কিন্তু স্বর্গীয় নিদর্শনের মাধ্যমে যে পার্থক্য প্রকাশিত হয় তাও এতটাই জরুরী যে তা ব্যতিরেকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা যায় না। আর তা হলো, সত্যধর্মের অনুসারীর সাথে খোদা তাআলার এক বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পরিপূর্ণ অনুসারী ব্যক্তি তার অনুকরণীয় নবীর বিকাশস্থল হয়ে যায়। তাঁর আধ্যাত্মিক গুণ ও অবস্থাবলীর এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও আশিসের এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। আর পুত্রের মধ্যস্থতায় পৌত্রও যেমন পুত্র হিসেবে গণ্য হয় তেমনি যে-ব্যক্তি নবীর অনুবর্তিতার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয় তার সাথেও সে একই কৃপা ও অনুগ্রহ সুলভ আচরণ হয়ে থাকে যেমনটি নবীর সাথে হয়ে থাকে। নবীকে যেমন ঐশী নিদর্শনাবলী দেখানো হয় তেমনি বিশেষভাবে তার তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকেও নিদর্শনাবলী দান করা হয়। অতএব এ রকম লোক সেই ধর্মের সত্যতার স্বপক্ষে এক জীবন্ত নিদর্শন হয়ে থাকেন যে ধর্মের সহায়তার উদ্দেশ্যে তাদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। খোদা তাআলা স্বর্গীয়ভাবে তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন করে থাকেন এবং অধিকহারে তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং কবুলিয়ত সম্পর্কে অবহিতও করেন। তাদের ওপর বিপদাবলীও অবতীর্ণ হয়। তবে সেগুলো তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাদের সমর্থনে অবশেষে ঐশী ক্ষমতা প্রকাশক নিদর্শন অবতীর্ণ হয়। তাঁরা (তাঁর পথে) অপমাণিত হওয়ার পর পুনরায় সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন এবং এক মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে যান যাতে খোদা তাআলার বিশেষ ক্রিয়াসমূহ তাঁদের মাঝে প্রকাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে দোয়া দু'ভাবে কবুল হয়ে থাকে: (১) পরীক্ষামূলকভাবে (২) মনোনয়নমূলকভাবে। পরীক্ষামূলকভাবে তো কখনো কখনো পাপাচারী ও অবাধ্যদের বরং কাফেরদের দোয়াও কবুল হয়ে যায়। কিন্তু এটি নির্ঘাৎভাবে প্রকৃত কবুলিয়তকে বুঝায় না। বরং আকস্মিক ও পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু মনোনয়নমূলকভাবে দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সে দোয়া প্রার্থনাকারী আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং ঐশী মনোনয়নের সার্বিক জ্যোতি ও লক্ষণ তাঁর মাঝে প্রকাশিত হবে। কেননা খোদা তাআলা প্রকৃত কবুলিয়তরূপে অবাধ্যদের দোয়া কখনো গ্রহণ করেন না।

বরং তাঁদেরই কথা শোনেন যারা তাঁর দৃষ্টিতে সত্যপরায়ণ এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকেন। অতএব পরীক্ষামূলক এবং মনোনয়নমূলক দোয়াসমূহের কবুলিয়তের মাঝে পার্থক্য হলো, পরীক্ষামূলকভাবে দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে মুত্তাকী ও খোদাপ্রিয় হওয়ার শর্ত নেই এবং এও জরুরী নয় যে খোদা তাআলা দোয়া কবুল করে তাঁর বিশেষ কথপোকথনের মাধ্যমে এর গৃহীত হওয়ার সংবাদও দান করবেন। সেসব দোয়া এমন উঁচু পর্যায়েরও হয় না যা কবুল হওয়ায় তা কোন বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপার বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যেসব দোয়া মনোনয়নমূলক হওয়ার কারণে কবুল হয় সেগুলোতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নাবলী সুস্পষ্ট হয়ে থাকে:

প্রথমত, প্রর্থনাকারী একজন মুত্তাকী, সত্যপরায়ণ ও সিদ্ধপুরুষ হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, সে দোয়ার কবুল হওয়ার সম্পর্কে ঐশী বাণীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করা হয়।

তৃতীয়ত, গৃহীত এমন অধিকাংশ দোয়া অতি উঁচু স্তরের এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এগুলোর কবুল হওয়ার মাধ্যমে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটা মানুষের কাজ ও মানবীয় চেষ্টা কৌশল নয়, বরং খোদা তাআলার কুদরতের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত যা বিশেষ বান্দাদের স্বপক্ষে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

চতুর্থত, পরীক্ষামূলক দোয়াসমূহ কখনো কখনো বিরলভাবে কবুল হয়ে থাকে। কিন্তু মনোনয়নমূলক দোয়া বিপুল ধারায় কবুল হয়ে থাকে। অনেক সময় মনোনয়নমূলক দোয়ার মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি এমনসব গুরুতর সংকটে আটকে যান যে অন্য কেউ সেগুলোতে জড়িয়ে পড়লে সে আত্মহত্যা ছাড়া উপায়ন্তর খুঁজে পেতো না। সুতরাং এমনটিই বাস্তবে ঘটেও থাকে। যেমন, খোদা থেকে দূর সংসারাসক্ত লোকেরা যখন কখনো বড় বড় কোন দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, রোগ-ব্যাধি ও অসমাধানযোগ্য বিপদাপদে পড়ে যায়, তখন তারা ঈমানের দুর্বলতাবশত খোদা তাআলার প্রতি নিরাশ হয়ে যেকোন ধরণের বিষ খেয়ে ফেলে অথবা কুয়োয় ঝাঁপ দেয় কিংবা বন্দুক ইত্যাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে। কিন্তু এরূপ সংকটময় মূহুর্তে মনোনয়নের মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের ঈমানী শক্তি এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে অতি বিস্ময়কর ধরণের সাহায্য সহায়তা লাভ করেন এবং ঐশী কৃপা এক আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে রক্ষা করে থাকে। তা দেখে অবশেষে অভিজ্ঞ যেকোন ব্যক্তির হৃদয় সায় দিয়ে ওঠে যে তিনি একজন ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত (মহাপুরুষ)।

পঞ্চমত, মনোনয়নযোগ্য দোয়া কবুলের মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষভাবে ঐশী অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে যান। খোদা তাআলা তাঁর সব কাজে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকেন এবং ঐশী প্রেমের জ্যোতি, ঐশীগ্রহণযোগ্যতার মহিমায় বিভোরতা, আধ্যাত্মিক আস্বাদন ও ঐশীপ্রাচুর্য উপভোগের লক্ষণাবলী তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **তা'রিফু ফি ওয়াজূহিহিম নায্রাতান্ নয়ীম[১২] - আলা ইন্না আওলিয়াল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানূন-আল্লাযীনা আমানু ওয়া কা-নু ইয়াত্তাকুন - লাহুমুল বুশ্রা ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাহ্ লা তাবদীলা লিকালিমা-তিল্লাহি যালিকা হুয়াল ফওযুল আযীম[১৩] - ইন্নাল্লাযীনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকা-মূ তাতানায্যালু আলাইহিমুল মালা-য়িকাতু আল্লা তাখা-ফু ওয়ালা- তাহযানূ ওয়া আবশিরূ বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তু'আদূন - নাহ্নু আওলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া ওফিল আখিরাহ্-ওয়া লাকুম ফিহা মা আশতাহী আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন[১৪] - ওয়া ইযা সায়ালাকা ইবা-দী আন্নি ফাইন্নি কারীব উজীবু দাওয়াতিদ্ দায়ি ইযা দায়া-নি ফালইয়াস্তাজীবূলি ওয়াল ইউমিনূবি লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদূন[১৫]।**

---

১২. আল মুতাফ্ফিফীন : ২৫
১৩. ইউনুস : ৬৩-৬৫
১৪. হামীম সিজ্দা : ৩১-৩২
১৫. আল বাকারাহ : ১৮৭

অর্থ– সাবধান, অর্থাৎ অবশ্যই জানবে, যারা আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তাআলাকে সত্যিকারভাবে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে ভালবাসেন তাদের চিহ্ন হচ্ছে, কী খাবে, পান করবে বা অমুক বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে এ রকম কোন ভয়ভীতি তাদের কখনো পেয়ে বসে না। কেননা তাদের স্বস্তিদান করা হয়, আস্বস্ত করা হয় এবং বিগত কোন কিছুর জন্য তাদের কোন দুঃখ-বেদনায় পড়তে হয় না। কেননা তাদের ধৈর্য দান করা হয়। দ্বিতীয় চিহ্ন হলো, তারা ঈমান রাখে অর্থাৎ ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ ঈমান ও আজ্ঞানুবর্তিতা বিরুদ্ধ সব বিষয়াদি থেকে অনেক দূরে থাকে। তাদের তৃতীয় চিহ্ন হলো, ইহকালেও এবং পরকালেও তারা (ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে) সুসংবাদ পেতে থাকে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এটি এক অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার এবং অতি প্রিয় এ মর্যাদাতেই তারা ভূষিত অর্থাৎ খোদা তাআলার যেসব বিশিষ্ট বান্দা তাঁর ওলী হয়ে থাকেন তারা অবশ্যই ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্ন থেকে অংশ পেয়ে থাকেন। ঐশীবাণীর দ্বারা ভূষিত হওয়াই তাদের ওলীত্বের প্রধান পরিচিতি। (এটাই আল্লাহ্ তাআলার কুদরত প্রকাশক নিয়মনীতি)। যারা অন্যান্য সব (কৃত্রিম) প্রভু-প্রতিপালকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলাকেই নিজ প্রভু-প্রতিপালকরূপে বেছে নেয় তারা বলে, 'আল্লাহ্ তাআলা আমাদের একমাত্র প্রভু-প্রতিপালক' (অর্থাৎ অন্য কারও প্রতিপালনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই)। এরপর তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার মুহূর্তগুলোতে অনড় অটল থাকে। (যত কঠিন আলোড়নকারী বিপদ ও ঝড়-ঝাপটা আসুক এবং অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ুক না কেন তাদের ভেতর একটুও নড়চড়, পরিবর্তন ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয় না বরং তারা পুরোপুরি (ইস্তেকামতে) অবিচল থাকেন)। তখন তাদের ওপর ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয় (অর্থাৎ ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে তারা সুসংবাদ পেতে থাকে: 'ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু অবিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক বটে এবং পরকালে তোমাদের মন যা কিছু আকাঙ্খা করবে তা সবই তোমরা পাবে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যদি কিছু অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়েও থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা পরকালে সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাবে এবং সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যদি কেউ বলেন, এটা কী করে হতে পারে যে পরকালে মানুষের মন যা চাইবে তা সে পাবে? আমি বলছি, এমনটি ঘটা একান্ত আবশ্যকীয়।

এখন জানা উচিত, খোদার প্রিয়, গৃহীত ও মনোনীত এবং সত্যিকার বন্ধু হওয়ার মর্যাদা (যার চিহ্নাবলী সংক্ষিপ্তাকারে আমি বর্ণনা করে এসেছি) এ মর্যাদা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুবর্তিতা ছাড়া কখনো অর্জিত হতে পারে না। তাঁর খাঁটি অনুসারীর মোকাবেলায় যদি কোন খ্রিষ্টান আর্য বা ইহুদী ঐশী গ্রহণযোগ্যতার জ্যোতি ও চিহ্নাবলী দেখাতে চায় তাহলে তার পক্ষে এমনটি করা কখনো সম্ভব হবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট পন্থা এই যে, একজন খাঁটি মুসলমান যিনি সত্যিকারভাবে নবী (সা.)-এর অনুবর্তিতাকারী এমন প্রকৃত মুসলমানের মোকাবেলায় অন্য কোন ব্যক্তি যেমন খ্রিষ্টান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা করে, 'তোমার স্বপক্ষে যে পরিমাণ ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে অথবা যে পরিমাণ গোপন রহস্যের বিষয় তোমার কাছে উন্মোচিত হবে, অথবা দোয়া কবুলের মাধ্যমে তোমাকে যা যা সাহায্য দান করা হবে, অথবা

---

এমনটি হওয়ার নামই নাজাত (পরিত্রাণ)। নচেৎ মানুষ নাজাত লাভের পর যদি কিছু কিছু বিষয় কামনা করতে থাকে আর সেগুলোর জন্য তার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে থাকে এবং অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকে তবুও তার সেসব আশা-আকাঙ্খা যদি পুরণ না হয় তা হলে এ আবার কিসের নাজাত হলো? এতে বরং এক ধরনের আযাব থেকেই গেল। অতএব জান্নাত, বেহেশ্‌ত বা 'মুক্তিখানা' বা স্বর্গ যে নামেই এ মার্গটি অভিহিত হোক প্রকৃতপক্ষে এই পরম সৌভাগ্যলাভের গৃহটি আবশ্যকীয়ভাবে এমন হওয়া চাই যেখানে মানুষের সর্বত স্বচ্ছ ও নির্মল সুখ ও আনন্দ লাভ হবে, যেখানে ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কোন দুঃখ ও বেদনাদায়ক বিষয় থাকবে না। কোন ব্যর্থতা ও বিফলতার জ্বলন হৃদয়ে প্রভাব ফেলবে না। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে বেহেশতে অশোভনীয় কোন বিষয় বা কার্যকলাপ হবে না এবং পবিত্র হৃদয়ে অশুভ আকাঙ্খাও সৃষ্টি হবে না। বরং শয়তানী ধ্যান-ধারণামুক্ত এ সব পাক-পবিত্র হৃদয়ে মানবীয় সৎস্বভাব ও সচ্চেতনা এবং স্রষ্টার পবিত্র ইচ্ছা মাফিক পবিত্র আকাঙ্খার উদ্ভব হবে, যাতে মানুষ তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৌভাগ্যকে পুরোপুরি অর্জন করতে পারে। আর যাতে নিজ যাবতীয় স্বভাবজ ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানব বলে অভিহিত হতে পারে। কেননা বেহেশতে প্রবেশ লাভ মানবপ্রকৃতির বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে নয় যেমন কিনা আমাদের বিরোধী খ্রিষ্টান ও আর্যগণ মনে করেন। বরং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানবপ্রকৃতির অবয়ব যেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পুর্ণাকারে বিকশিত হয় এবং সব রকম অসঙ্গতি দূর হয়ে যথাযথ সেই সব বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে যা পূর্ণ মানবের জন্য তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৃজনের দিক দিয়ে আবশ্যকীয়। এরপর আল্লাহ বলেন, আমার বিশেষ বান্দারা (যারা মনোনীত) আমার সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করে আমি কোথায়? তখন তাদের জানা উচিত যে আমি অতি নিকটে রয়েছি। আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের দোয়া আমি শুনি যখনই কোন নিষ্ঠাবান বান্দা দোয়া করে (তা মনে মনেই করুক বা মুখে করুক) আমি তা শুনে থাকি (অতএব এতে করে নৈকট্য স্পষ্ট)। কিন্তু তাদের উচিত তারা যেন সেই রকম অবস্থা তৈরী করে সেটি বজায় রাখে, যে অবস্থার দরুন তাদের দোয়া আমি শুনতে পারি। অর্থাৎ মানুষ নিজের অন্তরায় নিজেই হয়ে যায়। যখন পবিত্র অবস্থা পরিত্যাগ করে দুরে সরে যায় তখন খোদা তাআলাও তার কাছ থেকে দূরে চলে যান। আর আমার প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় রাখা আবশ্যক (কেননা ঈমানী শক্তির আশির্বাদে দোয়া শীঘ্র গৃহীত হয়ে থাকে)। তারা যদি এমনটি করে তাহলে সাফল্য অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ খোদাতাআলা সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং ঐশী অনুগ্রহ ও পথপ্রদর্শন তাদের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, তাদের কখনও ছেড়ে যাবে না। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়াও আল্লাহ্‌র 'আওলিয়া' তথা বন্ধুদের স্বপক্ষে একটি বিরাট নিদর্শন বটে। 'ফা-তাদাব্ বার (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা আবশ্যক)–প্রণেতা।

তোমার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য যেভাবে ঐশী ক্ষমতার কোন দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হবে, অথবা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে তোমাকে যেসব বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার প্রতিশ্রুতি দান করা হবে অথবা তোমার কোন ক্ষতিসাধনকারী ঘোর বিরোধীর সম্পর্কে যে কোন সতর্কীকরণমূলক সংবাদ দান করা হবে উল্লেখিত সব বিষয়ে যা কিছু তোমার পক্ষ থেকে বাস্তবে প্রকাশিত হবে এবং এতদসম্পর্কীয় যা কিছু তুমি দেখাবে তা আমিও দেখাবো' তাহলে (নিশ্চিত জানবেন) কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেই এরূপ প্রতিদ্বন্দিতা করা কখনো সম্ভব হবে না এবং তারা কখনো প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হবে না। কেননা তাদের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা মিথ্যেবাদী। সেই প্রকৃত ও সত্য খোদার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই যিনি সত্যপরায়ণদের সাহায্যকারী এবং সিদ্দীকগণের বিশ্বস্ত বন্ধু রয়েছেন যেমন পূর্বেও আমি এ সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করে এসেছি। ***ওয়া হাযা আখিরু কালামিনা*** এখানেই আমি আপাতত শেষ করছি। ***আলহামুদুলিল্লাহি আওওয়ালান ওয়া আখিরান ওয়া যাহিরান ওয়া বাতিনান হুয়া মাওলানা নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল ওয়াকীল*** (অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে এবং যাহেরে ও বাতেনে সব প্রশংসা আল্লাহরই। তিনিই আমাদের প্রভু ও অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক!– অনুবাদক)।[১৬]

১৬. রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খণ্ড, 'তাসদীকুন-নবী–এক ঈসায়ীকে তিন সওয়ালওঁ কা জওয়াব'।

## মুহাম্মদ বখ্শ পান্ধার নামে ড. মার্টিন ক্লার্কের চিঠি

খিদমতে জনাব মুহাম্মদ বখ্শ ও জুন্ডিয়ালার মুসলিম অধিবাসী! বাদ সালাম আরজ, আমাদের বিবেচনায় সম্প্রতি জুন্ডিয়ালায় খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে অনেক ধর্মালোচনা হয় এবং আপনাদের ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি খ্রিষ্টধর্মের সমালোচনা করেন, তর্ক-বিতর্ক করেন। আরও করতে চান। তেমনিভাবে খ্রিষ্টানরাও ইসলামধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধান করেছেন। বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই এ পত্রলিখকের জানা মতে উত্তম ও সমীচীন পন্থা হলো, একটি জনসভার আয়োজন করা হোক। সে সভায় মুসলমানরা তাদের আস্থাভাজন উলামা ও বুযুর্গানসহ উপস্থিত থাকুন, আর তেমনি খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকেও কোন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে পেশ করা হোক। যাতে উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে বিবদমান বিষয়াদির পুরোপুরি নিষ্পত্তি করা যায় এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্য মিথ্যা নির্ণয় হয়। অতএব জুন্ডিয়ালার মুসলমানদের মধ্যে আপনি যেহেতু উচ্চসাহসী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন, সেহেতু আমরা আপনার সমীপে জুন্ডিয়ালার খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে আবেদন করছি, যেন আপনি নিজেই অথবা আপনার স্বধর্মীদের সাথে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে একটি দিন তারিখ নির্ধারণ করেন এবং আপনার সন্তুষ্টিভাজন কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। আমরাও নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র সভাস্থলে নিজেদের কোন বুযুর্গকে উপস্থিত করবো। যাতে এ বিতর্ক সভার মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়াদির ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং খোদাওন্দ সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের সৌভাগ্য দান করেন। আমরা কোন জেদ, ঝগড়া-বিবাদ বা বিরোধিতার বশবর্তী হয়ে এ সভার আয়োজনে প্রবৃত্ত হই নাই। বরং সত্য পছন্দনীয় বিষয়াদি যেন উত্তমরূপে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় কেবল এটাই আমাদের কাম্য। আরেকটি আবেদন হচ্ছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ যদি এ রকম বিতর্ক সভায় যোগদান করতে না চান, তাহলে ধর্মালাপের ক্ষেত্রে নিজেদের (সমালোচনামূলক) বক্তব্যের ঘোড়া দাবড়াবেন না এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও আহ্বানের সময়ে ভিত্তিহীন ও অহেতুক তর্কা-তর্কি থেকে বিরত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করবেন। অনুগ্রহপুর্বক এ চিঠির উত্তর যথাশীঘ্র দেবেন। যাতে আপনি যদি আমাদের আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে উক্ত সভার এবং বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ইতি, সালাম–

জুন্ডিয়ালার খ্রিষ্টানদের পক্ষে-
মার্টিন ক্লার্ক (ইংরেজীতে স্বাক্ষর)।

**আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম**

হে মহান, কল্যাণবর্ষী যুগ-মুজাদ্দিদ, মহাজ্ঞানী, রসূল (সা.)-এর ধর্মের সহায়ক অতন্দ্র প্রহরী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব! মুহাম্মদ বখশের পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম।

বিনীত নিবেদন এই যে কিছুকাল থেকে জুন্ডিয়ালা গ্রামের খ্রিষ্টানরা প্রচন্ড শোরগোল সৃষ্টি করে রেখেছে। বরং আজ ১১ এপ্রিল ১৮৯৩ ইং তারিখে জুন্ডিয়ালা গ্রামের খ্রিষ্টানরা অমৃতসরের ডঃ মার্টিন ক্লার্ক-এর মারফৎ এ অধমের নামে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। এর নকল এ চিঠির অপর পিঠে আপনার অবগতির জন্য পেশ করা হলো।

খ্রিষ্টানরা খুব জোরেশোরে লিখেছে, জুন্ডিয়ালার ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ তাঁদের আলেম-উলামা এবং অন্যান্য বুযুর্গানে-দ্বীনকে সমবেত করে একটি সভার আয়োজনের মাধ্যমে সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করুন। নচেৎ ভবিষ্যতে প্রশ্ন করা থেকে নীরবতা অবলম্বন করুন। কাজেই আপনার সমীপে নিবেদন, জুন্ডিয়ালা নিবাসী অধিকাংশ মুসলমান দুর্বল ও গরীব মিসকিন। অতএব আপনার আশিসময় মহতী খিদমতে সবিনয় নিবেদন জানাই, হুযূর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জুন্ডিয়ালা নিবাসী মুসলিমদের সাহায্য-সহায়তা করুন। নইলে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর কালিমার দাগ লেগে যাবে। আরও নিবেদন যে খ্রিষ্টানদের চিঠি পড়ে এর উত্তর সম্পর্কে অবহিত করুন, তাদের কী লিখতে হবে যাতে হুযূর যা নির্দেশ করেন তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। ইতি

জরুরী জবাব প্রার্থী
বিনীত আবেদনকারী
মুহাম্মদ বখশ পান্ধা
মকতব দেশী, জুন্ডিয়ালা,
জেলা ও মহকুমা অমৃতশর
১৯ এপ্রিল ১৮৯৩

## অমৃতসর মেডিক্যাল মিশন [১৮ এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ]

জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব! সালামত সশ্রদ্ধ অভিবাদন। আপনার অনুগ্রহপূর্ণ পত্রটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। বিশেষত এ বিষয়টি জেনে যে জন্ডিয়ালার মুসলমান সমাজ আপনার মত একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে (সাহায্যকারী হিসেবে) পেলো। কিন্তু আমাদের দাবী আপনার কাছে নয় বরং জুন্ডিয়ালাবাসী মুসলমানদের কাছে। আমরা আপনার আহবান গ্রহণ করতে অক্ষম। তাদের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি, এখনও উত্তরের অপেক্ষায় আছি। আপনি যদি তাদের সাহায্য করতে চান, তাহলে সমীচীন ও নিয়মতান্ত্রিক পথ হলো, আপনি নিজে তাদের চিঠি লিখুন এবং (তাদের প্রতি) আপনার অনুগ্রহ করার ইচ্ছা তাদের কাছে প্রকাশ করুন। তারা যদি আপনাকে মেনে নিয়ে এ পবিত্র যুদ্ধের জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে পেশ করে তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং এতে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। যেহেতু আপনি অতি জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সেহেতু এ বিশেষ বিতর্কের জন্য আপনাকে গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি যে আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয় বরং জুন্ডিয়ালার মুসলমানদের এক্তিয়ারভুক্ত তা আপনার অজানা নয়। অতএব আপনি তাদের সাথেই নিষ্পত্তি করুন। এরপর আমরাও হাজির আছি। আপনার ও তাদের মাঝে নিষ্পত্তির ব্যাপারেই বিলম্ব। ইতি, সালাম– মার্টিন ক্লার্ক (অমৃতসর)।

## ড. মার্টিন ক্লার্কের চিঠির সংক্ষিপ্তসার

[অমৃতসর ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ]

খিদমতে জনাব মির্যা গোলাম আহমদ, রঈসে কাদিয়ান।

মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সম্মানিত প্রতিনিধি দলসহ এখানে পৌঁছে তাঁর হাতে আপনার পাঠানো পত্রটি আমাকে দেন। জনাব আপনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে (বিতর্কের জন্য) ডাক দিয়েছেন তা আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। আপনার দূতগণ আপনার পক্ষ থেকে বাহাস এবং এর জরুরী শর্তাবলীরও নিষ্পত্তি করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, জনাবও উক্ত ব্যবস্থা ও শর্তাবলীতে রাজী হবেন। তাই অতি সত্বর জানাবেন, আপনি এসব শর্ত গ্রহণ করেন, কি না। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত, এইচ মার্টিন ক্লার্ক, এম.ডি.সি.এম (এডেমবরা), এম.আর.এ.এস.সি।

## পত্র নম্বর ৩

## মিস্টার আব্দুল্লাহ আথমের নামে তার এক চিঠির উত্তর

আজ আমি এ বিজ্ঞপ্তিটি এইমাত্র লিখে অবসর হলে ডাকযোগে মিস্টার আব্দুল্লাহ আথমের পাঠানো চিঠি পেলাম। এটি হচ্ছে অনুষ্ঠিতব্য বাহাস সম্পর্কে জনাব আথম ও ক্লার্ক সাহেবের নামে পাঠানো আমার চিঠির উত্তর। অতএব এখন এরও উত্তর 'তাঁর বক্তব্য ও আমার উত্তর' আকারে উপস্থাপন করছি।

**তাঁর বক্তব্য:** অতীতকালের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নতুন মু'জিযার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমরা বিশ্বাসী নই। কাজেই আমরা মু'জিযার কোন আবশ্যকতা এবং এর ক্ষমতা ও সামর্থ্যও আমাদের মাঝে আছে বলে মনে করি না।

**আমার উত্তর:** হে আমার বন্ধু, মু'জিযা শব্দটি আমি আমার পত্রে ব্যবহার করিনি। নিঃসন্দেহে মু'জিযা দেখানো আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূলের কাজ, প্রত্যেক মানুষের কাজ নয়। কিন্তু এ বিষয়টি তো আপনি মানেন এবং জানেন যে বৃক্ষের পরিচয় এর ফলের মধ্যেমে হয়ে থাকে এবং ঈমানদারীর কী কী ফল রয়েছে তার উল্লেখ যেমন কুরআন করীমে আছে, তেমনি ইঞ্জিল শরীফেও রয়েছে। আমি আশা করি, আপনি বিষয়টি বুঝে গেছেন। কাজেই কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ঈমানদারীর ফল দেখানোরও কি আপনাদের সামর্থ্য নেই?

**তাঁর বক্তব্য:** যাইহোক, জনাব কোন মু'জিযা দেখাবার জন্য উদ্যোগী হলে আমরা সেটি দেখতে নিজেদের চোখ বন্ধ করবো না এবং যতটুকু আমরা নিজেদের ভুলের সংশোধন আপনার মু'জিযার মাধ্যমে করতে পারি, ততটুকু সংশোধন করা আমরা নিজেদের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবো।

**আমার উত্তর:** নিঃসন্দেহে আপনার এ বক্তব্যটি ন্যায়সঙ্গত। কারও মুখ দিয়ে এ কথা সাধারণভাবে বেরুতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ন্যায়পরায়ণ না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার এ বাক্যটি "যতটুক আমরা নিজেদের ভুলের সংশোধন আপনার মু'জিযার পরিপ্রেক্ষিতে করতে পারি ততটুক সংশোধন করা আমাদের নিজেদের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবো'– এ বাক্যটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে এ অধম তো কেবল এ বার্তা মানবজাতিকে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে যে পৃথিবীর বর্তমান সব ধর্মের মধ্যে কেবল সেটিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং খোদা তাআলার মনোনীত ধর্ম, যা কুরআন করীম আনয়ন করেছে এবং 'দারুন্নাজাত' তথা

পরিত্রাণের মার্গে উপনীত হওয়ার জন্য প্রবেশদ্বার হলো **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'**। এটাই একমাত্র পথ। এখন আপনি কি নিদর্শন দেখার পর এ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত? আপনার উল্লেখিত বাক্যটি আমাদের আশান্বিত করে যে আপনি এটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন না। অতএব আপনি যদি প্রস্তুত হয়ে থাকেন, তাহলে এ মর্মে কয়েক লাইন তিনটি পত্রিকায় অর্থাৎ 'নূর আফশান, মানশুর মুহাম্মদী এবং কোন আর্য সমাজি পত্রিকায় ছেপে দিন "আমরা খোদা তাআলাকে 'হাযির ও নাযির' (উপস্থিত ও দ্রষ্টা) হিসেবে জেনে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ২২ মে, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য বাহাসের পর আল্লাহ্ তাআলা যদি মির্যা গোলাম আহমদের সাহায্য করেন এবং এমন কোন নিদর্শন তার সমর্থনে প্রকাশ করেন, যার সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নে (ভবিষ্যদ্বাণীরূপে) জানিয়ে দেন এবং যা কিছু জানিয়ে থাকবেন তা পূর্ণ হয়ে যায়, তা'হলে আমরা এ নিদর্শন দেখার পর তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যাবো। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি যে আমরা এ নিদর্শনটি কোন রকম অহেতুক সমালোচনা ছাড়াই মেনে নেবো এবং কোন ভাবেও এ ঐশী নিদর্শনটিকে অবিশ্বাসযোগ্য ও খামাখা আপত্তিকর বলে মনে করবো না। তবে সে একই বছরে অনুরূপ নিদর্শন আমরাও যদি দেখিয়ে দেই, তাহ'লে ভিন্ন কথা। যেমন, নিদর্শনস্বরূপ যদি এ ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে যে অমুক সময়ে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা একটি দলের ওপর অমুক দুর্ঘটনা ঘটবে, আর এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এর নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে, এর হুবহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পারলে আমাদের অবশ্য-অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং নিদর্শন দেখার পর আমরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করি এবং সেই নিদর্শনের মোকাবেলায় সে বছরেই এর অনুরূপ কোন অলৌকিক ঘটনাও দেখাতে না পারি, তাহলে বিশ্বাস ভঙ্গের দন্ডস্বরূপ আমাদের অর্ধেক সম্পত্তি ইসলামের সাহায্যার্থে তাঁর নিকট সমর্পণ করে দেবো। আর আমরা যদি (অঙ্গীকারনামার) এ দ্বিতীয় অংশটিও পালন না করি এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, আর এ অঙ্গীকার ভঙ্গের পর আমাদের সম্পর্কে মির্যা গোলাম আহমদ কোন কঠোর ঐশী শাস্তিমূলক নিদর্শন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতে চান তাহলে তিনি এর ন্যায্য অধিকারী হবেন যে সাধারণ পত্রিকাসমূহে অথবা তাঁর নিজস্ব প্রকাশনাগুলোতে ছেপে দিতে পারবেন, (ইতি)।" এ লিখিত বিবরণটি আপনাদের পক্ষ থেকে নিজের ও পিতার নাম এবং ধর্ম ও বাসস্থানের এবং উভয় পক্ষের পঞ্চাশ জন করে সম্মানিত ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের স্বাক্ষরসহ তিনটি পত্রিকায় প্রকাশ করে দিন। আর যেহেতু সত্যকে প্রকাশিত করাই হবে আপনাদের উদ্দেশ্য এবং সত্য যাচাইয়ের এ মানদন্ডটি

আপনাদের এবং আমাদের ধর্মানুযায়ী সাব্যস্ত, সেহেতু এখন খোদার দোহাই, এটি গ্রহণ করতে আর একটুও বিলম্ব করবেন না। এখন খোদা তাআলা কর্তৃক সত্যধর্মের (সত্যতার) জ্যোতি ও আশিসসমূহ প্রকাশিত করার এবং জগতকে একই ধর্মে উপনীত করার সময় সমাগত। কাজেই আপনারা যদি দৃঢ়চিত্ততার মাধ্যমে সবার আগে এ পথে অগ্রসর হন এবং এরপর নিজেদের কৃত অঙ্গীকারকেও সততা, বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতার সাথে পূরণ করেন, তাহলে আপনারা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান বলে সাব্যস্ত হবেন এবং এটা আপনাদের সত্যপরায়ণতার একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে।

আর যদি আপনি বলেন, "আমরা তো এ সবই করে দেখাবো অর্থাৎ কোন নিদর্শনের পর ইসলামধর্মও গ্রহণ করবো অথবা অন্যান্য উল্লেখিত শর্তও পালন করবো এবং এ অঙ্গীকারনামাটি পূর্বাহ্নেই তিনটি পত্রিকায়ও ছেপে দেবো। কিন্তু আপনিই যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন, তাহলে আপনার কী শাস্তি হবে? তাহলে (জেনে রাখুন) এর উত্তরে আমি তৌরাতের নির্দেশ অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড নিজের জন্য গ্রহণ করবো। আর এটা যদি আইনবিরোধী হয়, তাহলে আমার সম্পূর্ণ সম্পত্তি আপনাকে দান করবো। যেভাবে ইচ্ছা পূর্বাহ্নেই আমার সাথে এ ব্যাপারে আপনার সন্তুষ্টিজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিন।

**তাঁর বক্তব্য:** "কিন্তু জনাবের যেন এটা স্মরণ থাকে যে মু'জিযা আমরা সেটিকেই জানবো (ও মানবো) যা দাবীকারকের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে বাস্তবে প্রকাশিত হয় এবং সেটি কোন সম্ভবপর বিষয়ের সত্যায়নে প্রদর্শিত হয়।

**আমার উত্তর:** উল্লেখিত বিষয়ের সাথে আমার ঐকমত্য রয়েছে। এ বিষয়টিকেই চ্যালেঞ্জ বলা হয়, যেমন এক ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত বলে দাবী করে নিজ দাবীর সত্যায়নের জন্য এমন কোন বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে– তার ক্ষমতাতীত এবং ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য সাব্যস্ত হয়। তাহলে সে দাবীকারক তৌরাতের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় : ১৮ শ্লোক অনুযায়ী সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত হবেন। তবে এটা সত্য যে এ রকম নিদর্শন কোন সম্ভবপর বিষয়ের সমর্থনে হওয়া চাই। নইলে এমনটি তো সঙ্গত নয়, যেমন কোন ব্যক্তি দাবী করে যে সে খোদা। আর সে নিজের খোদা হওয়া প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং সে ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তাকে কি খোদা 'বলে মেনে নেওয়া হবে? কিন্তু আমি এস্থলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ অধম যখন 'মুলহাম' তথা ঐশীবাণী প্রাপক ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হওয়ার দাবী

করেছিল, তখন ১৮৮৮ সালে মির্যা ইমামুদ্দিন যাকে আপনি ভাল করে জানেন অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'চাশমা-এ-নূর' পত্রিকায় আমার বিপক্ষে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আমার কাছে নিদর্শন দেখানোর দাবী জানিয়েছিল। তখন নিদর্শন প্রদর্শন হিসেবে (আমার পক্ষ থেকে) একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যা নূর আফশান' পত্রিকার ১০ মে, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ উক্ত পত্রিকায় এবং আমার গ্রন্থ 'আইনা-এ-কামালাতে ইসলাম' এর ২৭৯ ও ২৮০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর সে ভবিষ্যদ্বাণীটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ তারিখে এর নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর পূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই এখন আপনার ন্যায়পরায়ণতার পরীক্ষা স্বরূপ আপনাকেই জিজ্ঞেস করি, এটি নিদর্শন কি, না? যদি নিদর্শন না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কী? আর যদি সেটি নিদর্শন হয়ে থাকে এবং আপনি সেটি দেখেছেন বটে। সে নিদর্শনের বিবরণ কেবল ১০ মে, ১৮৮৮ তারিখে এর 'নূর আফশান' পত্রিকাতেই নয় বরং ১০ জুলাই, ১৮৮৮ তারিখে আমার বিজ্ঞপ্তি টিতেও নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব এখন আপনার অবশ্যকর্তব্য কি না, এ নিদর্শনের মাধ্যমেও যেন উপকৃত হন এবং নিজের ভুল সংশোধন করেন? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন, কী সংশোধন করলেন এবং খ্রিষ্টান মূলনীতির কতটুকু পরিহার করলেন। কেননা এ নিদর্শনটি খুব একটা পুরানো নয়। সেদিনের কথা, নুর আফশান পত্রিকায় এবং ১০ জুলাই, ১৮৮৮ তারিখে আমার বিজ্ঞপ্তিটিতে প্রকাশ হয়েছিল। আপনার উল্লেখিত এ সব শর্ত মোতাবেক রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে আপনার ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এটি এক মাপকাঠি। আপনি যদি এ নিদর্শনটি মেনে নেন এবং নিজ অঙ্গীকার অনুযায়ী নিজ ভুলেরও সংশোধন করেন, তাহলে আমি পাকাপুক্তোভাবে বিশ্বাস করতে পারবো, এখন ভবিষ্যতেও আপনি আপনার বড় রকমের সংশোধনের জন্য প্রস্তুত আছেন। উল্লেখিত নিদর্শনের এতটুকু প্রভাব তো অবশ্যই আপনার ওপর হওয়া উচিত যে কমপক্ষে আপনি আপনার এ স্বীকৃতিটুকু ছেপে দেন: "এখনও চূড়ান্তভাবে না হলেও অধিক বিশ্বাসরূপে ইসলামধর্মই আমার কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা চ্যালেঞ্জস্বরূপ ইসলামের সত্যতার সমর্থনে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি জানেন, ইমামুদ্দীন ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারী এবং একজন নাস্তিক ব্যক্তি। সে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা এবং এ অধমের মুলহাম (ঐশীবাণী প্রাপক) হওয়ার সম্পর্কে একটি নিদর্শন চেয়েছিল, যা খোদা তাআলা

স্বল্প সময়ের মধ্যে তারই নিকটআত্মীয়দের ওপর প্রতিফলিত করে তার ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আপনি এ নিদর্শনটির খন্ডন অথবা গ্রহণ করার সম্পর্কে অবশ্যই উত্তর দিন। অন্যথায় এ একটি আমার প্রথম ঋণ হিসেবে আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন।

**তাঁর বক্তব্য:** মুবাহালাও এক ধরনের মু'জিযারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমরা ইঞ্জিলের শিক্ষা অনুযায়ী কারও জন্য অভিশম্পাত চাইতে পারি না। আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে। আপনি যা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন এবং জবাবের জন্য এক বছর অবধি অপেক্ষা করুন।

**আমার উত্তর:** হে আমার বন্ধু! মুবাহালায় অন্যের জন্য অভিশাপ চাওয়া জরুরী নয়। বরং এটুকু বলাই যথেষ্ট যেমন একজন খ্রিষ্টান বলতে পারে, 'আমি পুরোপুরি নিশ্চিৎ বিশ্বাসের সাথে বলছি, প্রকৃতপক্ষেই হযরত মসীহ্ খোদা এবং কুরআন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নয়। এ বর্ণনায় আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি, তাহলে খোদা তাআলা আমার ওপর লা'নত বর্ষণ করুন'। অতএব মুবাহালার এ রূপটি ইঞ্জিলের পরিপন্থী নয় বরং অবিকল ইঞ্জিলের শিক্ষাসম্মত। আপনি মনোযোগের সাথে ইঞ্জিল পাঠ করুন।

তাছাড়া আগেই আমি বলে এসেছি, আপনি যদি নিদর্শন দেখানোর মোকাবিলার ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে এক তরফাভাবে এ অধমের পক্ষ থেকেই দেখানো হোক। তা আমি সানন্দে ও সবিনয়ে গ্রহণ করি। উপরে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী আপনি অঙ্গীকারনামা পত্রিকায় প্রকাশ করুন। তারপর যখনই আপনি ফরমায়েশ করবেন, আমি তৎক্ষণাৎ অমৃতসর হাযির হয়ে যাব। যখন থেকে হযরত মসীহ্কে খোদার আসন দেয়া হয়েছে এবং যখন থেকে খ্রিষ্টানরা একজন সত্যবাদী, পরিপূর্ণ ও নবীদের শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করেছিল, সে দিন থেকেই খ্রিষ্টধর্ম অন্ধকারে ডুবে আছে এটাতো আমার আগে থেকেই জানা। কাজেই আমি নিশ্চিৎ জানি সম্মানিত খ্রিষ্টান সাহেবানের মাঝে কারও-ই ইসলামের জীবন্ত নূরের মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, খ্রিষ্টান মহোদয়গণের মুখে যে পরিত্রাণ ও চিরস্থায়ী জীবনের উল্লেখ শোনা যায় তা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সিদ্ধপরুষদের মধ্যে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে চমকাচ্ছে। ইসলামের এটা এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে ইসলাম অন্ধকাররাশী থেকে বের করে এনে এর সেই নূর ও আলোকে প্রবেশ

করায় যে নূরের কল্যাণে মু'মিনের সত্ত্বায় ঐশীগ্রহণযোগ্যতার সুস্পষ্ট লক্ষণাবলী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খোদা তাআলার সাথে তার বাক্যালাপের সৌভাগ্য ঘটে এবং খোদা তাআলা তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসার নিদর্শনাবলী তার সত্ত্বায় প্রস্ফূট করেন। আমি সজোরে দাবীর সাথে বলছি, 'ঈমানী জীবন' কেবল সত্যিকার মুসলমানকেই দান করা হয় এবং এটাই ইসলামের সত্যতার অনন্য নিদর্শন।

এখন আপনার চিঠির জরুরী উত্তর দেয়া হলো এবং (এ উত্তর সম্বলিত) ইস্তেহার একটি পুস্তক আকারে আপনার বরাবরে এবং ড. ক্লার্ক সাহেবের বরাবরেও রেজিস্ট্রি যোগে পাঠানো হোচ্ছে। এখন আমার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণভাবে যুক্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হলো। ভবিষ্যতে আপনার অভিরুচি। ওয়াসসালামু আলা মানিওাবায়াল হুদা (হিদায়াত অনুসরণকারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।[১৭]

বিনীত নিবেদক
**মির্যা গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান, জেলা: গুরুদাসপুর

১৭. হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২-৫৭।

## পত্র নম্বর ৪

## জুন্ডিয়ালার অধিবাসী খ্রিষ্টানদের নামে ১৩ এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রিযোগে পাঠানো চিঠির নকল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জুন্ডিয়ালাবাসী খ্রিষ্টানদের সমীপে,

আবশ্যকীয় সম্ভাষণ জ্ঞাপনের পর। আজ আমি মুহাম্মদ বখ্শ সাহেবের নামে আপনাদের পাঠানো পত্রটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। যা কিছু আপনারা চিন্তা-ভাবনা করেছেন এর সাথে আমি ঐকমত্য পোষণ করি। বরং প্রকৃতপক্ষে আমি এ চিঠির বিষয়বস্তু পাঠে এতো আনন্দিত হয়েছি যে এ সংক্ষিপ্ত পত্রে আমি আমার প্রকৃত অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এ কথা সত্য এবং সম্পূর্ণ সত্য যে প্রতিদিনের এ সব ঝগড়া-বিবাদ ভাল নয়। এতে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষের সুখ-শান্তির ব্যঘাত ঘটে। এটা এক সাধারণ বিষয়। এরচেয়েও অনেক বড়, জরুরী ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আমাদের উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই মরণশীল, সবাই দুনিয়া ছেড়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তাঁরা যদি বাহাস-বিতর্ক ও তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ না ঘটান, তাহলে তারা নিজেদের আত্মা এবং অন্যদের প্রতি অবিচার করেন। আমি মনে করি, মহা কৃপাকারী মহানুভব আল্লাহ্ যেহেতু এ অধমকে এসব কাজের জন্যই প্রেরণ করেছেন তাই এক্ষেত্রে জুডিয়ালার মুসলমানদের অধিকার আমার চেয়ে বেশি নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে আমি নীরব থাকলে মহাপাপ হবে। কাজেই আমি আপনাদের অবহিত করছি, এ কাজের জন্য আমিই উপস্থিত আছি। আর এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে উভয় পক্ষের দাবী, তারা নিজ নিজ ধর্ম বহু নিদর্শনসহ খোদা তাআলার পক্ষ থেকে লাভ করেছেন। আর উভয় পক্ষ এটাও স্বীকার করেন, সে ধর্মই জীবিত ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে, যার পরিশুদ্ধতা যে-সব যুক্তি-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল সেসব যুক্তি-প্রমাণ যেন (অতীতের) কেস্সা-কাহিনীস্বরূপ না হয় বরং সেগুলো যেন দলিল প্রমাণ হিসেবেই এখনও বিদ্যমান ও দৃশ্যমান থাকে। যেমন, কোন কিতাবে যদি বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে ওমুক নবী মু'জিযা হিসেবে বিমর্ষ রুগীদেরকে আরোগ্য দান করেছিলেন, তাহলে এ (বর্ণিত) বিষয়টি এবং এ রকম অন্যান্য বিষয়ও এ যুগের লোকদের জন্য অকাট্য ও সুনিশ্চিৎ প্রমাণরূপে

সাব্যস্ত হতে পারে না। বরং এ কেবল একটি সংবাদ মাত্র, যা সে ধর্মে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যা হওয়ার উভয় আশঙ্কা বহন করে। বরং অস্বীকারকারীরা এরূপ সংবাদকে কেবল এক কেসসা-কাহিনী বলেই মনে করবে। এ কারণেই ইউরোপের দার্শনিকরা ইঞ্জিলে বর্ণিত হযরত মসীহর অলৌকিক ক্রিয়াগুলোর দ্বারা মোটেও উপকৃত হতে পারেন না। বরং এগুলোর প্রতি তারা অট্টহাসি হাসেন। কাজেই এমতাবস্থায় এটি এক অতি সহজ বিতর্ক। এর (সমাধানের) সহজ সরল উপায় হলো, ইসলাম-ধর্মানুসারীদের মাঝে কোন একজন ব্যক্তি পুর্ণ ও প্রকৃত মুসলমানের জন্য কুরআন করীমে বর্ণিত শিক্ষা ও লক্ষণাবলী অনুযায়ী নিজেকে সাব্যস্ত করে দেখাবেন। যদি দেখাতে না পারেন, তাহ'লে তিনি মিথ্যাবাদী, (প্রকৃত) মুসলমান নন। তেমনি খ্রিষ্টানদের মাঝে একজন ব্যক্তি (প্রকৃত খ্রিষ্টানের জন্য) ইঞ্জিলে বর্ণিত শিক্ষা ও চিহ্নাবলী অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করে দেখাবেন। যদি দেখাতে না পারেন, তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী, (প্রকৃত) খ্রিষ্টান নন। আর উভয় পক্ষের দাবী যেহেতু এটাই যে তাদের নবীরা যে নূর নিয়ে এসেছিলেন, সে নূর কেবলমাত্র একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অন্যদেরকেও আলোকিত করতো, সেহেতু সেই নূর যে ধর্মে (এখনও) ক্রিয়াশীল বলে সাব্যস্ত হবে, কেবল সে ধর্মই মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী জীবিত ও সত্য ধর্ম বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ আমরা যদি একটি ধর্মের মাধ্যমে সেই জীবন এবং পবিত্র নূর এর সব লক্ষণসহ লাভ করতে না পারি যা এর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়, তাহলে সে ধর্ম কেবল এক মুখের বুলি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা যদি ধরেও নেই যে কোন একজন নবী (নিজে) পবিত্র ছিলেন; কিন্তু আমাদের মাঝে কোন একজনকেও পবিত্র করতে পারেন না, আর তিনি অলৌকিক ক্রিয়া ও ঐশীবাণীরও অধিকারী ছিলেন কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তিকে অলৌকিক ক্রিয়া ও ঐশীবাণীর অধিকারী বানাতে পারেন না, তাহলে এ রকম নবী দিয়ে আমাদের কী লাভ? কিন্তু সব প্রশংসা ও মহিমা আল্লাহ তাআলার, আমাদের মহানবী খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) তদ্রূপ ছিলেন না। বরং যে নূর তাঁকে দান করা হয়েছিল তিনি সেই নূর এক জগতকে তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী দান করেন। তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে চিহ্নিত ও সুপরিচিত হন। তিনি সদা-সর্বদার জন্য নূর বিশেষ ছিলেন। ইতোপূর্বে কেউ চিরকালের জন্য নূর হয়ে আসেন নি। তিনি যদি প্রেরিত না হতেন এবং (মসীহ্র সত্যায়নে) বলে না যেতেন তাহলে হযরত মসীহর নবী হবার পক্ষে আমাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ ছিল না। কেননা তাঁর ধর্ম মরে গেছে এবং তাঁর নূর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তাঁর এমন কোন উত্তরাধিকারীও থাকলো না, যাকে কোন নূর দান করা হয়েছে। জগতে এখন একমাত্র ইসলামই জীবিত ধর্ম। সুতরাং এ অধম নিজ (বাস্তব) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছে এবং পরখ করেছে উভয় প্রকার নূর ইসলাম ও কুরআন করীমে এখনও সেভাবেই সজীব রয়েছে যেভাবে আমাদের নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিল। আমরা এসব কিছু দেখাবার জন্য দায়বদ্ধ। কারও যদি মোকাবেলা করার শক্তি-সামর্থ্য থাকে, তিনি আমাদের সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। 'ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা' (সেই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে সৎপথের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়–অনুবাদক)।

পরিশেষে এ-ও স্পষ্ট করে জানাতে চাই, এ অধমের মোকাবেলায় যে ব্যক্তি দাঁড়াবেন তিনি কোন নামী দামী বুযুর্গ ও সম্মানিত ইংরেজ পাদ্রীদের কেউ হওয়া চাই। কারণ, যে বিষয়টি এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বির্তকানুষ্ঠানের মাধ্যমে কাম্য এবং যদ্বারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তা কেবল এ বিষয়ের ওপরই অর্থাৎ উভয় পক্ষের প্রতিনিধি নিজ নিজ জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার উপরই নির্ভরশীল। তবে নমনীয়তাস্বরূপ এবং যুক্তির পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আমি এ-ও মেনে নিতে রাজি যে এ মোকাবেলার জন্য খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে পাদ্রী ইমাদুদ্দীন, পাদ্রী ঠাকুর দাস অথবা মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথমকে (প্রতিনিধি) নির্বাচন করা যেতে পারে। অতঃপর তাদের নাম কোন পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে এর একটি সংখ্যা এ অধমের কাছেও পাঠানো হোক। তা পাঠানো হলে এ অধমও নিজ মোকাবেলার ঘোষণা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবে এবং এর এক কপি বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দীর নামে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু প্রকাশ থাকুক যে, সুদীর্ঘকাল থেকেই মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে তর্ক-বিতর্ক সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং উভয় পক্ষ থেকে বহুল সংখ্যক বই-পুস্তকও প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনি ধারায় প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ খোলাসাভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কুরআন করীমের বিরুদ্ধে যা কিছু আপত্তি তোলা হয় তা সবই প্রকারন্তরে তৌরাতের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। তেমনি আমাদের নবী (সা.)-এর সম্পর্কে যে সব ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনা করা হয় তা সবই প্রকারান্তরে সমগ্র নবীকুলের বিরুদ্ধে যায়। হযরত মসীহ্‌ও এর বাইরে নন। বরং এসব সমালোচনার কারণে খোদা তাআলাও আপত্তির লক্ষস্থলে পরিণত হন। অতএব জীবিত ধর্ম ও মৃত ধর্মের নির্ণয় সম্পর্কে বিতর্কটি হবে এবং সংশ্লিষ্ট কিতাব ও ধর্ম যেসব রূহানী বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাবলীর সম্পর্কে দাবী করেছে সেগুলো এতে এখনও বিদ্যমান আছে কি না

তাও নিরূপণ করা হবে। বিতর্কের স্থান লাহোর বা অমৃতসরে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে এবং বিতর্কটি উভয় পক্ষের জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিদের যোগদান ও উপস্থিতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

বিনীত

**মির্যা গোলাম আহমদ**

কাদিয়ান, জেলা- গুরুদাসপুর।

## পত্র নম্বর ৫

## ড. মার্টিন ক্লার্কের নামে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহানুভব দয়াবান পাদ্রী সাহেব।

যথাযথ অবশ্যকীয় সম্ভাষণপূর্বক।

এ সময়টি যে কত মোবারক (আশিসপূর্ণ)! আপনার পত্রে উল্লেখিত 'পবিত্র যুদ্ধে'র উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে আমি আমার কয়েকজন নির্বাচিত প্রিয় বন্ধুকে দূত হিসেবে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি এবং আশা করি, এ পবিত্র যুদ্ধের জন্য আপনি আমাকে প্রতিদ্বন্দী হিসেবে মঞ্জুর করবেন। জুন্ডিয়ালার কতিপয় মুসলমানের নামে আপনার প্রথম পত্রটি যখন আমি পেলাম এবং এতে এ কথাগুলো পাঠ করলাম– 'আমাদের মোকাবেলায় দাঁড়ায় এমন কে আছে?' তখনই আমার আত্মা সাড়া দিয়ে ওঠলো, 'হ্যাঁ, আমি আছি, যার হাতে খোদা তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করবেন এবং সত্য প্রকাশ করে দিবেন। আমি যে সত্য পেয়েছি এবং আমাতে যে সূর্য উদিত হয়েছে, তা এখন আর গোপন থাকতে চায় না। আমি দেখতে পাচ্ছি তা এখন জোরালো রশ্মি বিস্তারে উদিত হবে এবং (মানুষের) হৃদয়ে গভীর রেখাপাত ও তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু এর উদয়ের জন্য কোন উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। অতএব মুকাবেলার জন্য মুসলমানদেরকে আপনাদের আহবান করা সেই অতি আশিসমন্ডিত ও শুভ উপলক্ষ্য বটে। আমি প্রত্যাশা করি না যে আপনি এ কথার ওপর জেদ ধরবেন, 'আমাদের তো জুন্ডিয়ালাবাসী মুসলমানদের সাথে কাজ, অন্য কারও সাথে নয়'। আপনি জানেন, জুন্ডিয়ালায় কোন সুখ্যাত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নেই। আপনারা

জনসাধারণের সঙ্গে তর্ক-বির্তক করে বেড়াবেন এটা আপনাদের মর্যাদা বিরোধী হবে। অথচ এ অধমের অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন নয় যে এ অধম আপনাদের মোকাবেলা করার জন্য দশ বছর ব্যাপী পিপাসাকাতর হয়ে আছে। উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় ছাপানো কয়েক হাজার চিঠি উক্ত পিপাসার উদ্দীপনায় আপনাদের মত সম্মানিত পাদ্রী সাহেবানের খিদমতে পাঠিয়েছে। তথাপি কোন উত্তর না আসায় অবশেষে নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। অতএব এর নমুনাস্বরূপ এসব চিঠির কয়েক কপি আপনার নামেও পাঠাচ্ছি, যাতে আপনি জানতে ও বুঝতে পারেন যে আপনার এই মনোযোগ নিবদ্ধের জন্য প্রথম উপযুক্ত পাত্র আমিই। আর তাছাড়া, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে প্রত্যেক শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। পুরোপুরি দশ বছর থেকে ময়দানে দন্ডায়মান রয়েছি। জুন্ডিয়ালায় আমার জানামতে এমন একজনও নেই, যিনি এ বিতর্কের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। কাজেই আদবের সাথে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি, প্রতিদিনের বিবাদ মীমাংসা হোক এবং যে ধর্মের সাথে খোদা আছেন আর যারা সত্য খোদায় বিশ্বাসী, তাদের কতিপয় স্বতন্ত্র জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ ঘটুক– তা কাম্য হয়ে থাকলে এ অধমের সাথে মোকাবিলা করা হোক। আপনাদের বড় একটি দাবী হলো হযরত মসীহ্ (আ.) প্রকৃতপক্ষে খোদা ছিলেন এবং তিনিই বিশ্বস্রষ্টা। আর আমাদের বিশ্বাস হলো তিনি সত্য নবী ও রসূল এবং অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় ছিলেন। কিন্তু খোদা ছিলেন না। অতএব এসব বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এ মোকাবিলা অনুষ্ঠিত হবে। আমাকে খোদা তাআলা সরাসরি জানিয়েছেন কুরআন যে শিক্ষা নিয়ে এসেছে এটিই সত্য পথ। এ পবিত্র তৌহীদই বিগত সব নবী নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ বিকৃত হয়ে যায় এবং মানুষকে খোদা তাআলার আসন দিয়ে দেয়। মোটকথা, এ বিষয়ের ওপরই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, সেই সময় সমাগত যখন খোদা তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ নিজ কার্যকারিতা দেখাবে এবং আমি আশা রাখি, এই মোকাবিলা এক জগতের জন্য লাভজনক ও প্রভাবশীল ফলোদয়ের কারণ হবে। এখন সমগ্র জগত অথবা এর এক বৃহদাংশ সেই একমাত্র ধর্ম গ্রহণ করবে যা হবে সত্য ও জীবন্ত ধর্ম এবং যার সাথে থাকবে খোদা তাআলার কৃপার মেঘপুঞ্জ। এ বিতর্ক কেবল জমিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং আকাশও এর সাথে শামিল হোক এবং রূহানী জীবন ও আসমানী গ্রহণযোগ্যতা এবং বিবেকের উজ্জলতা কোন্ ধর্মে বিদ্যমান, কেবল এ বিষয়েই

মোকাবিলা হোক যাতে আমি এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ নিজ ঐশী কিতাবের প্রভাব সমূহ নিজ নিজ সত্তায় প্রমাণ করে দেখাই। তবে এরপর যৌক্তিকভাবে যদি উভয় ধর্ম বিশ্বাসের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চান তাহলে এটিও ভাল কথা। কিন্তু এর পূর্বে রূহানী ও আসমানী পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা (যে সত্য সরলপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)।

বিনীত
**মির্যা গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান, জেলা- গুরুদাসপুর
২৩ এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

## খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে নির্ধারিত বিতর্কানুষ্ঠানের শর্তাবলী

(ইংরেজী থেকে অনুবাদ)

(১) এ বিতর্ক অমৃতসরে হবে; (২) প্রত্যেক পক্ষে পঞ্চাশজন করে লোক থাকবেন। পঞ্চাশটি টিকেট মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব খ্রিষ্টানদের দেবেন এবং পঞ্চাশটি টিকেট ড. ক্লার্ক সাহেব মির্যা সাহেবকে মুসলমানদের জন্য দেবেন। খ্রিষ্টানদের টিকেট মুসলমানরা একত্র করবেন এবং মুসলমানদের টিকেট খ্রিষ্টানরা একত্র করবেন; (৩) মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মুসলমানদের পক্ষে থেকে এবং ডিপুটি আব্দুল্লাহ আথম খান সাহেব খ্রিষ্টানদের পক্ষে থেকে মোকাবেলায় আসবেন। (৪) এ দু'জন ছাড়া অন্য কারও কথা বলার অনুমতি হবে না। তবে এদের প্রত্যেকে তিন জনকে সাহায্যকারী হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু তাদের কথা বলার অধিকার থাকবে না; (৫) উভয় পক্ষ প্রচারের উদ্দেশ্যে নোটস নিতে পারবেন; (৬) এদের কেউ কোন পক্ষ থেকে এক ঘন্টার বেশি বলতে পারবেন না; (৭) সাংগঠনিক ব্যাপারে সদর আঞ্জুমানের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে; (৮) দু'জন সভাপতি হবে, অর্থাৎ উভয় পক্ষের

একজন করে, যাদের তখনই নির্ধারণ করা হবে; (৯) বিতর্কের স্থান নির্ধারণ ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্কের এক্তিয়ারভুক্ত হবে; (১০) বিতর্ক সকাল ৬টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে; (১১) বিতর্কের সর্বমোট সময়কাল দু'টি ভাগে বিভক্ত হবে। ৬ দিন অর্থাৎ সোমবার ২২ মে থেকে ২৭ মে পর্যন্ত সময়কালে মির্যা সাহেবের এ দাবী তুলে ধরার অধিকার থাকবে যে প্রত্যেক জীবিত ধর্মের সত্যতা জীবন্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রদান করা উচিত, যেভাবে উক্ত দাবী তিনি ড. ক্লার্ক সাহেবের নামে ৪ এপ্রিল, ১৯৮৩ইং তারিখের চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন; (১২) এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি উঠানো হবে। প্রথমে মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব-এর বিষয়ে। এবং মির্যা সাহেব চাইলে অন্য কোন প্রশ্নও করতে পারবেন, কিন্তু ছয় দিনের সময়সীমার ভেতর; (১৩) সময়ের দ্বিতীয় ভাগটিও হবে ৬ দিন পর অর্থাৎ ২৯মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত (প্রয়োজন সাপেক্ষে)। এ সময়টিতে মি. আব্দুল্লাহ আথম খান সাহেবের নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নাবলী পেশ করার অধিকার থাকবে: (ক) অযাচিত দয়া; (খ) জবর ও কদর; (গ) জোরপূর্বক ঈমান; (ঘ) কুরআন করীমের ঐশী বাণী হওয়ার প্রমাণ; (ঙ) মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল ছিলেন এর প্রমাণ এবং আরও অন্যান্য প্রশ্ন করতে পারেন ৬ দিনের মধ্যে; (১৪) ১৫ মে পর্যন্ত টিকিট বিলি হয়ে যাওয়া উচিত। এসব টিকেট নিম্নবর্ণিত ধরনের হবে: (১৫) খ্রিষ্টান এবং ডেপুটি আব্দুল্লাহ আথমের পক্ষ থেকে এসব নিয়ম-নীতি অবশ্য পালনীয় এবং সঠিক প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। সাক্ষ্যরূপে আমি এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর নীচে রয়েছে– আমরা মি. আব্দুল্লাহ আথম খান সাহেবের পক্ষ থেকে দস্তখত করছি। উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করাকেও ভঙ্গকারী পক্ষের দিক থেকে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার একটি স্বীকৃতি বলে বিবেচনা করা হবে; (১৬) লিখিত বক্তব্যগুলোর ওপর সভাপতি সাহেবান এবং বক্তাগণ সত্যায়নের উদ্দেশ্যে শেষে নিজেদের স্বাক্ষর প্রদান করবেন। দস্তখত হেনরী ক্লার্ক এম.ডি (ইত্যাদি), অমৃতসর, ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৩ইং। নমুনা টিকেট : ডেপুটি আব্দুল্লাহ আথম খান সাহেব এবং মির্যা গোলাম আহমদ-এ উভয়ের মাঝে অনুষ্ঠিতব্য বিতর্কে মুসলমানদের প্রবেশ ব্যবস্থাপকগণ সেগুলোর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বাক্ষর প্রদান করবেন। দস্তখত: হেণরী ক্লার্ক (এম.ডি ইত্যাদী) অমৃতসর ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৩ ডিপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম খান সাহেব এবং মির্যা গোলাম আহমদ, কাদিয়ান এ উভয়ের মাঝে অনুষ্ঠিতব্য বিতর্কে খ্রিষ্টানদের প্রবেশের জন্য টিকেট– দস্তখত: মির্যা সাহেব। উক্ত উভয়ের মাঝে অনুষ্ঠিতব্য বিতর্কে মুসলমানদের প্রবেশের জন্য টিকেট– দস্তখত: ড. ক্লার্ক সাহেব। অমৃতসর, ২৪ এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

## পত্র নম্বর ৬

# পাদ্রী সাহেবের ২৪ এপ্রিল তারিখের পত্রের উত্তরে ২৫ এপ্রিল তারিখে রেজিস্ট্রিযোগে পাঠানো পত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শ্রদ্ধেয় মেহেরবান পাদ্রী সাহেব,

আবশ্যকীয় অভিবাদনের পর। আমি আপনার চিঠি আদ্যপান্ত শুনেছি। আপনার এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত শর্তাবলী আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু সবার আগে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত যে এ বাহাস ও মোকাবিলা অনুষ্ঠানের মোক্ষম উদ্দেশ্য কী? এটিও কি পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে সুদীর্ঘকাল থেকে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত বাহাসগুলোর মতই একটি বাহাস হবে? এসব বাহাসের লব্ধফল হলো মুসলমানরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিৎ ধারণা পোষণ করে যে তারা খ্রিষ্টানদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে পরাজিত করেছে এবং খ্রিষ্টানরাও নিজেদের মহলে এসব কথা-বার্তাই বলে যে মুসলমানরা নিরুত্তর হয়েছে। যদি শেষমেশ ব্যাপারটি এটুকুই দাঁড়ায়, তাহলে এটা একেবারেই বৃথা ও নিতান্ত নিষ্ফল এবং এর শেষ পরিণতি এ ছাড়া অন্য কিছুই পরিলক্ষিত হয় না যে কয়েকদিন বাহাস বিতর্কের হৈ চৈ হওয়ার পর আবার প্রত্যেক সুযোগসন্ধানী দুর্মুখ ব্যক্তি নিজ পক্ষেরই বিজয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কথা বানিয়ে বলার সুযোগ পেতে থাকে। কিন্তু আমি চাই সত্য যেন স্পষ্টাকারে উন্মোচিত হয় এবং এক জগৎ প্রকাশ্যভাবে সত্যকে দেখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হয়রত মসীহ্ যদি খোদা হয়ে থাকেন এবং বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রতিপালকও হন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা শুধু কাফির নয়, বরং ঘোরতর কাফির বটে এবং এমতাবস্থায় ইসলাম ধর্ম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ (আ.) যদি কেবল একজন বান্দা ও খোদা তাআলার নবী ছিলেন এবং সৃষ্টজীবসুলভ সব দুর্বলতাই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল, তাহলে একজন দুর্বল অসাহায় বান্দাকে খোদা বানানোর দরুন এ খ্রিষ্টান সাহেবান মহা যুলুম ও ঘোরতর কুফরী করছেন বলে সাব্যস্ত হয়। আর এমত অবস্থায় কুরআন করীম আল্লাহর কালাম হওয়ার সম্পর্কে এর চেয়ে বড় প্রমাণ অন্য কিছু হতে পারে না যে কুরআন লয়প্রাপ্ত তৌহীদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং অতি প্রয়োজনের সময় অবতীর্ণ হয়ে একটি সত্য ঐশী গ্রন্থের আরদ্ধ সংস্কার কায সম্পন্ন করে দেখিয়েছে। খোদা কী এবং তাঁর গুণাবলী কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়টি যদিও

অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, তথাপি এখনও যেহেতু বিষয়টি খ্রিষ্টানদের বোধগম্য হয় না এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এ দেশ তথা ভারতে অনুষ্ঠিত বাহাস-বিতর্ক এদের বিশেষ কোন কাজে আসেনি। সেহেতু এখন বিতর্ক পদ্ধতি বদলে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অতএব আমার বিবেচনায় এতদুদ্দেশ্যে এর চেয়ে অধিক সমীচীন পদ্ধতি অন্য কিছু হতে পারে না যে একটি রূহানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'মুবাহালা' হিসেবে অনুষ্ঠিত হোক। সেটি হলো, যথারীতি আমার বন্ধুগণ কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক পর্বে ছয়দিন ব্যাপী বাহাস-বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর সপ্তম দিনে মুবাহালা অনুষ্ঠিত হোক। মুবাহালায় উভয় পক্ষ এ দোয়া করবেন: যেমন খ্রিষ্টান পক্ষ বলবেন, 'আমি যে ঈসা মসীহর প্রতি ঈমান রাখি তিনিই খোদা এবং কুরআন মানুষের বানানো মিথ্যা রচনা, এটি খোদা তাআলার কিতাব নয়। আমি যদি উক্ত বিষয়ে সত্যবাদী না হয়ে থাকি, তাহলে আমার ওপর এক বছর সময়ের মধ্যে এ রকম কোন আযাব অবতীর্ণ হোক, যার মাধ্যমে আমি প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত হয়ে যাই'। আর তেমনি এ অধম দোয়া করবে, 'হে পরিপূর্ণগুণের অধিকারী মহান খোদা, আমি জানি ঈসা মসীহ্ নাসেরী প্রকৃতপক্ষে তোমার বান্দা ও তোমার রসূল, সে কখনো খোদা নয়। আর কুরআন করীম তোমার পবিত্র কিতাব এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) তোমার প্রিয় ও মনোনীত রসূল। উল্লেখিত বর্ণনায় আমি যদি সত্য না হয়ে থাকি, তাহলে আমার ওপর একবছরের মধ্যে এরূপ কোন আযাব অবতীর্ণ কর, যদ্বারা আমার লাঞ্ছনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। হে খোদা, তোমার পক্ষ থেকে এক বছরের মধ্যে আমার সমর্থনে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হওয়া আমার লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট হবে যা মোকাবিলা করতে বিরুদ্ধবাদী সবাই অক্ষম হয়ে পড়ে'। উভয় পক্ষের স্বাক্ষরসহ নিম্নোক্ত লিখিত বক্তব্যটিও কয়েকটি পত্রিকায় ছেপে যাওয়া আবশ্যক হবে : এক বছরের ভেতর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ক্রোধগ্রস্ত বলে সাব্যস্ত হয়, অথবা একটি পক্ষের সমর্থনে এমন কতিপয় স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হয় যা অপর পক্ষের সমর্থনে প্রকাশিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত না হয়। এমতাবস্থায় পরাজিত পক্ষ হয়তো বিজয়ী পক্ষের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবে, নয়তো তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বিজয়ী পক্ষের সত্যপ্রমাণিত ধর্মের সাহায্যার্থে দান করে দেবে।[১৮]

বিনীত

**মির্যা গোলাম আহমদ**

কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর

১৮. হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯-৭০।

## পত্র নম্বর ৭

(পাদ্রী জাওয়ালা সিং-এর নামে)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমার মেহেরবান পাদ্রী জাওয়ালা সিং সাহেব,

যথাযথ সম্ভাষণের পর। কয়েকদিন হলো, আপনার এক সুদীর্ঘ পত্র পেয়েছি। কিন্তু নিজ জরুরী কাজের দরুন উত্তর লিখতে পারি নি। আমি দুঃখিত হয়েছি, আপনি কত শীঘ্র নিজের প্রথম পত্রের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী এ পত্রটি লিখে ফেলেছেন। আপনার পত্রটি মজুদ রয়েছে। এতে আপনি দাবী করেছিলেন, 'যে নিদর্শনই চাইবেন, আমি দেখাতে পারি। খোদাওন্দ মসীহ্ আমার আওয়াজ শোনেন'। এ কারণেই আমি উত্তরে লিখেছিলাম, ওরূপ নিদর্শন দেখাবার জন্য আপনাকে আমার পক্ষ থেকে আবেদন করা আবশ্যক নয়, বরং আবশ্যকীয়ভাবে আপনি সেই সব নিদর্শন দেখান, যা আপনাদের খোদাওন্দ মসীহ্ আপনাদের ঈমানদারীর চিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর ওরূপ নিদর্শন যদি দেখাতে না পারেন তাহলে দু'টি বিষয়ের একটি মানতে হবেঃ হয়তো আপনি ঈমানদার নন। নয়তো যিনি এরূপ নিদর্শনাবলী নির্ধারণ করেছেন তিনি মিথ্যেবাদী। আর তিনি, যিনি মিথ্যে ওয়াদার ভিত্তিতে নিজ ধর্ম চালাতে চান অতি মিথ্যেবাদী । এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমার এ প্রশ্নের কী উত্তর দিলেন? এটা কি সত্য নয় যে আপনি আপনার চিঠিতে এমনটি লিখেছেন, 'যে নিদর্শনই চান আমি দেখাতে পারি, খোদাওন্দ মসীহ্ আমার কথা শোনেন?' যদি এটা সত্য হয়ে থাকে তাহলে এখন আপনি সে খোদাওন্দ মসীহ্র সম্পর্কে কেন এত শীঘ্র সন্দিহান হয়ে পড়লেন? আর উত্তরে দ্বিতীয় চিঠিতে আপনি লিখেছেন, 'প্রথমে আপনি নিদর্শন দেখান। এরপর সে রকম নিদর্শন আমি দেখাবো'– এটা প্রকাশ্য ওয়াদাভঙ্গ। দাবী করে আবার সে দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া– এটা কি সত্যান্বেষীর লক্ষণ? যে ব্যক্তিকে কোন নিদর্শন দেখানোর সামর্থ্য ও সৌভাগ্য দেয়া হয়েছে সে আগেও দেখাতে পারে এবং পরেও পারে। ভাল কথা, আমি এটাও মেনে নিচ্ছি, (আমার) নিদর্শন দেখার পরেই নিদর্শন দেখাবেন। কিন্তু আপনি স্পষ্টভাবে এ অঙ্গীকারনামাটি লিখে পাঠান–

"কোন নিদর্শন দেখার পর আমি এর মোকাবেলায় এই নিদর্শন দেখাবো। অন্যথায় তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যাব। এমনটি যদি না করি তাহলে আমার প্রতি খোদা তাআলার অভিসম্পাত হোক!" এই লিখিত অঙ্গীকারনামা আসার পর আমি আবার আপনার প্রথম লেখার সম্পর্কে আপনার জবাবদিহি করবো।

আর আপনার একথা লেখা যে, 'আমরা উভয়ে কোন প্রকোষ্ঠে বসবো আর সেখানে আপনি নিদর্শন দেখাবেন' এটা কুরআন করীমের শিক্ষা নয় এবং ইঞ্জিলেও পাওয়া যায় না। সম্ভবত প্রকোষ্ঠ সম্পর্কিত পুরোনো ধ্যান ধারণাটি হিন্দুদের শিক্ষা থেকে আপনার মনের কুটীরে রয়ে গেছে। আমরা আমাদের রব্বে করীম আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার বাইরে পা রাখতে পারি না। আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, মাঠে-ময়দানে এসো এবং মাঠে-ময়দানে তোমাদের শত্রুদের অভিযুক্ত কর। অতএব আমরা আমাদের উজ্জ্বল প্রদীপ কোন প্রকোষ্ঠের ভেতরে লুকোতে পারি না। বরং ময়দানের উচ্চস্থানে স্থাপন করবো যেখান থেকে দূর দূর পর্যন্ত আলো যায়।

এরপর আপনি লেখেন, এসব চিঠি যেন অন্যেরা না জানে। আমি বুঝি না, এ কথা কোন্ শিক্ষার ভিত্তিতে (বলা হলো)। আমরা কোনো কাজে সৃষ্টজীবকে ভয় করি না। যদি সপ্রমাণ করা হয় প্রকৃতপক্ষে মরিয়মপুত্রই খোদা তাহলে সর্বাগ্রে আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো এবং কোন অপমান ও মরণকেও ভয় করবো না। কিন্তু আমরা জানি তিনি একজন অধম অক্ষম মানুষ এবং আমাদের কারোই আওয়াজ শোনেন না। আর আপনি যদি সত্যান্বেষী হয়ে থাকেন তাহলে এই বিতর্ক গোপন করেন কেন? পাদ্রীরা যদি এ সম্পর্কে জেনে যান তাহলে কি আপনার চাকরিচ্যুত হবার অথবা কোন মাসহারা বন্ধ হবার আশংকা করেন? লুকিয়ে লুকিয়ে বাহাস করা ঈমানদার ব্যক্তিদের কাজ নয়। এরপর 'কুরআন মসীহ্র মু'জিযাগুলোর সত্যায়নকারী'– আপনার এ বক্তব্যটি আপনার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। কুরআন করীম তো বলে, 'মসীহ্ একজন অক্ষম বান্দা ছিলো। কখনো সে খোদা হওয়ার দাবী করে নি। খোদা হবার দাবী করলে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন'। কুরআন আরও বলে, মসীহ্ যা কিছু বুযুর্গী ও সম্মান-মর্যাদা পেয়েছেন তা কেবল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কারণেই পেয়েছেন। কেননা মসীহকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদ জানানো হয় এবং তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। আর এই ঈমানের কারণে মসীহ্ নাজাত (পরিত্রাণ) পান। অতএব কুরআন অনুযায়ী মসীহ্র পবিত্র নাজাতদাতা হলেন আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। কুরআন করীম আবার এরূপ মসীহ্র সত্যায়ন কোথায় করলো, যে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে? বরং কুরআন করীম সেই মসীহ্র সত্যায়ন করেছে যিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং নিজেকে একজন অক্ষম বান্দা বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। এটা সত্য যে খোদা তাআলার একজন বিনীত বান্দা এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মসীহ্ ইবনে মরিয়ম কর্তৃক

কিছু মু'জিযাও প্রদর্শিত হয়েছে বলে কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এতে করে কি প্রমাণ হয়ে যাবে, হযরত মসীহ্‌র সে শিক্ষাই ছিল যে শিক্ষা নিয়ে আপনারা জেদ ধরেছেন? এতে করে কি প্রমাণ হয়ে যাবে, মসীহ্ যে ঈমানের প্রতি আপনাদের আহ্বান করেছিলেন আপনারা সে ঈমানের অধিকারী?

হে স্নেহবর! কখনো প্রমাণিত হবে না। এটা কখনো হবে না যতক্ষণ না মসীহর উক্তি অনুযায়ী আপনাদের মাঝে ঈমানদারদের চিহ্নাবলী পরিলক্ষিত হয়। আর মসীহ্ মু'জিযা দেখিয়েছেন বলে কুরআন করীমের উল্লেখিত সত্যায়ন থেকে আপনারা যদি কিছু ফায়দা উঠাতে চান যে কুরআন মসীহকে মু'জিয়ার অধিকারী বলে সাব্যস্ত করেছে আর এর দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে মসীহ্‌র দেয়া শর্ত অনুযায়ী আবশ্যকীয়ভাবে নিজেদের ঈমানদার হওয়া প্রমাণ করুন। মসীহ্ তো প্রকান্তরে আপনাদের বে-ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'এদের কাছ থেকে দূরে থাক। আমার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।' এ হিসেবে মসীহ্‌র সঙ্গে আপনাদের এবং মসীহ্‌রই বা আপনাদের সাথে কী সম্পর্ক? আর যতক্ষন ইঞ্জিল অনুযায়ী আপনারা নিজেদের সত্যিকার খ্রিষ্টান প্রমাণ না করেন, ততক্ষণ মুসলমানদের সাথে আপনাদের বিতর্ক করার অধিকার বর্তায় না। আমার স্মরণ আছে, অল্প কয়দিন আগে বাটালায় নিযুক্ত পাদ্রী ড. রাইট ব্রিখট্ সাহেব সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একজন দেশী খ্রিষ্টানসহ আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলি, 'পাদ্রী সাহেব! সত্যি করে বলুন, এ যুগের খ্রিষ্টানরা কি ইঞ্জিলে বর্ণিত চিহ্নাবলী অনুযায়ী সত্যিকার খ্রিষ্টান বলে আখ্যায়িত হতে পারে?' এর উত্তরে পাদ্রী সাহেবের মুখ দিয়ে এটাই বেরিয়ে গেল, 'না' (আখ্যায়িত হতে পারে না)। পাদ্রী সাহেব বাটালায় জীবিত আছেন। জিজ্ঞেস করে (জেনে) নিন, আমার এই বর্ণনা সঠিক কি না। কাজেই কুরআন যদি মসীহর সত্যায়ন করে, এতে ইঞ্জিলের দেয়া চিহ্নাবলী অনুযায়ী নিজেদের ঈমানদার প্রমাণ না করা পর্যন্ত আপনাদের কী লাভ? স্মরণ রাখুন, এটা কখনো সম্ভব নয়। আপনাদের সব কথাই মিথ্যা ও আস্ফালন মাত্র। মানুষের উপাসক আসমান থেকে সাহায্য পেতে পারে না। শীঘ্র উত্তর দানে সুখী করবেন। আর কোন কোন শব্দ তিক্ত বোধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। কেননা সত্য ভাষণের সাথে তিক্ততা আবশ্যকীয়ভাবে জড়িত।

বিনীত

**গোলাম আহমদ** কাদিয়ান[১৯]

৩০ জুন, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯. আল হাকাম, ৩০ জুন ১৯১০, পৃষ্ঠা ৩, ৪।

## পত্র নম্বর ৮

# সর্বসাধারণের জন্য জরুরী জ্ঞাতব্য

আক্ষেপের সাথে একথা আমাদের জানাতে হচ্ছে যে এমন একজন ব্যক্তির মোকাবেলায় 'নূরুল কুরআন' সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে যিনি ভদ্রোচিত শালীন ভাষার পরিবর্তে আমাদের গুরু ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ করে থাকেন। তিনি তার সহজাত হীনমন্যতা ও পঙ্কিলচিত্ততার দরুন এই 'ইমামুত্ তৈয়্যাবীন ও সৈয়্যদুল্ মতাহ্হারীন'–পবিত্রদের ইমাম ও পথপ্রদর্শক-এর প্রতি সর্বৈব মিথ্যাচারের মাধ্যমে এমন সব অপবাদ আরোপ করেছেন যা শুনে পবিত্র সৎচেতা ব্যক্তি মাত্রই আপাদ-মস্তক কেঁপে ওঠে। কাজেই কেবলমাত্র এ ধরণের নোংরা প্রবৃত্তির লোকের চিকিৎসা হিসেবে আমাদের এই তেতো ও গরম গরম উত্তর দিতে হলো। আমরা পাঠকবর্গ ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছি, হযরত মসীহ্ (ঈসা ইবনে মরিয়ম) সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অতি নেক ও শুভ রয়েছে। আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে তিনি খোদা তাআলার সত্য নবী ও তাঁর প্রিয় বান্দা ছিলেন এবং এ বিষয়ে আমাদের ঈমান রয়েছে যে, কুরআন করীম যেমন অবহিত করেছে তিনি তাঁর নাজাত ও পরিত্রাণের জন্যে আমাদের গুরু ও অভিভাবক মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের শত শত সেবকদের মাঝে একজন নিষ্ঠাবান সেবক তিনিও ছিলেন। তাই আমরা তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী সর্বতোভাবে তাঁর প্রতি আদব-লেহাজ ও সম্মান-ভক্তি বজায় রাখি। কিন্তু খ্রিষ্টানগণ যে যিশু নামের একজন ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেছেন যে কিনা খোদা হওয়ার দাবী করেছিল এবং নিজেকে ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (নবী-রসূল) সবাইকে অভিশপ্ত অর্থাৎ দুষ্কর্মকারী বলে মনে করতো যার শাস্তি হচ্ছে লা'নত বা অভিশাপ। এরূপ ব্যক্তিকে আমরাও ঐশী কৃপা থেকে বঞ্চিত বলে মনে করি। কুরআন করীম আমাদেরকে এই উদ্ধত ও দুর্মুখ যিশুর সন্ধান দেয়নি। এই ব্যক্তির চালচলন ও আচার-আচরণে আমরা অত্যন্ত স্তম্ভিত যে সে খোদার জন্য মৃত্যুকে বৈধ মনে করে আর নিজে খোদা হওয়ার দাবী করে। তার চেয়ে যাঁরা হাজার গুণ ভাল ও শ্রেয় ছিলেন তাঁদেরকে সে গালিগালাজ করেছে। কাজেই আমরা নিজ বক্তব্যে সর্বত্র খ্রিষ্টানদের কল্পিত এ যিশুকেই ধরে নিয়েছি। খোদা তাআলার একজন বিনীত বান্দা মরিয়ম পুত্র ঈসা যিনি নবী ছিলেন যাঁর উল্লেখ ও বর্ণনা কুরআন করীমে রয়েছে তিনি কখনও আমাদের কঠোর বক্তব্য সমূহের লক্ষ্যস্থল নন।

এ রীতিটি আমরা বরাবর চল্লিশ বছর ব্যাপী পাদ্রী সাহেবদের গালিগালাজ শোনার পর অবলম্বন করেছি। কিছু সংখ্যক অবুঝ মৌলবী-মৌলানা যাদেরকে অন্ধ ও কানা বলা চলে, তারা খ্রিষ্টানদেরকে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করেন–এ বেচারীদের মুখ দিয়ে নাকি কোন কথাই বেরোয় না, তারা নাকি তেমন কোন কথাই বলে না এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিও কোন বেআদবি করে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে পাদ্রী সাহেবান (রাসূলুল্লাহ্ ও কুরআনকে) হেয় প্রতিপন্ন ও অবমাননা করা এবং গালা গালি করার ক্ষেত্রে সর্বশীর্ষে রয়েছে। আমাদের কাছে এরূপ পাদ্রীদের বই-পুস্তকের এক স্তুপ রয়েছে যারা তাদের লেখায় শত সহস্র গালিগালাজ ভরে দিয়েছে। যে কোন মৌলবীর খাহিশ হলে তিনি এসে দেখে নিন। আর স্মরণ থাকা উচিত, ভবিষ্যতে যে পাদ্রী সাহেবান গালা গালি ও কটু কথার রীতি পরিহার করে আদব ও শিষ্টাচারের সাথে বক্তব্য রাখবেন আমরাও তাদের সাথে আদব ও শিষ্টাচার ভরে আচরণ করবো। এখনতো তারা নিজেদের যিশুর ওপর নিজেরাই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন ভাবেই গালিগালাজ ও কটুকথা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না। আমরা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেউ যদি কারও পিতাকে গালি দেয় তাহলে কি তার পিতাকেও সে মজলুমের গালি দেয়ার অধিকার নেই?! আর আমরা তো যা কিছু বলেছি সত্য সত্য যথার্থ বলেছি। 'ওয়া ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাতে' (–আর সব কর্মই নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল)।[২০]

বিনীত

**গোলাম আহমদ**

২০ ডিসেম্বর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ[২১]

২০. বুখারী কিতাবুল ঈমান ওয়ান নযুর বাব নিয়াতুল ঈমান।

২১. নূরুল কুরআন ২য় খন্ড, রুহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭৪, ৩৭৫।

# পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্র নামে

**পরিচিতি :** পাদ্রী-ফতেহ্ মসীহ্ ফতেহ্গড় চুড়িয়াঁ মিশনের কর্মচারী ছিলেন। বাটালার ইনচার্জ মিশনারী পাদ্রী হুয়াইট ব্রিখ্ট তার অতি সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ ব্যক্তি যেহেতু ইসলাম ধর্ম ত্যাগী ছিল সে কারণে অত্যন্ত দুর্মুখ হয়ে গিয়েছিল। কেননা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের জুয়াল খুলে ফেলা মানুষের ধর্মত্যাগী অবস্থা তাকে অধোমুখী করে দেয়। এটা এক ধরনের অভিশাপ হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সে একবার খামবন্দী বিষয়বস্তুর পাঠ উদ্ধারের চ্যালেঞ্জ দেয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিলেন তখন বাটালা শহর থেকে তাকে অপমানিত হয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং বাটালার মিশনারী ইনচার্জও তার এ ধরনের বাগাড়াম্বরকে পছন্দ করেননি। এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ 'হায়াতে আহমদ' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী গ্রন্থে আসবে।

এরপরও সেই পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্র একটি চিঠির উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'নূরুল কুরআন' পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। আজ যে পত্রটি আমি (নিম্নে) প্রকাশ করছি এটি সেই পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্র নামেই রয়েছে। (উল্লেখ্য যে,) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক হাজার টাকা অঙ্কের পুরস্কার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে ফতেহ্ মসীহ্ মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য হযরতকে লিখেছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ পত্রটির পর তার ওপর যেন মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এলো এবং মোকাবিলা করার মত তার আর সাহস হলো না। এমনি ধারায় এ দাবী আবারও সত্য সাব্যস্ত হলো :

چہ ہیبت ہا بدادند ایں جواں را
کہ ناید کس بہ میدانِ محمدؐ

উচ্চারণ ঃ "চে হায়বাত হা বেদানাদ ইঁ জাওয়াঁ রা
কে নায়াদ বে মেইদানে মুহাম্মদ (সা.)"

ভাষান্তর ঃ যুবকদেরকে কোন ভয় যে দিয়েছে যে,
কেউ মুহাম্মদ (সা.)-এর ময়দানে আসছে না।

এটুকু বর্ণনা করায় পাঠক মহোদয়গণ ফতেহ্ মসীহ্র প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পত্র সম্বলিত তত্ত্ব-তথ্যের আস্বাদনে অধিকতর পরিতৃপ্ত হবেন (ইরফানী)।

## পত্র নম্বর ৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আল-হামদুলিল্লাহি ওয়াসসালা-মু আলা ইবা-দিহিল্লাযীনাসতাফা' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেই বান্দাদের ওপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন)

এরপর জানা আবশ্যক, গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত ফতেহ্পুরে নিযুক্ত পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্ যেহেতু অত্যন্ত নোংরা এক চিঠি আমাদের পাঠিয়েছে, এতে সে আমাদের প্রভু ও অভিভাবক মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে এবং এ ছাড়া গালিগালাজের আকারে প্রচুর অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছে, কাজেই তার এ চিঠির উত্তর ছেপে দেয়া সমীচীন বলে মনে হলো। অতএব উত্তরটি প্রকাশ করা হলো। আশা করি, পাদ্রী সাহেবান এটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন এবং এর ভাষায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা এ বাচনভঙ্গী সবটাই মিয়াঁ ফতেহ মসীহ্র কঠিন অকথ্য ভাষা ও অত্যন্ত অশ্লীল গালিগালাজেরই পরিণতি মাত্র। তবে হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামের পবিত্র শান ও মর্যাদার প্রতি অবশ্যই আমাদের সশ্রদ্ধ লক্ষ্য রয়েছে। কেবল ফতেহ মসীহর রূঢ় ও অশ্লীল ভাষার বিনিময় ও প্রতি উত্তরে (খ্রিষ্টানদেরই বিশ্বাস অনুযায়ী) এক কল্পিত মসীহর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আর তাও একান্ত বাধ্য হয়ে। কেননা এ অর্বাচিন (ফতেহ্ মসীহ্) অত্যন্ত কঠোরভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ করে আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত করেছে। এখন নিম্নে আমরা এর উত্তর লিপিবদ্ধ করছি।

আমার মেহেরবান পাদ্রী সাহেব! আবশ্যকীয় অভিবাদনের পর।

এখন অবসর সময় আমার খুবই কম। কিন্তু আমি যখন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের নামে পাঠানো আপনার পত্রটি দেখলাম, তখন আমি আপনাকে আমার প্রণয়নাধীন পুস্তক সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া সমীচীন মনে করলাম, যাতে আপনার বেশি কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন না থাকে। স্মরণ রাখবেন এ পুস্তকটি এমন ধরনের হবে যা দেখে আপনি খুবই প্রসন্ন হবেন। আপনার সেইসব মেহেরবানীর দরুন, যা আপনার এবারকার পত্রে খুবই বেশি মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছি, উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের কারণ কেবল আপনারই আবেদন বলে ধরা হবে। কেননা যে নিবন্ধ লেখার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম তা আপনার এই চিঠি না এলে সম্ভবত বিলম্বে প্রকাশিত হতো।

আপনার এ চিঠিতে আপনি পবিত্র মহানবী (স.), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ও হযরত সাওদা (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ ও গালিগালাজ করেছেন। আপনার এই অনুগ্রহের দরুনই পুস্তকটি শীঘ্র প্রকাশে আপনিই ইন্ধন যোগাবার কারণ হয়েছেন। আশা করি, অন্যান্য পাদ্রী সাহেবও আপনার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও খুশী হবেন। আমাদের এ পুস্তক প্রকাশিত হবার পর আপনার যদি কিছু পদোন্নতিও হয় এতে অবাক হবার কিছু নেই। পাদ্রী সাহেব! আপনার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের কান্না পায়। আপনি আরবী ভাষার শিক্ষা থেকে তো বঞ্চিত ছিলেনই তদুপরি যেসব বিদ্যা ধর্মজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত যেমন (সাধারণ) বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা, সেগুলো থেকেও বঞ্চিতই সাব্যস্ত হলেন। আপনি যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে নয় বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা লিখেছেন এ প্রসঙ্গে প্রথমত নয় বছরের উল্লেখ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জবানি প্রমাণিত নয়। আর এ সম্পর্কে কোন ওহি (ঐশী বাণী)ও অবতীর্ণ হয় নি এবং পরম্পরা ধারায় বর্ণিত (মুত্তাসিল) হাদীসাবলীতেও প্রমাণিত নয় যে নির্ঘাৎ নয় বছরই ছিল। কেবল একজন রিওয়ায়াতকারীর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে মাত্র। আরবের লোকদের মাঝে পঞ্জিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রচলন ছিল না। কেননা তারা উম্মি (নিরক্ষর) ছিল এবং দু'তিন বছরের কম বেশ তাদের অবস্থাদৃষ্টে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। যেমন আমাদের দেশেও অধিকাংশ অশিক্ষিত লোক দু'চার বছরের পার্থক্যকে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন না। তদুপরি তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করে নেই যে বাস্তবিকই দিন গুণে গুণে হিসাবমত নয় বছরই ছিল তবুও কোন বুদ্ধিমান মানুষ আপত্তি করবে না। কিন্তু আহাম্মকের কোন চিকিৎসা নেই। আমরা আপনাকে আমাদের পুস্তকে প্রমাণ করে দেখাবো, নয় বছরেও মেয়েরা সাবালিকা হতে পারে। বরং সাত বছর বয়সেও মেয়েদের সন্তান হতে পারে। বড় বড় চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে চিকিৎসাবিদরা এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। স্বয়ং আমাদের দেশে শত শত মানুষের এটা চোখে দেখা ব্যাপার যে এ দেশেই আট কি নয় বছরের মেয়েদের সন্তানাদি রয়েছে। কিন্তু আপনার বেলায় কোন আফসোস নেই। হওয়াও উচিত নয়। কেননা আপনি কেবল বিদ্বেষপরায়ণ গোঁড়াই নন বরং প্রথম শ্রেণীর আহাম্মকও বটে। আপনি এখন পর্যন্ত এটুকুও জানেন না যে সরকারের আইন কানুন জনগণের চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী, তাদের রেওয়াজ-রীতি এবং সোসাইটির সাধারণ অবস্থা-অবয়বের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে। সেগুলোতে দার্শনিকদের পদ্ধতিতে তত্ত্বানুসন্ধান বিধেয় নয়। আর আপনি যে বার বার বৃটিশ সরকারের কথা উল্লেখ করেন, এটা একেবারেই সত্য যে

আমরা বৃটিশ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ এবং এর হিতাকাঙ্ক্ষী। আর যতদিন জীবিত আছি কৃতজ্ঞ ও হিতাকাঙক্ষী থাকবো। কিন্তু তবুও একে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত বলে মনে করি না এবং এর আইন-কানুনকে প্রজ্ঞাপূর্ণ গবেষণাভিত্তিকও মনে করি না। বরং কানুন প্রণয়নের মূল-নীতি হচ্ছে প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়। সরকারের প্রতি কোনো ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় না যাতে তারা নিজেদের আইন-কানুনে ভুল করতে না পারেন। আইন-কানুন যদি এমনই সংরক্ষিত হতো, তাহলে কেন সদা নিত্যনতুন কানুন প্রণীত হতে থাকে? ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের সাবালিকত্বের সময়কাল আঠার বছর নির্ধারিত করা হয়েছে। অথচ উষ্ণ প্রধান দেশগুলোতে মেয়েরা অনেক শীঘ্র সাবালিকা হয়ে যায়। আপনি যদি (ইংরেজ) সরকারের আইন-কানুনকে 'কাল্ ওহি মিনাস্ সামা' (আকাশ থেকে অবতীর্ণ ঐশীবাণীর মত–অনুবাদক) মনে করেন– এগুলোতে যেন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই, তাহলে ফিরতি ডাকে আমাদের অবহিত করুন যাতে ইঞ্জিল ও কানুনের মাঝে কিছু কিছু মোকাবেলা ও তুলনা করে দেখিয়ে আপনার একটু সেবা করা হয়। মোটকথা (বৃটিশ) সরকার (এ জাতীয়) কোনো ঘোষণাপত্র দেন নি যে তাদের আইন-কানুনও তওরাত ও ইঞ্জিলের মত ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। আপনি যদি কোন ঘোষণাপত্র পেয়ে থাকেন, এর একটি নকল আমাদেরও পাঠিয়ে দিন। কাজেই সরকারের আইন-কানুনও যদি তওরাত ও ইঞ্জিলের মত ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে আবার এগুলোর কথা উল্লেখ করার কারণ হয়তো নির্বুদ্ধিতা, নয়তো অন্ধ গোঁড়ামী বৈ আর কিছু না। কিন্তু আপনি অপারগ। সরকার নিজ আইন-কানুনে আস্থাবান হলে সেই সব ডাক্তারদের কেন শাস্তি দেন নি যারা সম্প্রতি ইউরোপে বড় বড় গবেষণার মাধ্যমে ৯ (নয়) বছর কেন বরং সাত বছরকেও কোন কোন নারীর সাবালকত্বের সময়কাল বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর আপনি নয় বছর সম্পর্কে আপত্তি তুলে আবার তওরাত কিংবা ইঞ্জিলের কোন উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন নি। কেবল গভর্নমেন্টের কানুনের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে জানা গেল, তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি আপনার আর ঈমান নেই। নচেৎ নয় বছরের অবৈধতা তওরাত কিংবা ইঞ্জিল থেকে সাব্যস্ত করা উচিত ছিল। পাদ্রী সাহেব! এটাই তো 'দাজাল' (প্রতারণা), ধর্ম গ্রন্থের বিষয়াদির ক্ষেত্রে আপনি গভর্ণমেন্টের কানুন পেশ করে দিয়েছেন। আপনার দৃষ্টিতে গভর্ণমেন্টের কানুনের সবকথা যদি ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত ঐশী গ্রন্থ তুল্য, বরং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হয়ে থাকে তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, যেসব (বনী ইস্রাঈলী) নবী ইংরেজী কানুনের বরখেলাফ করে কয়েক লক্ষ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের হত্যা করেছিলেন তাঁরা এ সময়ে মজুদ হলে ইংরেজ সরকার তাঁদের সাথে কী

আচরণ করতেন? যারা (অর্থাৎ যেসব হাওয়ারী) অন্য লোকের ক্ষেতের শস্য গুচ্ছ পেড়ে খেয়েছিলেন এবং তাদের যিনি এর অনুমিত দান করেছিলেন (অর্থাৎ হযরত মসীহ্) তাঁরা যদি গভর্ণমেন্টের সামনে চালান হয়ে আসতেন তাহলে (গভর্ণমেন্ট) তাদের কী কী শাস্তি দিতেন? তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, যে ব্যক্তি ডুমুর ফল খাওয়ার জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ হযরত মসীহ্) এবং ইঞ্জিল থেকে প্রমাণিত যে তিনি সে ডুমুর গাছের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন না, বরং তা অন্যের সম্পত্তি ছিল– সে ব্যক্তি যদি ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সামনে সে কাজটি করতেন তাহলে গভর্ণমেন্ট তাকে কী শাস্তি দিতেন? ইঞ্জিল থেকে এও প্রমাণিত যে অন্য লোকের শূকরপাল, পাদ্রী ক্লার্কের মতে যাদের সংখ্যা ছিল দু হাজার সে সব শূকর হযরত মসীহ্ বধ করেন। এখন আপনিই বলুন, (ইংরেজ সরকারের) দন্ডবিধি অনুযায়ী এর শাস্তি কী? আপাতত এটুকু লেখাই যথেষ্ট। উত্তর অবশ্যই লিখুন, যেন আরও অনেকগুলো প্রশ্ন করা যায়।

পাদ্রী সাহেব, নয় বছর বয়সের মেয়েদের সাথে সহবাস করা ব্যভিচারের আওতায় পড়ে-আপনার এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইঞ্জিল থেকে এটা প্রমাণ করা আপনার ঈমানদারী মতে কর্তব্য ছিল। ইঞ্জিল আপনাকে ধাক্কা দেয়। সেখান থেকে হাতে কিছুই না আসায় আপনি গভর্ণমেন্টের পায়ে এসে পড়েছেন। স্মরণ রাখুন, এসব গালি শয়তানী বিদ্বেষমূলক গোঁড়ামীপ্রসূত। পূত-পবিত্র মহানবী (সা.)-এর প্রতি অসৎকর্মের অপবাদ দেওয়া ও এসব মিথ্যারোপ শয়তানদের কাজ। এই দু'জন পবিত্র নবীর প্রতি অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত মসীহ্ (অ.)-এর প্রতি কোন কোন বজ্জাত ও দুষ্ট লোক ভয়ঙ্কর মিথ্যে দোষারোপ করেছে। সুতরাং এসব নোংরা লোক– আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক এদের ওপর–প্রথমোক্ত নবীকে ব্যভিচারী আখ্যা দিয়েছে। যেমন আপনি দিয়েছেন। আর শেষোক্ত নবীকে ব্যভিচারপ্রসূত (অবৈধ) সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে, যেমন নোংরা স্বভাব ইহুদীরা করেছে। আপনার উচিত এ ধরনের আপত্তি পরিহার করা।

আঁ হযরত (সা.) তাঁর স্ত্রী সাওদাকে বার্ধক্যের কারণে তালাক দিতে চেয়েছিলেন এ আপত্তিটি সর্বৈব অসত্য ও ঘটনাবিরোধী। যারা এ ধরনের রেওয়ায়াত (বর্ণনা) করেছে তারা কখনো এর প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। কোন্ ব্যক্তির কাছে আঁ হযরত (সা.) ওরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন? অতএব প্রকৃত সত্য যেভাবে প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রয়েছে তা হলো, সাওদা (রা.) নিজেই তাঁর বার্ধক্যের কারণে মনে মনে ভীত হয়েছিলেন, এখন তার অবস্থা আকর্ষণীয় না থাকার দরুন

আঁ হযরত (সা.) স্বাভাবিক অনিহাবশত তাকে তালাক দিতে পারেন এমনটি যেন না হয়। আর এও সম্ভব যে অপছন্দের কোন বিষয় তিনি (সাওদা) মনে মনে ভেবেছিলেন আর এর দরুন তালাকের আশঙ্কাও তার মনে দানা বেঁধেছিল। কেননা মেয়েলোকের মনমানসিকতায় এ রকম ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ প্রবণতা ও শংকা বেশি দেখা দেয়। এ কারণে তিনি নিজে নিজেই নিবেদন করেন, 'আমি এ ছাড়া আর কিছুই চাই না, আপনার সহধর্মীণিদের মাঝে যেন আমার পুনরুত্থান হয়।' সুতরাং 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি রয়েছে: **ওয়া লাকাদ কা-লাত্ সাওদাতু বিন্তে যামআতা হীনা আসান্নাত্ ওয়া খা-ফাত্ আইঁ ইউফা-রিকাহা রাসূলুল্লা-হি ওহাবতু ইওমী লি আয়িশাতি ফাকাব্বিলা যালিকা মিনহা ওয়া রাওয়া-হু আইযান ইব্নু সা'দিন্ ওয়া সায়ীদুব্নু মানসূর ওয়াত্ তিরমিযী ওয়া আব্দুর রাযযাক কা-লাল হা-ফিযু ফিল ফাতহি ফাতাওয়া-রাদাত হা-যিহির রিওয়াইয়াতু আলা আন্নাহা খাশিইয়াতিত্তালা-কা ফা ওয়াহাবাত।**[২২]

অর্থাৎ সাওদা বিনতে যামাআর যখন বার্ধক্যের কারণে এ ভয় হলো, এখন সম্ভবত তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার পালা আয়েশাকে দান করে দিচ্ছি'। তিনি (সা.) তার সে আবেদন গ্রহণ করে নিলেন। ইবনে সা'দ, সাঈদ বিন মনসুর, তিরমিযী এবং আব্দুর রাজ্জাকও এমনটিই বর্ণনা করেছেন। আর ফাতহুল বারী গ্রন্থেও লেখা আছে, সাওদার মনে আপনা আপনি তালাকের আশঙ্কার উদ্রেক হয়েছিল। এ কথাতেই হাদীসের বর্ণনাগুলোতে মিল রয়েছে। এখন এ হাদীসটি থেকে প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোন ইচ্ছা ব্যক্ত হয়নি। বরং সাওদা নিজের বার্ধক্যজনিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নিজেই মনে এই ধারণা পোষণ করে নিয়েছিলেন। এ সব হাদীসের বর্ণনার পারস্পরিক মিল ও স্বতঃস্ফূর্ত অর্থকে উপেক্ষা করে যদি ধরেও নেয়া হয় আঁ হযরত (সা.) স্বাভাবিক অরুচীর কারণে সওদাকে বার্ধক্যের অবস্থায় দেখতে পেয়ে তালাক দিতে ইচ্ছা করেছিলেন, এতেও কোন দোষ বর্তায় না। এটা কোন নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থীও নয়। কেননা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিশেষ সম্পর্ক যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল এতে যদি কোনভাবে এমন কোন বাধা সৃষ্টি হয়ে যায় যে কারণে সে সম্পর্কের হক্-অধিকার সম্পাদনে সক্ষম নয় সে অবস্থায় স্বামী যদি তাকওয়ার মূলনীতির দিক দিয়ে কোন প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে যৌক্তিকভাবে তা আপত্তিকর হতে পারে না।

২২. নায়লুল আওতার শারহু মুন্তাকাল আখবার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬।

পাদ্রী সাহেব, আপনার এই প্রশ্ন যে, আজ যদি [আঁ হযরত (সা.)-এর মত] কোন ব্যক্তি বৃটিশ সরকারের জমানায় হতো তাহলে এই সরকার তার সাথে কী আচরণ করতো? এ প্রসঙ্গে আপনার জ্ঞাতার্থে যেন প্রকাশ থাকে, সেই সৈয়দুল কাওনাইন (সা.) যদি বৃটিশ সরকারের যুগে মজুদ থাকতেন তাহলে এই ভাগ্যবান সরকার তাঁর পাদুকা বহনে নিজেদের গর্বিত বোধ করতেন, যেমন রোম সম্রাট সিজার কেবল ছবি দেখেই (সিংহাসন ছেড়ে) উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনার অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্যবশত আপনি এই সরকার সম্পর্কে এরূপ কুধারণা পোষণ করেন, এ সরকার যেন খোদা তাআলার পবিত্র মহাপুরুষদের শত্রু। এ সরকার সামান্য সামান্য মুসলমান আমীরদের সম্মান করে থাকেন। লক্ষ্য করুন, নাসরুল্লাহ্ খান যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর গোলামদের মতও মর্যাদা রাখেন না আমাদের মহারানী (ভিক্টোরিয়া) তাকে কত সম্মান করেছেন! কাজেই সেই আলী জনাব পবিত্র সত্তা (সা.), যিনি এ জগতেও এতো মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে রাজা বাদশা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়তেন তিনি এ সময়ে উপস্থিত থাকলে নিঃসন্দেহে এই সরকার তাঁর প্রতি সেবক সুলভ সবিনয় আচরণ ও ভক্তি প্রদর্শন করতেন। ঐশী সরকারের সামনে মানব সরকারের পক্ষে বিনয় ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন না করলেই নয়। আপনি জানেন না, রোম সম্রাট সিজার যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সময়ে (বর্তমান) খ্রিষ্টান রাজা-বাদশাহ্ এবং এ বৃটিশ সরকারের তুলনায় ঐশ্বর্যে মোটেও কম ছিলেন না, তিনি বলেন, 'এই মহামর্যাদাবান নবীর সাহচর্যে থাকার যদি আমার সৌভাগ্য লাভ হতো তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধৌত করতাম'। তার এই (ঐতিহাসিক) উক্তি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলী ও সহী হাদীসাবলীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আজও সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে রোম সম্রাট যে কথা বলেছিলেন, নিশ্চয় এ ভাগ্যবান বৃটিশ সরকারও সে কথাই বলতেন বরং এর চেয়েও বেশি ও শ্রেয়তর কথা বলতেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে রোম সম্রাট সিজার যা বলেছিলেন সে কথা হযরত মসীহ্র সম্পর্কে তৎকালীন ছোট কোন জায়গীরদারও বলে থাকলে আমরা আপনাকে এক্ষণই নগদ এক হাজার রূপী পুরস্কার দিব যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন। আর আপনি যদি এর প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে এই লাঞ্ছিত জীবনের চেয়ে আপনার পক্ষে মরণ শ্রেয়। কেননা আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে রোম সম্রাট এই মহান বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সমতুল্য ছিল। বরং ইতিহাস থেকে জানা যায়, সে যুগে এর সমতুল্য অন্য কোন শক্তি জগতে ছিল না। আমাদের (ইংরেজ) সরকার তো সে পর্যায়ে উপনীত হয় নি। কাজেই রোম সম্রাট সিজার যখন সেই (বিশাল) সাম্রাজ্য সত্ত্বেও গভীর

আক্ষেপের সাথে এ কথা বলেন: "এই মহামান্বিত নবীর সান্নিধ্যে পৌছুতে পারলে আমি সেই মহা পবিত্রের পদযুগল ধৌত করতাম," তখন এই বৃটিশ সরকার কি তাঁর চেয়ে কম অংশ নিতেন? আমি দাবীর সাথে বলছি, নিশ্চয় এই সরকার সেই আসমানী বাদশাহর অস্বীকারকারী নয়, যার মহাপরাক্রমের সামনে মানুষ মৃত কীটের সমান নয়। আর এক বিশ্বস্তসূত্রে আমি শুনেছি, আমাদের মহারানী ভিক্টোরিয়া (আল্লাহ তাঁর ঐশ্বর্য স্থিতিশীল ও আরো বৃদ্ধি করুন) প্রকৃতপক্ষে তিনি ইসলামকে ভালোবাসেন এবং তার অন্তরে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি রয়েছে অগাধ সম্মানবোধ। সুতরাং একজন বিদ্বান মুসলমানের কাছে তিনি উর্দূ ভাষাও পড়েন। তাঁর এহেন প্রশংসা শুনে আমি মহামান্য মহারানীকে এক বিশেষ আহবানের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। অতএব আপনারা যে এই গুণগ্রাহী সরকারকেও এক হীন ও নীচ পাদ্রীর মতন বলে ধারণা করেন এটা খুবই অন্যায়। যাদেরকে খোদা রাজত্ব, ধনদৌলত ও ঐশ্বর্য দান করেন তাদের তিনি জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাও দান করে থাকেন। তবে যদি এ প্রশ্ন দাঁড়ায় এ সরকারের দেশে কোন ব্যক্তি 'আমি খোদা' বা 'আমি খোদার পুত্র' বলে হট্টগোল বাঁধালে এই সরকার তার কী প্রতিকার করতেন? তাহলে এর জওয়াব এটাই যে এ সদাশয় সরকার তাকে কোন ডাক্তারের কাছে সোপর্দ করতেন, যাতে তার মস্তিষ্কের সংস্কার (চিকিৎসা) হতে পারে। আর তাকে লাহোরের সেই বড় ঘরটিতে সংরক্ষিত করতেন, যেখানে এ ধরনের অনেক লোক একত্রে রয়েছে।

আমরা যখন হযরত মসীহ্ (আ.) এবং হযরত খাতামান্নাবীয়ীন (সা.)-এর মাঝে এ ব্যাপারেও তুলনা করি যে তাঁদের নিজ নিজ যুগের সংশ্লিষ্ট সরকার তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলো এবং তাঁদের উভয়ের ঐশী প্রতাপ বা ঐশী সাহায্য কতটা প্রভাব দেখিয়েছিল, তখন আমাদের স্বীকার করতে হয়, হযরত মসীহ্র সত্তায় পবিত্র মহানবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর তুলনায় তাঁর ঐশ্বরিক প্রতাপ ও প্রভাব তো দূরের কথা তাঁর নবুওয়তের শান ও মর্যাদাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাজা-বাদশাহ্গণের নামে যখন মহানবী (সা.)-এর ফরমান জারী হলো, তখন রোম সম্রাট আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন, আমি তো খ্রিষ্টানদের অক্টোপাশে আটকে আছি। হায়! আমার যদি এখান থেকে ছুটে বেরুবার সুযোগ হতো তাহলে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই আলিজনাবের পদযুগল কৃতদাসদের মত ধৌত করে নিজেকে গর্বিত বোধ করতাম। কিন্তু এক দুষ্ট ও অপবিত্র চেতা সম্রাট ইরানের কিস্রা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে গ্রেফতারের জন্য সৈনিক পাঠিয়ে দেয়। তারা সন্ধ্যার কাছাকাছি বেলায় পৌঁছে বললো, 'আমাদের প্রতি গ্রেফতার করার

আদেশ রয়েছে।' তিনি এই বেহুদা কথাকে উপেক্ষা করে বলেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।' সেসময় তিনি কেবল দু'চারজন সাহাবা সহ মসজিদে বসা ছিলেন। কিন্তু এক ঐশ্বরিক প্রভাবে সে দুজন সিপাহি বেত-লতার মত কাঁপছিল। অবশেষে তারা নিবেদন করলো, আমাদের খোদাওন্দের আদেশ অর্থাৎ গ্রেফতার করার বিষয়ে আলী জনাবের কী জবাব? তাহলে সে জবাবই নিয়ে যাই। হযরত নবী করীম (সা.) বললেন, 'আগামীকাল তোমরা এর জবাব পাবে।' প্রত্যুষে যখন তারা উপস্থিত হলো, তিনি তাদের বললেন, "তোমরা যাকে খোদাওন্দ করে বলে থাক সে খোদাওন্দ নয়। প্রকৃতপক্ষে খোদাওন্দ হলেন তিনি, যিনি লয় ও মৃত্যুর কবলে পড়েন না। কিন্তু তোমাদের খোদাওন্দ আজ রাতে নিহত হয়েছে। আমার সত্য খোদা তাকে তারই পুত্র 'শিরওয়ার' কবলগ্রস্ত করে দেন। অতএব তার হাতে আজ রাতে সে নিহত হয়েছে। আর এটাই হলো জবাব।' এটি এক বিরাট মু'জিযা ছিল। সে দেশের হাজার হাজার লোক ঈমান আনে কেননা সে রাতেই প্রকৃতপক্ষে খসরু পারভেজ অর্থাৎ কিসরা নিহত হয়েছিল। স্মরণ রাখা উচিত, এ বর্ণনাটি ইঞ্জিলের উদ্ভট ও ভিত্তিহীন বৃত্তান্তগুলোর মত নয়। বরং এটি প্রামাণ্য হাদীসসমূহ ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং ডেভেন রিপোর্ট[২৩] সাহেবও এ ঘটনাটি নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সে সময়কার রাজা বাদশাহ্দের সামনে হযরত মসীহ্র যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তা গোপন কোন বিষয় নয়। সেসব পৃষ্ঠা সম্ভবত এখনও ইঞ্জিলে মজুদ থাকবে যেগুলোতে লেখা আছে, হেরোডিস হযরত মসীহ্কে অপরাধীদের মত পিলাতের কাছে চালান করেন (গ্রেফতার করে প্রেরণ করেন) এবং তিনি এক দীর্ঘ সময় রাজকীয় কারাগারে থাকেন। 'ইশ্বরত্ব' এতটুকুও কাজে লাগেনি এবং কোন বাদশাহ্ এ কথা বলেননি যে হযরত মসীহ্র সকাশে থাকলে তাঁর পা ধুয়ে গর্ববোধ করবেন। বরং পিলাত (হযরত মসীহ্কে) ইহুদীদের কাছে সোপর্দ করে দেয়। এটাই ছিল ইশ্বরত্ব? অদ্ভূত রকমের তুলনা! দুজন ব্যক্তি একই ধরনের ঘটনাবলীর সম্মুখীন হন। আর উভয়ই পরিণামে পারস্পরিক তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম সাব্যস্ত হন। একজনকে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্কে) গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে শয়তানের প্ররোচনায় এক অহঙ্কারী-স্বৈরাচারী সম্রাটের উত্তেজিত হওয়া এবং অবশেষে স্বয়ং ঐশী অভিশাপে গ্রেফতার হয়ে নিজ পুত্রের হাতে চরম লাঞ্ছনার সাথে নিহত হওয়া। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (ঈসা মসীহ্), যাকে তার প্রকৃত দাবী উপেক্ষা করে অতিরঞ্জনকারীরা আকাশে উঠিয়ে রেখেছে, তার সত্য সত্যই গ্রেফতার হয়ে চালান

২৩. John Devenport.

হওয়া এবং অদ্ভূত বেশে করুণভাবে জালেম পুলিশ কর্তৃক হাজতী হিসেবে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হওয়া। আফসোস, জ্ঞান বুদ্ধির উন্নতির এই যুগ, আর এমনতর বেহুদা আকীদা-বিশ্বাস? ছি! ছি! ছি!

যদি বলেন, কোন্ কিতাব বা গ্রন্থে লিখা আছে যে রোম সম্রাট সিজার এ আকাঙ্ক্ষা ব্যাক্ত করেছিলেন, 'আমি যদি মহামান্বিত পবিত্র নবী (সা.)-এর সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারতাম তা হলে আমি নগণ্য ভৃত্য হয়ে তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম?' এর উত্তরে আমি আপনাদের জন্য 'আসাহ্হুল কিতাবি বা'দা কিতাবিল্লাহ্' (আল্লাহ্র মহাগ্রন্থ কুরআনের পরে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ) সহী বুখারীতে লেখা সংশ্লিষ্ট কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করছি। চোখ খুলে পড়ুন। আর তা হলো– **ওয়া কাদ কুন্ত আ'লামু আন্নাহু খা-রিজুন ওয়া লাম আকুন আযুন্নু আন্নাহু মিনকুম ফালাও আন্নি আ'লামু আন্নি আখলাসু ইলাইহে লাতাজাশশামতু লিকা-য়াহু ওয়া লাও কুন্ত ইন্দাহু লাগাসালতু আন কাদামইহী**[২৪]

অর্থাৎ, "এটা তো আমি জানতাম, নবী আখেরুজ্জামান আগমন করবেন কিন্তু তিনি যে (হে আরববাসী!) তোমাদের মাঝ থেকে হবেন, (জন্মগ্রহণ করবেন) তা আমার জানা ছিল না। অতএব তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হলে আমি তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। আর আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হলে তাঁর পদযুগল ধুতাম।" এক্ষণে কিছু আত্মাভিমান ও লজ্জাবোধ থাকলে মসীহ্র জন্য তাঁর সমসাময়িক কোন বাদশাহ্র পক্ষ থেকে এহেন সম্মানপ্রদর্শন উপস্থাপন করুন। **আর আমাদের কাছ থেকে নগদ এক হাজার রুপী পুরস্কার নিন**। একান্তভাবে যে ইঞ্জিল থেকেই পেশ করতে হবে তা মোটেও আবশ্যিক নয়। বরং পারলে নোংরা আবর্জনায় পড়ে থাকা এতদ্বিষয় সম্বলিত কোন পাতাই উপস্থাপন করে দিন। আর কোন বাদশাহ্ বা আমীর (সম্ভ্রান্ত সরদার বা নেতা) না হোক, কোন ছোট্ট নবাবই পেশ করে দিন। তবে স্মরণ রাখবেন কখনো পেশ করতে পারবেন না। অতএব এ আযাবটিও জাহান্নামের আযাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয় যে নিজেই আপত্তি উত্থাপন করে আবার নিজেই অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন। সাবাস! সাবাস! সাবাস! কী ভাল পাদ্রী আপনি!!

মসীহ্র চালচলন ও রীতি কী ছিল? (ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী তিনি ছিলেন) ভোজনরসিক, মদখোর ব্যক্তি; পরহেজগারী ইবাদত ও সত্যপরায়ণতায় প্রতিষ্ঠিত

২৪. বুখারী কিতাবু বাদ্য়িল ওয়াহী।

ছিলেন না। তিনি ছিলেন অহঙ্কারী, দাম্ভিক, স্বার্থপরায়ণ ও খোদা হওয়ার দাবীদার এক ব্যক্তি। কিন্তু তার আগে আরো অনেক খোদা হওয়ার দাবীদার গত হয়েছে। একজন মিশরেই মজুদ ছিল। (তাঁর) দাবীগুলো আলাদা রেখে প্রকৃতপক্ষে তার মাঝে প্রমাণিত কোন নৈতিক অবস্থার দৃষ্টান্ত একটু হলেও দেখান যাতে বাস্তব ও প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। কারও কেবল (মৌখিক) কথাবার্তা তার নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আপনি আপত্তি উত্থাপন করেন যে সেইসব মুর্তাদ ধর্মত্যাগী যারা নিজেরা খুনের অপরাধী ছিল এবং নিজেদের কার্যকলাপের দরুন শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আপনার স্মরণ থাকলো না যে বণী ইস্রাঈলী নবীগণ তো দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও হত্যা করেন। দুএকজন নয় বরং লক্ষ লক্ষ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা দাঁড়ায়। আপনি কি তাঁদের নবুওয়ত অস্বীকার করেন? নচেৎ তা কি খোদার আদেশ ছিল না? **কিংবা মুসার সময়ে খোদা ছিলেন এক, আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সময়ে অন্য কেউ?**

হে যালেম পাদ্রী! কিছুতো লজ্জা কর। অবশেষে মরতে হবে। মসীহ্ বেচারা তোমার জায়গায় জবাবদেহির সম্মুখীন হবেন না। তোমার কর্যকলাপের জন্য তোমাকেই ধরা হবে। তাঁর কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। হে মূর্খ! তুমি নিজ ভাইয়ের চোখে তৃণ দেখতে পাও। অথচ নিজ চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাও না। তোমার চোখের কী হয়েছে যে দেখতে পাও না?

হযরত যয়নাবের বিয়ে সম্পর্কীয় বৃত্তান্তটি আপনি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে অন্যায়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য আমরা আর কী বলতে পারি: **'বদ গহর আয খাতা খাতা না কুনাদ'** (দুরাত্মা, দুষ্ট স্বভাবের লোক ভ্রমবশত ভুল করে না–অনুবাদক)।

হে নীচ! পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বিয়ে করা ব্যভিচার নয়। কেবল মুখের কথায় কেউ (প্রকৃত) পুত্র হতে পারে না, কেউ পিতাও হতে পারে না এবং মাও বনে যায় না। যেমন কোন খ্রিষ্টান যদি রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে মা বলে ফেলে এতে কি সে (স্ত্রী) তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং তার ওপর তালাক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে? না বরং সে (খ্রিষ্টান) দস্তুরমত সে 'মা'-এর সাথেই সহবাস করতে থাকবে? অতএব যিনি বলেন, তালাক বিনা ব্যভিচারে প্রযোজ্য হতে পারে, তিনি নিজেই স্বীকার করে নেন যে কেবল নিজ মুখে কাউকে মা, বাবা কিংবা পুত্র বলা কোনো মূল্য রাখে না। নচেৎ তিনি অবশ্যই বলতেন, মা বলায় তালাক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সম্ভবত হযরত মসীহ্র সেই জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না, যা ফতেহ্

মসীহ্‌র রয়েছে! এখন (হে পাদ্রী!) ইঞ্জিল থেকে এর প্রমাণ উপস্থিত করা আপনার জন্য বাধ্যকর যে, নিজ স্ত্রীকে মা বলায় তালাক কার্যকর হয়ে পড়ে। হয়তো নিজ মসীহ্‌কে ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ বলে মেনে নিন নয়তো প্রমাণ দিন বাইবেল অনুযায়ী পোষ্যপুত্র প্রকৃতপক্ষে পুত্র হয়ে যায় এবং পুত্রের মত উত্তরাধিকারী হয়। কোনো প্রমাণ যদি না দিতে পারেন তাহলে এ ছাড়া আর কী বলা যায়: **"লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযেবীন"** (মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ)? **হযরত মসীহ্‌ও আপনাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন**। কেননা তিনি ইঞ্জিলে কোথাও বলেন নি, নিজ স্ত্রীকে মা বল্‌লে তার ওপর তালাক প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। আর আপনি জানেন, এ তিনটি বিষয় এক ও অভিন্ন। কেবল মুখের কথায় যদি (স্ত্রী) মা হতে না পারে তাহলে (কেউ) পুত্রও হতে পারে না এবং পিতাও হতে পারে না। এখন লজ্জা-শরম থাকলে **হযরত মসীহ্‌র সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। নইলে এর কোন উত্তর দিন। স্মরণ রাখুন, কখনো দিতে পারবেন না যদিও চিন্তা-ভাবনা করতে করতে মরেই যান না কেন।**[২৫] **কেননা তোমরা মিথ্যেবাদী এবং হযরত মসীহ্‌ তোমাদের প্রতি নাখোশ রয়েছেন।**

আর আপনার এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা যে পরিখা খননকালে চার ওয়াক্তের নামায 'কাযা' করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমত আপনাদের জ্ঞানের বহর এটুকু যে 'কাযা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (অথচ) হে মূর্খ! 'কাযা' (শব্দ) বলা হয় নামায আদায় করাকে। নামায ছেড়ে দেয়ার নাম কখনো 'কাযা' নয়। কারও নামায ছুটে গেলে এর নাম হলো 'ফওত'। এ কারণেই আমরা পাঁচ হাজার টাকার (পুরস্কার প্রদান সম্বলিত) ইশ্‌তেহার দিয়েছিলাম, 'কাযা' শব্দের অর্থ যাদের এখনও জানা নেই এমন অর্বাচিন লোকও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। যে ব্যক্তি শব্দই যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে না সে মূর্খ সূক্ষ্ম বিষয়াবলী সম্পর্কে সমালোচনা করার কী বা যোগ্যতা রাখে? আর রইল, পরিখা খননকালে চার ওয়াক্তের নামায 'জমা' (অর্থাৎ একত্রে আদায়) করা হয়– এ আহাম্মকসুলভ কুপ্ররোচনার জবাব হলো, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ইসলাম ধর্মে 'হারাজ' নেই অর্থাৎ এমন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়। কাজেই তিনি প্রয়োজনের সময়ে এবং বিপদাপন্ন অবস্থায় নামায 'জমা' করার এবং 'কসর' করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু উক্ত ঘটনাকালে আমাদের কোন প্রামাণ্য হাদীসে চার ওয়াক্তের নামায 'জমা' করার উল্লেখ নেই। বরং 'সহী বুখারীর' ব্যাখ্যা 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লিখা আছে, ঘটনা শুধু এটুকুই ঘটেছিল যে একটি নামায

২৫. এর জবাব দেয়া সম্ভব হয় নি এবং ফতেহ মসীহ্‌ মারা যায় (ইরফানী)।

অর্থাৎ আসরের নামায যথারীতির তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করা হয়। এখন আপনি যদি আমাদের সামনে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আপনাকে একটু বসিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করতাম, চার ওয়াক্তের নামায ছুটে গিয়েছিল– এটি কি **'মুত্তাফাকআলায়হ্'** (প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ দু'টিতে বর্ণিত) রিওয়ায়াত? স্বয়ং শরীয়ত অনুযায়ী যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা চার ওয়াক্তের নামায অবশ্য 'জমা' হতে পারে। তবে একটি 'দুর্বল' রিওয়ায়াতে আছে যে, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায একত্র করে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীস একে খন্ডন করে। কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে আসরের নামায সংকীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল। আপনি আরবী ভাষার জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং এ সম্বন্ধে নিরেট অজ্ঞ। কাদিয়ানের দিকে একটু আসুন ও আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সামনে কিতাবাদি রাখা হবে, যাতে মিথ্যেবাদী ও মিথ্যারোপকারীর কিছুটা হলেও শাস্তি হয়। লজ্জা ও অনুতাপের শাস্তিই বা কম কী? তবে এ শ্রেণীর লোক লজ্জিতও হয় না বটে।

সরাসরি আপনার মসীহ্র সম্মুখে হাওয়ারীদের চুরি করা খাবার খাওয়া অর্থাৎ অজানা-অচেনা লোকের ক্ষেত থেকে শস্য তুলে নেওয়া কি সঠিক (বিধিসম্মত) ছিল। কোন যুদ্ধে কাফেরদের মুহুর্মুহু হামলার মুখে ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে আসরের নামায সংকীর্ণ সময়ে পড়ার ক্ষেত্রে কেবল এটুকুই ব্যাপার ছিল যে দুটি ইবাদত একত্র হওয়ার সময়ে সে ইবাদতটিকে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয় সেটিতে ছিল কাফেরদের মারাত্মক আক্রমণের প্রতিরোধ, নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষা এবং দেশ ও জাতির ন্যায্য ও যথাযথ সংরক্ষণ (নিশ্চিত করা)। আর এ যাবতীয় কার্যক্রম ছিল সেই ব্যক্তির, যিনি শরীয়ত আনয়ন করেছেন। আর এ কর্মকান্ড ছিল সম্পূর্ণ কুরআন করীমের নির্দেশমত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ **'ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহউন ইউহা'** (সূরা আন-নাজ্ম : ৪, ৫) [অর্থাৎ নবীর প্রত্যেক বিষয় খোদা তাআলার আদেশে হয়ে থাকে]। নবীর জীবনকাল শরীয়তের অবতরণকাল বিশেষ হয়ে থাকে। আর যা তিনি পালন করেন তা-ই শরীয়ত (বা বিধান) হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। নচেৎ হযরত মসীহ্ তাওরাতের পরিপন্থী যেসব কাজ করেন, এমন কি সাবাতেরও পরোয়া করেন নি এবং খাবার খাওয়ার সময় হাত ধোন নি। এ সবই মসীহ্কে (বিধানভঙ্গের অপরাধে) অপরাধী সাব্যস্ত করে। তাওরাত থেকে এসব বিষয়ের (বৈধতার) একটু প্রমাণ তো দিন। হযরত মসীহ্ পিটারকে শয়তান আখ্যা দিয়েছিলেন। এরপর নিজের কথা আবার নিজেই ভুলে গেলেন? আর শয়তানকে কেন হাওয়ারীদের গন্ডীভুক্ত রাখলেন?

এরপর আপনার আপত্তি হলো, বহু সংখ্যক স্ত্রী ও কৃতদাসী রাখা পাপাচার ও অন্যায় আচরণ। হে অজ্ঞ! হযরত দাউদ নবী (আ.)-এর স্ত্রীদের কথা কি স্মরণ নেই? পবিত্র গ্রন্থে (বাইবেল) যার প্রশংসা (লিখা) রয়েছে, তিনিই কি জীবনের অন্তিমকাল অবধি এ কুকর্ম করতে থাকলেন? এ কুকর্মেরই কি এই বংশধর (হযরত মসীহ্), যার ওপর তোমরা ভরসা করে আছ? যে খোদা উরিয়ার স্ত্রী সম্পর্কে দাউদকে ভর্ৎসনা করেছেন, তিনি কি দাউদের আজীবন লিপ্ত থাকা সেই অপরাধের প্রতি উদাসীন ছিলেন? কেবল তাই নয়, বরং খোদা তার বক্ষ উষ্ণ রাখার জন্য তাকে আরো একটি যুবতী দিলেন? আর আপনাদের খোদা (মসীহ্)-এর সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে, উরিয়ার ঘটনা ছাড়া দাউদ নিজ কর্মকান্ডে সত্যপরায়ণ বটে। কাজেই বহু বিবাহ যদি খোদার দৃষ্টিতে মন্দ কাজ ছিল তাহলে খোদা কি সেই বনী ইস্রাঈলী নবীদের এ কাজের জন্য একবারও তিরষ্কার করতেন না যাঁরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আদর্শ দৃষ্টান্ত বিশেষ? অতএব যে বিষয়টি পূর্বেকার নবীদের মাঝে বিদ্যমান এবং খোদা তাআলা একে আপত্তিকর বলে সাব্যস্ত করেননি, এখন সে বিষয়টিকেই দুষ্টামী ও বজ্জাতি করে পবিত্র মহানবী (সা.) সম্পর্কে আপত্তিকর বলে তুলে ধরা কি চরম বেইমানী নয়? আফসোস, এ লোকগুলো এতো নির্লজ্জ যে এটুকুও চিন্তা করে না, একাধিক বিয়ে যদি ব্যভিচার হয়ে থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ যে নিজেকে দাউদের বংশধর বলে আখ্যাত করেন, সেক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র জন্ম সম্পর্কে ভীষণ সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আর কে প্রমাণ করতে পারবে, তাঁর বড় নানী হযরত দাউদের প্রথম স্ত্রী ছিলেন?

এরপর আপনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর নাম ধরে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, পবিত্র মহানবী (সা.)-এর গায়ের সঙ্গে গা লাগানো এবং জিহ্বা চোষা শরীয়ত বিরোধী ছিল। এই পঙ্কিল বিদ্বেষের দরুন কতো আর কাঁদা যায়? হে অর্বাচিন! বৈধ ও শাস্ত্রসম্মত বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব বিষয় ন্যায়সঙ্গত। কী ধরনের এই আপত্তি? আপনারা কি জানেন না, পুরুষত্ব ও প্রজনন-শক্তি মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলীর মাঝে পরিগণিত। হিজড়া বা নপুংসক হওয়া কোন ভাল গুণ নয়। যেমন বোবা ও বধির হওয়া কোন সদ্‌গুণের মধ্যে পড়ে না। তবে এ আপত্তিটি অনেক বড় যে, হযরত মসীহ আলায়হিস সালাম পুরুষত্বের গুণাবলীর মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট গুণ থেকে নিছক বঞ্চিত হওয়ার কারণে স্ত্রীদের সাথে সত্যিকার ও পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও নমুনা দিতে পারেন নি। এ জন্য ইউরোপের নারীরা নিতান্ত লজ্জাস্কর স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেছে। আর অবশেষে অকথ্য পাপাচার ও উশৃঙ্খলতার গহ্বরে নিপতিত হয়েছে।

হে অজ্ঞ! মানবপ্রকৃতি ও এর সহজাত সত্যিকার পবিত্র আবেগ-অনুভূতি দিয়ে নিজ স্ত্রীদের আদর সোহাগ এবং উত্তম জীবন যাপনের সব রকম বৈধ রীতি-নীতির প্রয়োগ হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট বিশেষ। ইসলামের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও তা প্রয়োগ করেছেন ও নিজ উম্মতকে এর উত্তম নমুনা দান করেছেন। হযরত মসীহ্ তাঁর শিক্ষার ত্রুটির কারণে নিজ কথা ও কাজে সেই ত্রুটি রেখে যান। কিন্তু স্বাভাবিক চাহিদা থাকার কারণে ইউরোপ ও খ্রিষ্টিয় সমাজ স্বয়ং এতোদ্দেশ্যে নিয়ম-কানুন উদ্ভাবন করে নেয়। এখন আপনারা নিজেই ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকিয়ে দেখে নিন অতি নোংরা ও গভীর অন্ধকার পাপ (ছড়িয়ে পড়া) ও দেশ কি বেশ্যালয়ে পরিণত হওয়া এবং হাইডপার্কগুলোতে হাজার হাজার নারী-পুরুষের প্রকাশ্য দিবালোকে কুকুর-কুকুরীদের মত কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার দৃশ্যাবলী। আর অবশেষে এই অসঙ্গত স্বাধীনতায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে হা-হুতাশ করার এবং দীর্ঘকাল আত্মসম্ভ্রমহীন অশ্লীল কুকর্মের কুফল ভোগ করার পর অবশেষে তালাক সম্পর্কীয় আইন পাস করা এটা কিসের পরিণতি? এটা কি এই পবিত্র উম্মি নবী যিনি অন্য সবারও পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি সাধন করেন তাঁর জীবন যাপনের সেই দৃষ্টান্তস্থানীয় নমুনার পরিণতি, যে নমুনা সম্পর্কে আপনি আপনার অভ্যন্তরীণ কলুষতার তাড়নায় আপত্তি তুলেছেন এবং ইসলামী দেশগুলোতে যে দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়েছে (তা-ও কি এরই পরিণতি)? না কি এটা এক অতি ত্রুটিযুক্ত অযোগ্য কিতাব পৌলের কারসাজিতে তৈরী ইঞ্জিলের মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ শিক্ষারই কুপ্রভাব?

এখন নতজানু হয়ে বসুন এবং বিচারদিবসের চিত্র এঁকে গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করুন। হ্যাঁ! মসীহর দাদী ও নানীদের সম্পর্কে যে আপত্তি রয়েছে এর কী উত্তর সে সম্পর্কেও কি আপনারা চিন্তাভাবনা করেছেন? আমরা তো চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কোন সদুত্তর মাথায় আসেনি। কতো চমৎকার সে 'খোদা', যার দাদী-নানীরা এমন পর্যায়ের! আপনি স্মরণ রাখবেন, আমরা আপনার কথা অনুযায়ী 'মর্দে ময়দান' বনেই বই লিখবো এবং আপনাকে দেখাবো একেই বলে কুপ্ররোচনার মূলোৎপাটন। একজন মানুষকে যে খোদা বানায় এমন এক অজ্ঞ ও বিপথগামীকে পরাস্ত করা কি-ই বা একটা কঠিন কাজ! কিন্তু আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমি যে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছি সেগুলোর অবশ্যই উত্তর লিখুন। আর এ চিঠিতে লেখা সেসব শব্দের জন্য নারাজ হবেন না যা সমীচীনভাবে স্থান কাল পাত্র ভেদে যথাযথ প্রযোজ্য এবং আপনার মর্যাদাপোযোগী। যেখানে আপনি অজ্ঞতা সত্ত্বেও 'সৈয়্যদুল মুতাহ্‌হারীন' (পবিত্রদের শিরোমণি) আঁ হযরত (সা.)-

এর প্রতি যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছেন, এই নোংরা মিথ্যারোপের এমনটি জবাব আবশ্যকীয় ছিল যা আপনাকে দেয়া হয়েছে। আমি বহুভাবে চেষ্টা করেছি যেন আপনারা ভাল মানুষ হয়ে যান এবং গালিগালাজ না করেন। কিন্তু আপনারা মানেন না। আপনারা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের হৃদয় ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত করেন। আপনারা জানেন না, আমাদের দৃষ্টিতে সেই অর্বাচিন প্রত্যেক ব্যভিচারীর চেয়ে নিকৃষ্ট, যে মানবীর পেট থেকে বেরিয়ে খোদা হওয়ার দাবী করে। আপনারা যদি হযরত মসীহ্‌র হিতাকাঙ্ক্ষী হতেন, তাহলে আমাদের সাথে পবিত্রতম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ভদ্র ও শালীন আচরণ বজায় রাখতেন। একটি সহী (প্রামাণ্য) হাদীসে এসেছে, তোমরা তোমাদের পিতাকে গালি দিয়ো না। লোকেরা নিবেদন করলো, "পিতাকে কেউ কি গালি দেয়?' তিনি (সা.) বল্লেন, 'হ্যাঁ, দেয়। তুমি যখন কারো পিতাকে গালি দেবে তখন সে অবশ্যই তোমার পিতাকেও গালি দেবে। সেক্ষেত্রে এ গালি সে দেয় নি, বরং তুমিই দিলে।" তেমনিভাবে আপনারা জানেন, আপনাদের মিথ্যে খোদারও ভালোভাবেই শ্রাদ্ধ করা হবে। এখন আমরা এ চিঠি নোটিশ হিসেবে আপনাদের পাঠাচ্ছি আপনারা আবার যদি এ ধরনের অশ্লীল-অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করেন এবং আঁ হযরত (স:)-এর প্রতি নোংরা অপবাদ আরোপ করেন, তাহলে আমরাও আপনাদের কল্পিত ও জাল খোদার সেই খবর নেবো যার দরুন তার সমস্ত খোদায়ী লাঞ্ছনার পচা আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হবে।

হে নালায়েক! তুমি কি তোমার চিঠিতে নবীদের নেতা (সা.)-এর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ কর এবং তাঁকে বদকার ও পাপাচারী আখ্যা দাও? আর আমাদের হৃদয়কে ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত কর! আমরা (এর জন্য) কোন আদালতে আপীল করি না এবং করবোও না। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বুঝাতে চাই যেন এ ধরনের নোংরা কার্যকলাপ থেকে বিরত হও এবং খোদাকে ভয় কর যাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে। আর হযরত মসীহ্‌কেও গালমন্দ দিও না। (কেননা) তোমরা পরম পবিত্র মহানবী (সা.) সম্পর্কে যেসব কটুকথা বলবে, তোমাদের কল্পিত মসীহ্‌র সম্পর্কে তা-ই বলা হবে। কিন্তু আমরা সেই সত্য মসীহকে পাক-পবিত্র ও সম্মানিত বলে জানি এবং মানি, যিনি খোদা হবার দাবী করেননি এবং খোদার পুত্র হবার দাবীও করেন নি। আর তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদ দেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। ইতি।*

* নূরুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪, ৩৯৫

# পত্র নম্বর ১০
# পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্র দ্বিতীয় পত্রে বর্ণিত অবশিষ্ট আপত্তিসমূহের উত্তর

একটি আপত্তি হলো, 'আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজের ধর্মবিশ্বাস গোপন করার স্পষ্ট আদেশ কুরআন করীম দিয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিল ঈমানকে গোপন রাখার অনুমতি দেয় না।'

উত্তর : জানা আবশ্যক, সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার যতখানি তাগিদ কুরআন করীমে রয়েছে, ইঞ্জিলে তার শত ভাগের একভাগও আছে বলে আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি না। প্রায় বিশ বছর হয়ে গেলো, এ বিষয়েই আমি একটি ঘোষণাপত্র দিয়েছিলাম। এতে কুরআন করীমের আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে একটি বড় অংকের টাকা পুরস্কার রেখে এ ওয়াদা করেছিলাম, উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সত্যপরায়ণতার প্রতি যে জোরালো তাগিদ রয়েছে, কোন খ্রিষ্টান যদি ওরূপ জোরালো তাগিদ ইঞ্জিল থেকে বের করে দেখাতে পারে তাহলে তাকে উক্ত পরিমাণ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু পাদ্রী সাহেবান আজ অবধি এমনভাবে চুপ হয়ে গেছেন যেন তাদের ভেতর প্রাণ নেই বলে চলে। এখন সুদীর্ঘকাল পর পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্ সাহেব যেন কফিনের ভিতর থেকে কথা বলছেন। যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার দরুন আমাদের সে ঘোষণাপত্রের কথা তার স্মরণ নেই। পাদ্রী সাহেব! আপনারা খর-কুটাকে স্বর্ণ বানিয়ে দিতে চান। অথচ স্বর্ণের খনি থেকে মুখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক ভেগে যান। এটি দুর্ভাগ্য নয় তো আর কী? কুরআন শরীফ মিথ্যাবাদীতাকে প্রতিমা পূজার সমান বলে আখ্যা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

**"ফাজ্তানিবুর রিজসাম মিনাল আওসা-নি ওয়াজতানিবূ কওলায্ যূর।'** অর্থাৎ প্রতিমার পংকিলতা ও মিথ্যার পংকিলতা থেকে দূরে থাক (সূরা আল হাজ্জ : ৩১)। এরপর আরেক জায়গায় বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ

**"ইয়া আইউহাল্লাযীনা আ-মানূ কূনূ কাওওয়া-মীনা বিল কিসতে শুহাদা-য়া লিল্লাহি ওয়া লাও আলা আনফুসিকুম আওয়েল ওয়া-লিদাইনি ওয়াল আকরাবীন"**– অর্থাৎ

হে ঈমানদারগণ! ন্যায় বিচার ও সত্যবাদীতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তুলে ধর যদিও সেগুলো তোমাদের প্রাণের বিপক্ষে যায় বা তোমাদের মাতাপিতা ও তোমাদের নিকটাত্মীয়দের জন্যে ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয়।' (আন্ নিসা : ১৩৬)

এখন হে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভিক! একটু ইঞ্জিল খুলে আমাদের দেখাও, সত্যপারায়ণতার জন্য এমন তাগিদ ইঞ্জিলে কোথায় আছে? এমন তাগিদই যদি থাকতো তাহলে প্রথম পর্যায়ের হাওয়ারী (শিষ্য) পিটার কেন মিথ্যা কথা বলতেন? আর কেনই বা মিথ্যা কসম খেয়ে এবং হযরত মসীহকে অভিশাপ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করে বলতেন : 'আমি একে জানি না'! আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ শুধু মাত্র সত্যবাদিতার কারণে শহীদ হতে থাকেন এবং আল্লাহ্ সম্পর্কিত সাক্ষ্যকে কখনও গোপন করেন নি, যদিও মরু চরাচর রক্তে লাল হয়ে যায়। কিন্তু ইঞ্জিল থেকে প্রমাণিত হয়, স্বয়ং আপনাদের যিশু সাহেবই সেই সাক্ষ্যকে গোপন রাখেন যা প্রকাশ করা তার জন্য বাধ্যকর ছিল। দেখুন ইঞ্জিল মথি : ১৬ অধ্যায় ২০ শ্লোক। আর তিনি সেই ঈমানের পরিচয়ও দিতে পারেন নাই, যেমনটি মক্কার বিপদসঙ্কুল সময়ে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ দেখিয়েছিলেন। আশা করি, আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। যদি অসততা ও হঠকারিতা দেখিয়ে অস্বীকারও করেন, তাহলে (ইতিহাসের জ্বল-জ্যান্ত) দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী আমরা দেখাবো। আপাতত কেবল নমুনাস্বরূপ প্রমাণের ক্ষেত্রে এটুকুই লিখা হলো।

এরপর আপনি লিখেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অজ্ঞতার দরুণ এটা আপনার মতিভ্রম হয়েছে। প্রকৃত বিষয় হলো, কোন হাদীসেই মিথ্যা বলার অনুমতি নেই। বরং হাদীসে তো এ কথাগুলো রয়েছে: **"ইন কুতিল্‌তা ওয়া উহ্‌রিক্‌তা"** অর্থাৎ 'তোমাকে মেরে ফেলা হলেও এবং পুড়িয়ে ফেলা হলেও তুমি সত্যকে পরিত্যাগ করবে না।' যে অবস্থায় কুরআন বলছে, তোমরা ন্যায় বিচার ও সত্যবাদিতাকে ত্যাগ করবে না, যদিও এতে তোমাদের প্রাণ যায়। তেমনি হাদীসও বলছে, 'যদিও তোমাদের পুড়িয়ে ফেলা এবং মেরে ফেলা হয় তবুও সত্য কথাই বলবে।' এরপর ধরুন, কোন হাদীস যদি কুরআন এবং প্রমাণ্য হাদীসাবলীর প্রতিকূল হয়, তাহলে সেটি শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণোপোযোগী হবে না। কেননা আমরা সেই হাদীসকেই গ্রহণ করি যা প্রামাণ্য হাদীসাবলী এবং কুরআন করীমের প্রতিকূল না হয়। তবে কতিপয় হাদীসে 'তওরিয়া'-এর বৈধতার দিকে ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। আর এটাকেই ঘৃণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে 'কিয্‌ব' (মিথ্যা)

বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর কোন অজ্ঞ আহাম্মক যদি এমন শব্দ কোন হাদীসে অবজ্ঞামূলক ত্রুটিবশত লিপিবদ্ধ দেখতে পায়, তাহলে যথাসম্ভব সে এটাকে প্রকৃত 'কিয্‌ব' (মিথ্যা) অর্থেই মনে করবে। কেননা সে এই অকাট্য ফয়সালা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ যে প্রকৃত 'কিয্‌ব' (মিথ্যা) ইসলামে পঙ্কিল বিষয় ও নিষিদ্ধ এবং শিরকের সমতুল্য। কিন্তু 'তওরিয়া' যা প্রকৃত 'কিয্‌ব' (মিথ্যা) অর্থে নয় যদিও মিথ্যার আকারেই বাধ্যতামূলক সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য এর বৈধতা হাদীসে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখা আছে, সেই সব লোকই শ্রেষ্ঠ, যাঁরা 'তওরিয়া' থেকেও দূরে থাকেন।

বস্তুত ইসলামী পরিভাষায় 'তওরিয়া' হলো, ফেৎনার ভয়ে কোন একটি কথাকে লুকাবার জন্য অথবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে কোন গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখার লক্ষ্যে এমন দৃষ্টান্ত দিয়ে ও বাচনভঙ্গীতে সেটি বর্ণনা করা যে বুদ্ধিমান মাত্র সে বিষয়টি বুঝে যায় এবং অজ্ঞের বোধগম্য হয় না, অন্যদিকে তার মনোযোগ চলে যায় যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। আর চিন্তাভাবনার পর জানা যায়, বক্তা যা বলেছে তা মিথ্যা নয়, বরং নির্ঘাত সত্য। আর এতে যেন মিথ্যার এতটুকুও মিশ্রণ না ঘটে থাকে এবং অন্তরও মিথ্যার দিকে একটুও না ঝুঁকে থাকে। যেমন, কতিপয় হাদীসে দু'জন মুসলমানের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করানোর উদ্দেশ্যে অথবা নিজের স্ত্রীকে কোন ফেৎনা (পরীক্ষা), পারিবারিক অসন্তোষ ও কলহ-বিবাদ থেকে রক্ষা করতে অথবা যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থাবলী শত্রুর থেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তওরিয়ার বৈধতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও এমন অন্যান্য হাদীসও রয়েছে যেগুলোতে জানা যায় তওরিয়া উচ্চ পর্যায়ের তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী এবং সুস্পষ্ট সত্য কথা বলাই শ্রেয়, যদিও এর কারণে মেরে ফেলা হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু আফসোস, এই তওরিয়া আপনার যিশু সাহেবের বক্তব্যে খুব বেশি রকমই দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত ইঞ্জিল এ দিয়ে ভরপুর রয়েছে। কাজেই আমাদের মানতে হয়, তওরিয়া যদি মিথ্যাই হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়াতে যিশুর চেয়ে অধিক অন্য কোন মিথ্যাবাদী হয় নি। যেমন যিশু সাহেবের এ উক্তিটি : আমি খোদার হাইকেলকে (হযরত সুলেয়মান নির্মিত উপাসনালয়) বিধ্বস্ত করতে পারি এবং তিন দিনে একে বানাতেও পারি'–এমনতর উক্তিকেই তওরিয়া বলা হয়। আর তেমনি তিনি বলেছেন : 'একটি ঘরের মালিক ছিলেন, যিনি আঙ্গুর বাগান লাগিয়েছিলেন' এসবই তওরিয়ার প্রকারভেদ। যিশু সাহেবের কথায় এর বহুবিধ নমুনা রয়েছে। কেননা তিনি সব সময় টিপে টিপে কথা বলতেন এবং তাঁর কথার মধ্যে দ্বৈততা দেখা যেত।

পক্ষান্তরে আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার এ ক্ষেত্রে এক অতি উঁচু মানের দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হয়। তা এই যে, আপনাদের যিশু যে তওরিয়াকে আজীবন মাতৃদুগ্ধের ন্যায় ব্যবহার করতে থাকেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যথাসাধ্য তা থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছেন। যাতে করে কথার মর্মার্থ তার বাহ্যিক আকারে 'কিয্‌ব' তথা মিথ্যার সদৃশ হতে না পারে। কিন্তু কি বলবো আর কি বা লিখবো, আপনাদের যিশু সাহেব এহেন সত্যবাদিতার মান আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেন নি। খোদা হওয়ার দাবীদার ব্যক্তির তো সিংহের ন্যায় এ দুনিয়াতে আগমন করা উচিত ছিল। তা না করে আজীবন তওরিয়া অবলম্বন করে এবং সব কথা মিথ্যার রঙে রঙিণ করে বলার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে তিনি ওই সকল পূর্ণ মানবের অন্তর্ভুক্ত নন যারা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে শত্রুর মোকাবেলায় নিজেদের মেলে ধরেন এবং খোদা তাআলার ওপর পূর্ণভরসা করে থাকেন, আর কোন ক্ষেত্রেই কাপুরুষতা দেখান না। আমার তো যিশুর সেসব কথা স্মরণ করে কান্না পায়। কেউ যদি এমন দুর্বল চিত্ত যিশুর উল্লেখিত দুর্বল অবস্থা ও মিথ্যাবৎ তওরিয়ার ওপর আপত্তি তোলে তাহলে আমরা এর কী উত্তর দেবো! আমি যখন দেখি মহামান্বিত, নবীদের সেরা ও শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হুনায়নের যুদ্ধে একাকী অবস্থায় অগণিত খোলা তলোয়ারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছিলেন : 'আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি আল্লাহ্‌র নবী; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।' অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি আপনাদের যিশু কাঁপতে কাঁপতে তাঁর শিষ্যদের ঘটনা বিরোধী শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ 'কাউকেও বলো না যে আমি যিশু মসীহ্।' অথচ তা বলায় কেউ তাঁকে হত্যা করে না। তখন আমি আক্ষেপের অতল গহ্বরে ডুবে যাই এই ভেবে, ইয়া ইলাহী! এ ব্যক্তিও নবী বলেই অভিহিত হয়, খোদার পথে যার সাহসিকতার এই অবস্থা!

মোট কথা, (পাদ্রী) ফতেহ্ মসীহ্ নিজ অজ্ঞতার খুব পর্দা উন্মোচন করলেন। বরং তওরিয়ার বৈধতার উল্লেখ সম্বলিত কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করে নিজ মসীহ্‌র উপরও আঘাত হানলেন। কোন হাদীসে উপেক্ষামূলক ভ্রমবশত তওরিয়া'কে 'কিয্‌ব' (মিথ্যা) শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলেও এটাকে কোন ব্যক্তি প্রকৃত মিথ্যা অর্থে নির্ধারণ করলে তা হবে সে ব্যক্তির চরম অজ্ঞতা। যেখানে পবিত্র কুরআন ও প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সর্বসম্মতভাবে প্রকৃত 'কিয্‌ব' তথা মিথ্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ও পঙ্কিলতা বলে আখ্যা দেয়। আর সেই সাথে উচ্চস্তরের হাদীসসমূহ যখন তওরিয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করছে তখন কোন হাদীসে 'তওরিয়া'র পরিবর্তে 'কিয্‌ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিলেও

এর অর্থ নাউযুবিল্লাহ্ 'প্রকৃত মিথ্যা' কী করে হতে পারে? বরং এর পক্ষপাতী ব্যক্তি যে কিনা 'তওরিয়া'কে কিয্বেরই একটি আকার ভেবে উপেক্ষামূলক ভ্রমবশত 'কিয্ব' শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকে অতি সূক্ষ্ম তাক্ওয়ার পরিচয় হিসেবে মানতে হবে, আমাদের পক্ষে কুরআন ও প্রমাণ্য হাদীসসমূহের অনুসরণ করা আবশ্যকীয়। কোন বিষয় এর প্রতিকূল হলে আমরা এর প্রতিকূল অর্থকে কখনও গ্রহণ করবো না। আহাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রে এমন সব হাদীসে ভরসা না করাই জরুরী, যা সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণ্য আহাদীসের বিপরীত অর্থ বহণ করে। তেমনি সে সব হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় যা কুরআন করীমের 'মুহকাম' তথা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ভাষ্যসমূহের প্রকাশ্যভাবে প্রতিকূল ও বিপরীত এবং বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এরপর যে বিষয়টিতে কুরআন ও সহী আহাদীস ঐক্যমত পোষণ করেছে এবং দ্বীন ইসলামের স্বীকৃত সব গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে যার উল্লেখ রয়েছে তার প্রতিকূল কোন অহেতুক কথা বা কোন সন্দেহবিদ্ধ ও অপ্রমাণ্য হাদীস অথবা সন্দেহজনক সনদে পাওয়া (সাহাবা কিরামের) পরবর্তী যুগের কোন উক্তিকে কেন্দ্র করে আপত্তি উত্থাপন করা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুষ্কৃতি ও দুষ্টামির কাজ বৈ কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টানদেরকে এ জাতীয় দুষ্কৃতি ও দুষ্টামিই ধ্বংস করেছে। এই লোকদের নিজে নিজেই হাদীস দেখার কোন যোগ্যতাই নেই। বড় জোর মিশকাতের অনুবাদ থেকে এরা যে কথাটির ওপর নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে দোষারোপ করতে পারে সে কথাটি তারা নিয়ে নেয়। অথচ হাদীসগ্রন্থাবলীতে পক্ক-অপক্ক সব কিছুই থাকে, আর তাই হাদীস অনুসরণকারীর পক্ষে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সব রকমের হাদীসাবলীর মধ্যে থেকে প্রামাণ্য ও সহী হাদীসসমূহের অনুসন্ধান ও বাছাই করা, এরপর সেগুলোর সঠিক অর্থ জানা, এরপর আবার সে অর্থের সঠিক প্রয়োগস্থল তালাশ করা –(সব মিলিয়ে) এটি অত্যন্ত এক নাজুক কাজ বটে।

কুরআন করীম মিথ্যেবাদীদের অভিসম্পাত করেছে এবং বলছে 'মিথ্যেবাদীরা শয়তানের সাথে সহাবস্থানকারী হয়ে থাকে, মিথ্যেবাদীরা বেঈমান এবং মিথ্যেবাদীদের ওপর শয়তানরা অবতীর্ণ হয়ে থাকে।' শুধু এটুকুই বলে নাই যে 'তোমরা মিথ্যা বলবে না' বরং কুরআন এ-ও বলেছে, 'তোমরা মিথ্যেবাদীদের সাহচর্যও পরিহার করো। তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না। খোদা তাআলাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে।' এবার বলুন, এসব শিক্ষা থাকলে খ্রিষ্টানদের মাঝে 'এপ্রিল ফুল'-এর মত নোংরা প্রথাগুলো এখন পর্যন্ত কেন প্রচলিত থাকলো? লক্ষ্য করুন, এপ্রিল ফুল কত খারাপ একটা প্রথা, অযথা মিথ্যা বলাকে এতে কৃষ্টি ও সভ্যতার বিষয় বলে মনে করা হয়! এ হলো খ্রিষ্টান সভ্যতা এবং

ইঞ্জিলীয় শিক্ষা। প্রতীয়মান হয়, খ্রিষ্টান লোকজন মিথ্যাকে খুবই ভালোবাসেন। সুতরাং কার্যত তাদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন তো মুসলমানদের হাতে মাত্র একটি-ই। কিন্তু শুনা যায়, ইঞ্জিলের সংখ্যা ষাটকে ছাড়িয়ে গেছে। শাবাশ! হে পাদ্রী সাহেবান! মিথ্যার চর্চা একেই বলে। যথাসম্ভব আপনি (আপনাদেরই) একজন বুযুর্গের বচন (বাণী) শুনেছেন : "মিথ্যা বলা কেবল বৈধই নয়, বরং সওয়াব ও পুণ্যও বটে।" ন্যায় বিচার যা সত্যবাদীতায় পূর্ণ পদক্ষেপ ছাড়া লাভ করা যায় না এর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۟ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۫

**"লা ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম শানায়া-নু কওমিন আলা আন্‌লা তা'দিলূ ই'দিলু হুয়া আকরাবু লিত্‌তাকওয়া"** (আল মায়েদা : ৯) অর্থাৎ দুশমন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে বাধার কারণ না হয়। ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাক–এতেই তাকওয়া নিহিত।'

এখন আপনি জানেন, যে-সব জাতি নির্যাতন করে, দুঃখ-কষ্ট দেয়, রক্তপাত করে ও পিছু ধাওয়া করে এবং শিশু ও নারীদের হত্যা করে, যেমন কিনা মক্কাবাসী কাফিররা করেছিল, এরপর যুদ্ধ বিগ্রহ থেকেও নিবৃত্ত হয় না এরূপ লোকদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারাদিতে ন্যায়বিচার সম্মত আচরণ করা কত কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআনের শিক্ষা এ রকম প্রাণ হননকারী শত্রুদেরও প্রাপ্য সব অধিকারকে নষ্ট হতে দেয়নি, বরং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার জন্য তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছে। কিন্তু আপনি তো কুসংস্কার ও বিদ্বেষের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছেন, এসব পবিত্র কথা কী করে-ই বা অনুধাবন করবেন?! ইঞ্জিলে যদিও লিখা আছে, 'নিজের শত্রুকেও ভালোবাস।' কিন্তু এটা লিখা নেই যে দুশমন জাতির শত্রুতা এবং জুলুম-অত্যাচার যেন তোমাদেরকে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় বাধার কারণ না হয়। আমি সত্য সত্য বলছি, শত্রুর সাথে সৌজন্যমূলক সদ্ব্যবহার করা সহজ কিন্তু শত্রুর প্রাপ্য অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা এবং মামলা-মোকদ্দমাগুলোতে ন্যায় বিচার ও সততাকে হাত ছাড়া হতে না দেয়া–এটা অত্যন্ত কঠিন এবং কেবল সৎসাহসী লোকদেরই কাজ। অধিকাংশ লোক নিজেদের শরিকী শত্রুদের ভালোবাসেন এবং মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে আন্তরিকতা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার হরণ করেন। এক ভাই অপর ভাইকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসার আড়ালে প্রতারণার মাধ্যমে হক-অধিকার হরণও করে নেয়। যেমন, সে যদি জমির মালিক হয়ে থাকে, ছল চাতুরি করে জমিজমা সংক্রান্ত কাগজ পত্রে সে তার ভাই-এর

নাম দেখায় না। আর বাহ্যত এতো ভালোবাসা দেখায় যেন তার প্রতি উৎসর্গ হয়ে যাচ্ছে। অতএব খোদা তাআলা উক্ত আয়াতে ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেন নি বরং ভালোবাসার মানদন্ডের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি তার প্রাণের শত্রুর প্রতি ন্যায়বিচার করে থাকে এবং সততা ও ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করে না সে-ই প্রকৃতভাবে ভালোও বাসে। কিন্তু এ শিক্ষার কথা আপনার খোদা যিশুর মনে ছিল না, যাতে অত্যাচারকারী শত্রুর প্রতি ন্যায়বিচার করার বিষয়ে সেভাবে গুরুত্বারোপ করতেন এবং শত্রুর প্রতি সত্যিকার সদ্ব্যবহার করার এবং সত্যপরায়ণতাকে আকড়ে ধরার জন্য তাগিদ করতেন, যেমন কুরআন করেছে। আর তাক্ওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহ শিখাতেন যেমন কুরআন শিখিয়েছে। কিন্তু আফসোস, যা শিখিয়েছেন তা কেবল প্রতারণার কথা শিখিয়েছেন। পরহেজগারির সোজা পথে পরিচালিত করতে পারলেন না। এ কথাগুলো আমরা আপনার কল্পিত যিশুর সম্পর্কে বলছি, যার গুটি কয়েক বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণা সম্বলিত পাতা আপনাদের হাতে রয়েছে। আপনাদের সেই খোদার কথা বলছি যিনি খোদা হওয়ার দাবী করতে করতে পরিশেষে ক্রুশবিদ্ধ হলেন। কিন্তু তার আগে সারা রাত কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন যাতে কোন উপায়ে ক্রুশ থেকে রক্ষা পেয়ে যান, কিন্তু রক্ষা পেলেন না! শেষ রক্ষা হলো না!

আমাদের সৈয়দ ও মাওলা নবী আখেরুয্ যামান দুনিয়া থেকে বিদায় মুহূর্তে দোয়া করেন : **'আলহিক্নি বিররাফি-কিল আ'লা'** [–'সর্বোচ্চ বন্ধুর সান্নিধ্যে' বোখারী] কিন্তু আপনাদের খোদা (যিশু) সাহেব দুনিয়ার ক'দিনের জীবনকে এতো ভালোবাসেন যে জীবিত থাকার জন্য সারারাত দোয়া করতে থাকেন বরং ক্রুশকাষ্ঠেও সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না। বেরুলো তো কেবল এ কথাই বেরুলো : 'এলি এলি লিমা সাবাকতানি'– হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করলে? মথি : অধ্যায় ১৭, শ্লোক ৪৬ দ্রষ্টব্য। আর খোদা কেন পরিত্যাগ করলেন এর কোন উত্তর দিলেন না। তবে কথা তো পরিষ্কার–খোদা হওয়ার দাবী করেছেন, অহংকার করেছেন তাই পরিত্যক্ত হয়েছেন!

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খোদা তাআলা অন্তিম সময়ে এক্তিয়ার দিলেন, চাইলে দুনিয়াতে আরও অবস্থান করুন, আর চাইলে আমার কাছে চলে আসুন।' তিনি (সা.) নিবেদন করলেন, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এখন আমি আপনার সান্নিধ্যেই আসতে চাই।' তাঁর শেষ মুহূর্তের উক্তি যা বলতে বলতে তাঁর পুত পবিত্র আত্মা অন্তর্ধান করলো তা ছিল : **"বিররাফীকিল আ'লা"**।

অর্থাৎ এখন আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি আমার আল্লাহ্‌র কাছে যেতে চাই।' এখন বাক্য দু'টি ওজন করুন, আপনার খোদা সাহেব জীবিত থাকার জন্য কেবল সারারাত দোয়া করেন নি বরং ক্রুশকাষ্ঠেও তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করে কেঁদেছেন। কিন্তু কে শোনে? কিন্তু আমাদের মওলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকার জন্য কখনও দোয়া করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাকে ইক্‌তিয়ার দিয়েছিলেন, 'জীবিত থাকার জন্য আকাঙ্খা থাকলে তা-ই পাবে।' কিন্তু তিনি বল্লেন, 'এখন আমি দুনিয়াতে আর থাকতে চাই না।' কী! এই খোদা! যার ওপর ভরসা? ডুবে যাও!!

আর আপনার এই দাবী যে কুরআন কিনা নিজের ধর্ম গোপন করতে মানুষকে আদেশ দেয়–এটা নিছক বানানো মিথ্যা এবং অপবাদ বৈ কিছু নয়। এর কোন ভিত্তি নেই। যারা দীনের সাক্ষ্যকে ইচ্ছা করে লুকায় এবং যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের কুরআন অভিসম্পাত করে।[২৬] সম্ভবত আপনি কুরআন করীমের সূরা নাহলের এ আয়াতটির বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ধোকা খেয়েছেন, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

**"ইল্লা মান উক্‌রিহা ওয়া কালবুহু মুতমায়িন্নুম বিল ঈমা-ন"** (আন্ নাহল নং ১০৭) অর্থাৎ অস্বীকারকারীদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। তবে তার কথা ভিন্ন যাকে জোর পূর্বক বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ ঈমানের প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি পালনে কোন সাধ্যাতীত অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে যাকে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে, সে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য অজুহাতের অধিকারী। এ আয়াতটির মর্মার্থ হলো কোন যালেম যদি কোন মুসলমানকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং সাধ্যাতীত অসহনীয় আঘাতে জর্জরিত করে আর সেই কঠিন নির্যাতন ও শাস্তি চলাকালে সে এমন কিছু কথা বলে ফেলে যা সেই অত্যাচারকারী কাফেরের দৃষ্টিতে কুফরী বাক্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সে নিজে কুফরী কথাগুলোর নিয়্যত করেনি (-মনের সংকল্প থেকে ইচ্ছা করে বলে নি)। বরং তার হৃদয় ঈমানে ভরপুর থাকে। আর নিয়্যত শুধু এই হয় যে সেই অসহনীয় কঠোর নির্যাতনের কারণে সে তার দ্বীন ও বিশ্বাসকে লুকায়, কিন্তু তা সে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে করে না। বরং সাধ্যাতীত আযাব ও অত্যাচার চলাকালে জ্ঞানশুন্য ও উন্মাদ প্রায় হয়ে যায়। আয়াতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তার তওবার সময় খোদা তাআলা তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি গফুর ও রাহীম। সে শর্তগুলো হচ্ছে :

২৬. "লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযেবীন" কুরআন শরীফে আছে? –না কি ইঞ্জিলে? উত্তর তো দিন।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

**"সুম্মা ইন্না রাব্বাকা লিল্লাযীনা হা-জারু মিন বা'দিমা ফুতিনু সুম্মা জা-হাদু ওয়া সাবারু ইন্না রাব্বাকা মিন বা'দিহা লাগাফুরুর রাহীম"**–(সূরা নাহল : ১১১)। অর্থাৎ যারা সাধ্যাতীত কঠিন দুঃখ-কষ্টের অবস্থায় নিজেদের দ্বীন-ইসলামকে গোপন করে তাদের গোনাহ্ এ শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা করা হবে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর তারা হিজরত করবে অর্থাৎ এ রকম স্বভাব থেকে বা এমন দেশ থেকে বের হয়ে যাবে যেখানে ধর্মীয় বল প্রয়োগ করা হয়। এরপর তারা খোদার পথে অত্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে–এসব কিছুর পর খোদা তাআলা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

অতএব এ আয়াত থেকে জানা গেল : যে ব্যক্তি শত্রু পক্ষ থেকে দেয়া কোন সাধ্যাতীত কঠিন দুঃখ-কষ্টের সময় দ্বীন-ইসলামের সাক্ষ্যকে গোপন করে সে-ও খোদা তাআলার দৃষ্টিতে গুনাহগার। কিন্তু (নির্দেশকৃত) পছন্দনীয় খিদমতগুলো পালনের পর এবং এ ধরনের স্বভাব অথবা যেখানে ধর্মীয় বলপ্রয়োগ করা হয় এমন দেশ ত্যাগ করার পর এবং ধৈর্যধারণ ও অবিচল দৃঢ়তা দেখানোর পর তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। খোদা তাআলা তাকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। কেননা তিনি রহমান ও রহীম।

মোদ্দা কথা, খোদা তাআলা এই গোপন করার বিষয়টিকে প্রশংসার স্থল হিসেবে গণ্য করেননি। বরং একে একটি গুনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর এ গুনাহ্র কাফ্ফারা (তথা প্রতিকার ব্যবস্থা) পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আর আমরা যেমন লিখে এসেছি, বহু স্থানে সেইসব মু'মিনের প্রশংসা করা হয়েছে যারা প্রাণের বিনিময়েও দীনের সাক্ষ্যকে গোপন করে না। তবে এরূপ ব্যক্তিকেও বর্জন করে দিতে চায় নাই যে তার দুর্বলচিত্ততা এবং সাধ্যাতীত কঠিন শাস্তি (মূলক) অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে দুঃখ-কষ্টের শিকার হওয়া অবস্থায় দ্বীনের সাক্ষ্যকে গোপন করে। বরং তাকে এ শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করে নিয়েছেন যে সে এমন স্বভাব ও অভ্যাস বা এমন দেশ থেকে সরে যায় যেখানে (ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ ক'রে) জোর জবরদস্তি করা হয়। এরপর নিজের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা এবং চেষ্টা-সাধনা দিয়ে নিজ প্রভু-প্রতিপালককে রাযি করে। তখন এই দীন গোপন করার

গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেননা যে খোদা দুর্বল-অক্ষম বান্দাদেরকে পয়দা করেছেন তিনি অতি মহানুভব ও বার বার কৃপাকারী খোদা। তিনি কারও স্বল্প সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারকেও তাঁর দরবার থেকে ফিরিয়ে দেন না।

এ তো হলো কুরআনের দেয়া শিক্ষা, যা খোদা তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের গুণাবলীর সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু আপনার স্বীকৃতি থেকে জানা গেল, ইঞ্জিলের এ শিক্ষা নয়। ইঞ্জিল অনুযায়ী ফতোয়া হলো, কোন খ্রিষ্টান সাধ্যাতীত অত্যাচার ও দুঃখ কষ্টের সময় খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করলে সে চিরতরে বিতাড়িত হয়ে যায়। এরপর ইঞ্জিল তাকে নিজ জামাত বা মন্ডলীতে স্থান দিবে না এবং তার জন্য তওবার কোন সুযোগ নেই। সাবাস! আজ আপনি নিজ হাতে সেই ইঞ্জিলের মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ার ওপর মোহর লাগালেন যা আপনাদের হাতে রয়েছে। ভালো কথা! এখন আমাদের আঘাত থেকেও রেহাই পাবেন না। নিম্নে বর্ণিত আমার বক্তব্যের জবাব দিন। অন্যথায়, এতটুকুও লজ্জা থাকলে খ্রিষ্টধর্ম থেকে তওবা করুন।

প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার কথা অনুযায়ী সেই শিক্ষা যখন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হতে পারে না, যা ঈমান গোপনকারীকে তার তৌবা, সৎকর্ম, ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখানোর পর ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে ফিরিয়ে দেয় না, তখন ইঞ্জিলের শিক্ষা কে জানে সত্য থেকে কত দূরে পরাহত হবে! যা পিটারকে তার অতি ঘৃণ্য কুকর্ম, মিথ্যাচার, কঠিন অস্বীকার, মিথ্যা কসম ও হযরত মসীহকে অভিশাপ দেওয়া এবং ঈমানকে গোপন করা সত্ত্বেও গ্রহণ ও বরণ করে নিল!![২৭] আপনার আপত্তিতো এতটুকুই ছিল যে কুরআন এমন লোকদেরও ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয় না যারা কোন ভয়-ভীতির দরুন ইসলামকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করে। কিন্তু ইঞ্জিল তো এ ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে এমন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে নিয়েছে যে শুধু ঈমান গোপনই করে নি বরং প্রকাশ্যভাবে অস্বীকারও করেছে এবং নিজের মিথ্যাকে সত্য সাব্যস্ত করার জন্য কসমও খেয়েছে বরং যিশুকে অভিসম্পাতও করেছে। যদি বলেন, ইঞ্জিলের শিক্ষা তাকে গ্রহণ করেনি, বরং সে (পিটার) এখনও রদকৃত এবং ঈমান বিবর্জিত রয়েছে তাহলে এ অভিমত সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র ছেপে দিন। এখন বলুন, কুরআন করীমের বিরুদ্ধে আপত্তি করায় কিছু শাস্তি পেয়েছেন কি না?

২৭. ঈমানের সাক্ষ্যকে গোপন করা ও হৃদয়ে স্থান দেওয়া দূরে থাক খ্রিষ্টানরা তো ইঞ্জিলের ধর্মত্যাগীদেরকেও তাদের আবার ঈমান আনার পর ফেরৎ নিয়ে নেয়।

আপনি আপনার চিঠিতে লিখেছেন : কোন বিষয়ে জবাব দেয়া এক কথা। কিন্তু অযৌক্তিক ভাবে জবাব দেয়াই ভিন্ন বিষয়। এখন বলুন এসব বিষয় যৌক্তিকভাবে জবাব কি, না এবং এখনও আমাদের পক্ষ থেকে 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কা-যেবীন' (–মিথ্যাবদীদের ওপর লা'নত বর্ষিত হোক) বলার সময় এসেছে কিনা?

আপনি আপনার চিঠিতে এ-ও লিখেছেন, 'মুহাম্মদী লোকেরা' (অর্থাৎ মুসলমানরা) জওয়াব তো দেয় কিন্তু যুক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতে সেগুলো উত্তর বলে বিবেচিত হয় না। এখন আমাদের এসব উত্তর আপনাদের সামনে রয়েছে এগুলো কয়েকজন সুবিচারককে দেখান, এগুলো বিবেকবুদ্ধির নিরিখে জওয়াব কি, না? আপনি কি আশা রাখেন যে–সব আপত্তি ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে আমরা উপস্থাপন করছি, আপনি এগুলোর উত্তর দিতে পারবেন? কখনও সম্ভব নয়। আপনার জন্য সে দিনটি কখনও আসবে না যাতে এসব আপত্তির উত্তর দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারেন।

**এরপর আপনার একটি কুপ্ররোচনা** এই যে গুনাহ্র পূর্ণ বর্ণনা কেবল ইঞ্জিলেই রয়েছে। কিন্তু আপনি চিন্তা করলে জানতে পারবেন, ইঞ্জিল তাকওয়ার পথগুলো পুরোপুরিভাবে ব্যক্ত করতে পারে নি এবং ইঞ্জিল বস্তুত এ দাবীও করে নি। কিন্তু কুরআন করীম তার অবতীর্ণ হবার মোক্ষম উদ্দেশ্য তাক্ওয়ার পথসমূহ শিক্ষা দেওয়া বলেই নির্ধারণ করেছে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

**'যা-লিকাল কিতা-বু লা রাইবা ফীহে হুদাল্ লিলমুত্তাকীন'** (বাকারা : ৩) অর্থাৎ এ কিতাব এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে যেন গোনাহ্ থেকে পরহেজকারীদেরকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোনাহ্ সম্বন্ধে অবহিত করা হয়, যাতে তারা সেই সব খারাপ কাজকেও পরিহার করে যা প্রত্যেক চোখ দেখতে পায় না বরং কেবল সূক্ষ্মতত্ত্বোপলব্ধির 'অনুবিক্ষণ যন্ত্রে'র মাধ্যমেই দেখা যেতে পারে এবং মোটা দৃষ্টি সেগুলো দেখতে ভুল করে বসে। যেমন, আপনার যিশু সাহেবের উক্তি মথির ইঞ্জিলে লিখা আছে : 'আমি তোমাদের বলছি, যে-কেউ কামলোলুপ দৃষ্টিতে কোন নারীর দিকে তাকায় সে তার অন্তরে তার সাথে তখনই বেভিচার করে থাকে।' কিন্তু কুরআন করীমের শিক্ষা হলো, ললুপ-অললুপ কোন দৃষ্টিতেই তুমি অচেনা নারীর মুখের দিকে কখনও তাকাবে না এবং তাদের কণ্ঠস্বর ও কথাবার্তাও শুনবে না আর তাদের রূপের কিসসাও শুনবে না। কেননা এ সব বিষয় থেকে পরহেজ করা তোমাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে। যেমন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ

**"কুললিল মু'মিনীন ইয়াগুয্যু মিন আবসা-রিহিম ওয়া ইয়াহ্ফাযু ফুরূজাহুম যা-লিকা আয্কা লাহুম'** (আননূর : ৩১) অর্থাৎ মু'মিনদের বলে দাও, 'না-মাহ্রাম' (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ–অনুবাদক) নারীদের দেখায় তারা যেন নিজেদের চোখ বন্ধ রাখে এবং নিজেদের কান ও লজ্জাস্থানগুলোও সংরক্ষণ করে অর্থাৎ কানকেও তাদের নরম কথা এবং তাদের রূপের বর্ণনা শুনা থেকে রক্ষা করে। কেননা এসবই পদস্খলনের পথ। এখন নিজ অন্তরে যদি বেঈমানীর গরল না থেকে থাকে তা হলে এ রকম শিক্ষার সাথে যিশুর শিক্ষার তুলনা করুন। এরপর ফলাফলের দিকেও দৃষ্টি দিন। যিশুর শিক্ষা বাধাহীন স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে এবং জরুরী সব শর্ত উপেক্ষা করে সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিশেষে এদের সবার ভেতর শুকর ও কুকুরের ন্যায় দুষ্কর্ম ও দুশ্চরিত্রতা ছড়িয়েছে। এ নির্লজ্জতা এত দূর বৃদ্ধি পেয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বিলাতের মিষ্টি জাতীয় খাবারের ওপর লেখা হয় : 'হে আমার প্রিয় আমাকে চুমু দাও।' এসব গোনাহ্র দায় কার ঘাড়ে? নিঃসন্দেহে যিশুর ঘাড়ে যিনি এ শিক্ষা দিয়েছেন যে যৌবনে উত্তীর্ণ পুরুষ ও নারী একে অন্যকে দেখুক কিন্তু বেভিচারের উদ্দেশ্যে যেন না তাকায়। হে অর্বাচিন? যে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে 'না-মহরাম' নারীদের তাকিয়ে দেখতে থাকে, পরিশেষে একদিন কুদৃষ্টি দিয়েও দেখবে। কেননা প্রবৃত্তিমূলক আবেগ প্রত্যেকের ভেতরই সক্রিয় রয়েছে এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে বরং সজোরে বলে দিচ্ছে, অচেনা নারীদের দেখায় শুভ পরিণাম হয় না। ইউরোপ যে বেভিচারে ভরে গেছে এর কারণ কী? কারণ তো এটাই যে বেগানা নারীদের নির্দ্বিধায় দেখার অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথমে চোখের কুকর্মগুলো হয়। এরপর আলিঙ্গন একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হলো। এরপর তা উন্নতি করে চুমু খাওয়ার অভ্যাসও ধারণ করলো। পরিশেষে ইউরোপে এমন হয় যে শিক্ষকরা যুবতী ছাত্রীদের নিজের ঘরে এনে চুমোচুমি করে থাকে। কেউ নিষেধ করে না। মিষ্টির জিনিষের ওপর অশ্লীল বাক্য লেখা হয়। ছবিগুলোতে চরম অশ্লীলতার নকশা মেলে ধরা হয়। মহিলারা নিজেরা ছবি ছাপায় যাতে সবাই দেখে তারা কেমন সুন্দর, নাক ও চোখ এমন আর তেমন এবং তাদের প্রেমিকদের উপন্যাস লিখা হয়। আর কুকর্মের এমন যে নদ প্রবাহিত হয় এ থেকে নাক, মুখ, চোখ, কান কোন কিছুকে তারা রক্ষা করতে পারে না। এটাই হলো যিশুর শিক্ষা। আক্ষেপ! এমন ব্যক্তি জগতে না আসলে ভাল হতো, যেন এসব অশ্লীল বিষয়ের স্রোত প্রবাহিত হয়ে না পড়তো। এ ব্যক্তি পুণ্য ও পবিত্রতা এবং তাক্ওয়া (খোদাভীরুতা)-কে হত্যা করেছে এবং অধর্ম ও অসংযমকে সকল দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কারণ হয়েছে।

উপাসনাই হোক বা অন্য কোন সাধনা তাতে খানা-পিনা ও কুদৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাই নেই। বিষের পর বিষ এই যে একটা মিথ্যা প্রায়শ্চিত্তের আশা দেখিয়ে গোনাহ্তে নির্ভিক করে দেয়া হয়েছে। কোন্ বুদ্ধিমান এমনটি বিশ্বাস করবে যে, যায়েদকে জোলাব দেয়া হয়, আর এতে বকরের বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যায়? পাপ প্রকৃতপক্ষে কেবল তখনই দূর হয় যখন পুণ্য এর জায়গা নেয়। এটাই কুরআনের শিক্ষা। কারও আত্মহত্যায় অন্যের কী উপকার?! এটা যে কত অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণা এবং আবহমান কালীন নিয়মের পরিপন্থী, যা আপনার যিশুর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। তিনি নিজে রুটি খাওয়াতে কি তার শিষ্যদের জঠরজ্বালার নিবারণ হতো? কাজেই কী করে আত্মহত্যা অন্যের উপকার করতে পারে? ইঞ্জিলের সমস্ত শিক্ষা এতো নোংরা ও নিরস এবং ত্রুটিপূর্ণ যে এর অক্ষরে অক্ষরে কঠিন আপত্তির উদ্ভব হয়। আর এর রচয়িতার খবরই নাই যে তাকওয়া কিসে বলা হয় এবং গোনাহর সূক্ষ্ম স্তর কী কী। বেচারা বাচ্চাদের মত কথা বলেন। আফসোস! এ মুহূর্তে যিশুর এ সব কথা খোলসমুক্ত করে ভেতরের আসল রূপ দেখাবার মত আমার ফুরসৎ নেই। ইনশাআল্লাহ্ অন্য সময়ে দেখাবো এবং প্রমাণ করবো, এ ব্যক্তি তাক্ওয়ার পথ সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তার শিক্ষা মানব-তরুর কোন শাখাকেই সিঞ্চিত করতে সক্ষম নয়। জানেই না, মানুষকে কী কী শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এই অতিথিশালায় পাঠানো হয়েছে। তার মোটেই জানা নেই, এ যাবতীয় শক্তি নষ্ট করে দেয়া খোদা তাআলার উদ্দেশ্য নয়। বরং এগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ সরল রেখায় পরিচালিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অতএব এমন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাকে কুরআন শরীফের সম্মুখে পেশ করা ভীষণ হটকারিতা, অন্ধত্ব এবং নির্লজ্জতা বই কিছুই নয়।

**আপনার আপত্তি :** পবিত্র মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হলো, **"লা ইলাহা ইল্লল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"** বলায় গোনাহ্ দূর হয়ে যায়। এটা একেবারে সত্য আর এটাই যথার্থ ও বাস্তব ঘটনা, যে ব্যক্তি খোদা তাআলাকে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় ও শরীকবিহীন বলে জানে, এবং ঈমান রাখে যে মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সেই সর্বশক্তিমান এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন তাহলে নিঃসন্দেহে এ কলেমায় প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তার জীবনাবসান হলে সে 'নাজাত' (পরিত্রাণ) লাভ করবে। এ আকাশের নীচে কারও আত্মহত্যায় 'নাজাত' নেই। কখনও তা লাভ হয় না। এমন ধারনাও যে করে তার চেয়ে বদ্ধ পাগল আর কে হবে? কিন্তু খোদা তাআলাকে 'ওয়াহেদ লা-শরীক' মনে করা এবং এমন দয়ালু খেয়াল করা যে তিনি অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে দুনিয়াকে পথ ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তাঁর রসূলকে পাঠান, যাঁর (পবিত্র) নাম

মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম–এ এমন একটি পরম সত্য যে এতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনে আত্মার অন্ধকার দূর হয় এবং কুপ্রবৃত্তির কলুষ দূর হয়ে এর স্থান তৌহীদ (একত্ববাদ) নিয়ে নেয়। পরিশেষে তৌহীদে উজ্জীবিত অবস্থা সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিস্তৃত হয়ে ইহকালেই বেহেশতি জীবন শুরু হয়ে যায়। যেমন আপনারা দেখতে পান, জ্যোতির আগমনে অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'**-এর জ্যোতির্ময় প্রতিচ্ছায়া যখন হৃদয়ে পতিত হয় তখন কুপ্রবৃত্তিমূলক অন্ধকারপূর্ণ আবেগানুভূতি নস্যাৎ হয়ে যায়। গোনাহর মূলতত্ত্ব এছাড়া আর কিছু নয় যে অবাধ্যতার মিশ্রণে প্রবৃত্তিমূলক আবেগগুলোর উন্মত্ত শোর-গোলের দরুন প্রবৃত্তির অনুশাসন মেনে চলার অবস্থায় এক ব্যক্তির নাম গোনাহগার রাখা হয়। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর যে অর্থ আরবী ভাষার আভিধানিক আলোকে জানা যায় তা হলো : **"লা মাত্লুবা লি ওয়ালা মাহবুবা লি ওয়ালা মা'বূদা লি ওয়ালা মুতা-য়া লি ইল্লাল্লাহু'** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন 'মাত্লুব' (কাম্য), কোন 'মাহবুব' (প্রিয়) ও কোন 'মা'বুদ' (উপাস্য) এবং কোন 'মুতায়' (আনুগত্যের উপযোগী) নেই। এতে এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে উক্ত অর্থ গোনাহর মূল তত্ত্বের ও গোনাহর আসল উৎসের একেবারে প্রতিকূল বিধায় যে ব্যক্তি এ আলোকময় অর্থকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তার হৃদয়ে স্থান দেয়, এর প্রতিকূল অর্থ (অবস্থা) আবশ্যকীয়ভাবে তার হৃদয় থেকে তিরোহিত হবে। কেননা পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয় একই জায়গায় একত্র হতে পারে না। অতএব প্রবৃত্তিমূলক আবেগজনিত অন্ধকার যখন দূর হয়ে গেল, তখন (তদস্থলে আগত) সে অবস্থাকেই পবিত্রতা ও প্রকৃত সত্যপরায়ণতা বলা হয়।

কলেমার দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো খোদার প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনয়ন। এর প্রয়োজন হলো, যাতে (তার প্রতি অবতীর্ণ) খোদার পবিত্র বাণীর প্রতিও ঈমান হাসিল হয়। কেননা যে ব্যক্তি স্বীকার করে এবং অঙ্গীকার করে যে সে খোদা তাআলার অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী হতে চায় তার পক্ষে তাঁর আজ্ঞা ও আদেশ-নির্দেশের প্রতি ঈমান আনাও জরুরী হয়ে থাকে। আর আদেশ ও নির্দেশে ঈমান আনয়ন যার মাধ্যমে এসব আদেশ ও নির্দেশ এসেছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। অতএব এ হলো কলেমার মূলতত্ত্ব। আপনার যিশু সাহেবও এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, আর একেই নাজাত বা মুক্তিলাভের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ খোদার প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত যিশুর প্রতিও যেন ঈমান আনা হয়। কিন্তু আপনারা যেহেতু অন্ধ, সেহেতু কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও বিদ্বেষের উত্তেজনাবশত ইঞ্জিলের কথাগুলোও আপনারা দেখতে পান না।

আপনার আপত্তি : ওযু করায় কি করে গোনাহ দূর হতে পারে? হে অজ্ঞ! ঐশী কিতাব সমূহে কেন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না? মানুষ হওয়ার পর আপনি কি আবার জন্তু হয়ে গেলেন? ওযু করা তো কেবল হাত-পা ও মুখ ধোয়া। শরীয়তের উদ্দেশ্য যদি এটুকুই হতো যে, হাত পা ধোয়ায় গোনাহ্ দূর হয়ে যায়, তাহলে এই পবিত্র শরীয়ত ইসলামের প্রতি উদ্ধত এমন সব অপবিত্র জাতিকে (তাদের) হাত, পা আর মুখ ধোয়া অবস্থার সময়ে পবিত্রই জানতো কেননা ওযু করলে গোনাহ্ দূর হয়ে যায়। কিন্তু শরীয়ত আনয়নকারী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তো এটা লক্ষ্য নয়। বরং তাঁর উদ্দেশ্য হলো, খোদা তাআলার ছোট ছোট আদেশও বৃথা যায় না। সেগুলো পালনেও গোনাহ্ দূর হয়। আমি যদি এখন ইল্যামি জওয়াব দেই তাহলে কয়েক খন্ডে পুস্তক লিখে অস্বীকারকারীর মুখে কালিমা লেপন করতে পারি। কিন্তু সময় সংকীর্ণ। এখনও কয়েকটি প্রশ্ন বাকী আছে। আমার এই লেখার উত্তরে কিছু লিখুন। এরপর আপনাদের কিতাবগুলো থেকেই আপনাদের উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি আবার মিথ্যাকে কি করে ঘৃণা করতে লাগলেন? ইঞ্জিলের মিথ্যা কি ভুলে গেলেন? 'যিশু মাথা গোঁজার জায়গা পেতেন না'–এ কথা কি সত্য? 'যিশুর সব কর্মকান্ড যদি লিখা হতো তাহলে জেগতে সেসব বইয়ের সংকুলান সম্ভব হতো না'–ইঞ্জিলের এ কথাটিও কি বাস্তব বিষয়? এখন বলুন, মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের বেশ বৈশিষ্ট রয়েছে, না কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে?

এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে কুরআন করীমে গোনাহকে কখনও হালকা ভাবা হয়নি বরং বার বার জোর দেয়া হয়েছে যে গোনাহর প্রতি সত্যিকারভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করা ছাড়া কারও নাজাত বা মুক্তি নেই। কিন্তু ইঞ্জিল গোনাহ্র প্রতি সত্যিকার ঘৃণার শিক্ষা দেয়নি। ইঞ্জিল কখনও এ বিষয়ে জোর দেয়নি যে গোনাহ্ এক ধ্বংসাত্মক বিষ বিশেষ। এর পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে কোন প্রতিষেধক সৃষ্টি কর। বরং এই প্রক্ষিপ্ত ইঞ্জিল পুণ্য ও সৎকাজের বিনিময় হিসেবে যিশুর আত্মহত্যাকে যথেষ্ট বলে মনে করে নিয়েছে। কিন্তু এটা কী রকম বৃথা ও ভ্রান্ত বিষয় যে প্রকৃত পুণ্য অর্জনের দিকে দৃষ্টি নেই, বরং ইঞ্জিলের শিক্ষা এটাই যে খ্রিষ্টান হয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা কর। 'প্রায়শ্চিত্ত' কোন ত্রুটিযুক্ত উপায় নয়, যাতে কোন সৎ কাজের প্রয়োজন হতে পারে!! এখন লক্ষ্য করুন, এর চেয়ে অধিক দুষ্কর্ম ছড়ানোর উপায় আর অন্য কিছু কি হতে পারে? কুরআন করীম তো বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজেকে পবিত্র না কর ততক্ষণ পর্যন্ত এই পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। আর ইঞ্জিল বলে, সব রকম দুষ্কর্ম কর, তোমার জন্য যিশুর আত্মহত্যাই যথেষ্ট।

এখন বলুন, গোনাহকে কে হাল্কা ভাবলো, কুরআন না ইঞ্জিল? কুরআনের খোদা পাপের জায়গায় পুণ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে নেক-নিষ্পাপ সাব্যস্ত করেন না। কিন্তু ইঞ্জিল নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। প্রায়শ্চিত্তবাদের মাধ্যমে সমস্ত নেকী ও সত্যবাদিতার আদেশ-নির্দেশকে হাল্কা ও হেয়ো করে দিয়েছে, এখন খ্রিষ্টানদের জন্য এ সবের প্রয়োজন নেই। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!!

**আপনার আরেক প্রশ্ন :** ইসলামে বেহেশ্‌ত সম্পর্কিত শিক্ষা নিছক প্রবৃত্তিমূলক তাই একজন খোদাযুক্ত মানুষের পরিতৃপ্তির কারণ হতে পারে না।

**উত্তর :** জানা আবশ্যক, এটা অতি স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকৃত এবং ন্যায় বিচার সম্মত যে মানুষ যেমন দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কোন কাজ করার সময় তা কেবল আত্মার সাহায্যে করে না বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের মাধ্যমে করে থাকে। অনুরূপভাবে পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাবও উভয়ের ওপরই পড়া উচিত অর্থাৎ আত্মা এবং দেহ উভয়কেই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী পরকালীন প্রতিদান থেকে অংশ পাওয়া উচিত। কিন্তু খ্রিষ্টান সাহেবানের ব্যাপারে ভীষণ অবাক লাগে যে শাস্তির ক্ষেত্রে তো এ নীতিটিকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং স্বীকার করেন যে যারা ঈমানভঙ্গ ও অসৎ কর্ম করে খোদাকে নারাজ করে থাকবে তাদের যে শাস্তি দেয়া হবে তা কেবল আত্মা পর্যন্ত সীমিত নয় বরং আত্মা ও দেহ উভয়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং গন্ধকের আগুনে দেহকে জ্বালানো হবে আর সেখানে কাঁদতে ও দাঁত পিশতে হবে। পিপাসায় কাতর হলেও পানি পাবে না। অতএব খ্রিষ্টান সাহেবানকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দেহকে আগুনে কেন জ্বালানো হবে, তখন তারা এর জবাব দেন, 'আরে ভাই! আত্মা ও দেহ উভয়ে মজুরের ন্যায় দুনিয়াতে কাজ করতো। কাজেই উভয়ে যেহেতু মিলিতভাবে তাদের প্রভুর কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই এরা উভয়েই শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হলো।' অতএব হে অন্ধ এবং খোদার কিতাবসমূহে গভীর মনোনিবেশে অবজ্ঞাকারীগণ! তোমাদেরকে তোমাদেরই কথা দিয়ে অভিযুক্ত করছি; যে খোদার দয়া তাঁর ক্রোধের ওপর প্রবল, তিনি যখন শাস্তিদানের বেলায় (বান্দার) দেহকে মুক্ত করে ছেড়ে দেন নি, তখন পুরস্কারের বেলায়ও এ নীতিটিকে তার পক্ষে স্মরণ রাখা কি জরুরী ছিল না? এই পরম দয়ালু খোদার সম্পর্কে আমাদের পক্ষে এ কুধারণা করা কি সমীচীন যে তিনি শাস্তি দেয়ার সময় তো এত ক্রোধান্বিত হবেন যে আমাদের দেহকেও জ্বলন্ত তনুরে নিক্ষেপ করবেন কিন্তু পুরস্কার দেয়ার বেলায় তাঁর দয়া সেই মাত্রায় হবে না যে মাত্রায় তাঁর ক্রোধ শাস্তি দেয়ার সময় হবে? দেহকে যদি শাস্তি থেকে পৃথক রাখতেন, তা হলে অবশ্যই পুরস্কারের সময়েও একে দূরেই

রাখতেন। তিনি যখন শাস্তির বেলায় দেহকে গোনাহর অংশীদার মনে করে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেন, তখন হে অন্ধ ও অ-দূরদর্শী! তিনি কি ঈমান ও সৎকর্মে অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও মানবদেহকে পুরস্কারের বেলায় অংশ দান করবেন না? আর যখন মৃতরা পুনরুত্থিত হবে তখন কি স্বর্গবাসীদের অহেতুকই দেহ দান করা হবে?

এটা অতি স্পষ্ট বিষয় যে, দেহকে যখন তার সমস্ত শক্তিসহ আত্মার সাথে সংযুক্ত করা হবে তখন এ যাবতীয় দৈহিক শক্তি ও ক্ষমতা হয়তো সুখে হবে নয়তো দুঃখে পতিত হবে। কেননা সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থার মধ্যে তারতম্য ঘটা অসম্ভব। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে মানতেই হয় যে দেহ যেমন শাস্তির সময় দু:খ কষ্ট ভোগ করবে, তেমনি পুরস্কারের সময় এক ধরনের সুখও অবশ্যই উপভোগ করবে। আর এই সুখেরই কুরআন করীমে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হ্যাঁ অবশ্য খোদা তাআলা এ-ও বলেছেন যে বেহেশ্‌তের নেয়ামত সমূহ তোমাদের বুঝার উর্ধে (তথা কল্পনাতীত)। এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান তোমাদের দেয়া হয় নি। যা এখন তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে সে-সব নেয়ামতই তোমরা পাবে। এসব নেয়ামত এমন হবে যা দুনিয়াতে কেউ দেখেনি, কেউ শুনে নি এবং কোন হৃদয় অনুভব করে নি। এ যাবতীয় গোপন বিষয় তখনই বোধগম্য হবে, যখন এগুলো বেহেশ্‌তবাসীদের কাছে উপস্থিত করা হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যা কিছুর ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সাথে আল্লাহ্ এ-ও বলে দিয়েছেন যে সে বিষয়গুলো গোপনীয় রয়েছে। সেগুলোর সম্পর্কে (ইহকালে) কারও জানা নেই। কাজেই সে সব স্বাদ যদি সেটুকুই হতো যেটুকু এই দুনিয়াতে শরবত অথবা মদ্যপানের স্বাদ কিম্বা স্ত্রী সহবাসের স্বাদ হয়ে থাকে, তাহলে খোদা তাআলা এ কথা বলতেন না যে সেসব এমন বিষয় হবে যা কোন চোখ দেখে নি, কোন কান শুনে নি এবং কখনও কোন হৃদয়ে অনুভূত হয় নি। অতএব আমরা মুসলমানরা এ বিষয়ে ঈমান রাখি যে, বেহেশ্‌ত যা দেহ ও আত্মার জন্য 'দারুল জাযা' (তথা প্রতিদান ব্যবস্থাগার বিশেষ) তা কোন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত নয়। বরং এতে দেহ ও প্রাণ উভয়কে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে, যেমন জাহান্নামে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী দেহ ও আত্মা উভয়-কে প্রতিফল দেয়া হবে। আর এসব কিছুর প্রকৃত বিস্তৃত বিবরণ আমরা খোদা তাআলার ওপর সমর্পণ করি এবং ঈমান রাখি যে পুরস্কার ও শাস্তি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ ধর্মবিশ্বাসটিই যুক্তিযুক্ত এবং বিবেকবুদ্ধি ও সুবিচার সম্মত।

কুরআন করীম কেবল দৈহিক (জড়) বেহেশ্‌তের ওয়াদা করে–কুরআনের ওপর আক্রমণাত্মক এ অপবাদ দেওয়াটা চরম দুষ্টামী ও নোংরামী এবং বজ্জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পবিত্র কুরআন তো সুস্পষ্টত বলে, প্রত্যেকে যে বেহেশ্‌তে যাবে সে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার প্রতিদান ভোগ করবে। তাকে যেমন দৈহিক নেয়ামত দান করা হবে তেমনি সে 'দীদারে-ইলাহী' তথা 'খোদা-দর্শনে'র স্বাদও উপভোগ করবে এবং এটাই হবে বেহেশ্‌তে সবচেয়ে উন্নত মানের উপভোগ্য বিষয়। সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানের স্বাদও হবে। বিভিন্ন ধরনের ঐশী জ্যোতির স্বাদও থাকবে এবং ইবাদতের স্বাদও। কিন্তু সেই সাথে দেহও পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের মার্গে উপনীত হবে। আমরা দাবীর সাথে বলছি, বেহেশ্‌তবাসীর আধ্যাত্মিক প্রতিদানের যে পরিমাণ বর্ণনা কুরআন করীমে রয়েছে, তা কক্ষণও ইঞ্জিলে নেই। যার সন্দেহ আছে সে আমাদের মোকাবিলায় আসুক। আমার কাছে শুনুক এবং ইঞ্জিলের শিক্ষা তুলে ধরুক। যদি সে জয়ী হয় এবং প্রমাণ করে দেয় যে ইঞ্জিলে বেহেশ্‌তবাসীর আধ্যাত্মিক প্রতিদান কুরআনের চেয়ে বেশী বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি কসম খেয়ে বলছি, তাৎক্ষণিকভাবে হাজার টাকা নগদ তাকে দেয়া হবে। যেখানে ইচ্ছা বিধিসম্মতভাবে লিখার মাধ্যমে টাকা জমা করিয়ে নিক।

হে অন্ধগণ! কুরআনের মোকাবেলায় ইঞ্জিল কোন বস্তুই নয়। কেন তোমাদের মতিভ্রম ঘটলো? ঘরে আরাম করে বস। এখন তোমাদের লাঞ্ছনা ভোগের সময় এসে গেছে। বেহেশ্‌ত সম্পর্কে আধ্যাত্মিক প্রতিদানের বর্ণনা ইঞ্জিলে অধিক রয়েছে না কুরআনে অধিক, এ বিষয়ে সুন্দরভাবে মানুষ বনে সম্মুখে এসে আমার সঙ্গে বাহাস বিতর্ক করতে পারে তোমাদের মধ্যে কারও কি সেই সাহস আছে? যদি ইঞ্জিলে অধিক আছে বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে আমার থেকে নগদ হাজার টাকা নিয়ে নিক। যেখানে ইচ্ছা জমা করিয়ে নিক। কেউ আমার সম্মুখে দাঁড়াবে বলে আমি আশা করি না। হে আল্লাহ্‌! হে আল্লাহ্‌! এ জাতি যে কত জালেম এবং বিশ্বাসঘাতক, যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য পরোকালকে ভুলিয়ে বসেছে! কিন্তু একটু মৃত্যুর পেয়ালা পান করে নিক, তারপর দেখতে পাবে, কোথায় যিশু আর কোথায় প্রায়শ্চিত্ত? হায়! আফসোস!! এ লোকগুলো একজন অক্ষম মানুষ এবং অক্ষম নারীর পুত্রকে খোদা বানিয়ে বসেছে এবং পরম পবিত্র খোদার ওপর সমস্ত অসঙ্গত কথা প্রয়োগ করেছে। দুনিয়াতে একজনই সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এসেছেন যিনি সত্যিকার এবং পরিপূর্ণ তৌহীদ আনয়ন করেন। তাঁর প্রতি এরা শত্রুতা পোষণ করেছে।

আর এ-ও সর্বৈব মিথ্যা যে ইঞ্জিলে দৈহিক প্রতিদানের দিকে কোন ইঙ্গিত নেই। দেখুন মথি রচিত ইঞ্জিলে দৈহিক প্রতিদান সম্পর্কে যিশুর কত স্পষ্ট বাক্য বর্ণিত

হয়েছে : আর যে ব্যক্তি বাড়ীঘর, ভাই-বোন অথবা পিতা বা স্ত্রী কিম্বা সন্তান-সন্ততি বা জমি-জমা আমার নামে রেখে যাবে, সে শতগুণ বেশী পাবে (১৯ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)। লক্ষ্য করুন, এটি কত স্পষ্ট আদেশ। এতে এ সুসংবাদও রয়েছে যে খ্রিষ্টান নারী যদি যিশুর নামে ইহকালে স্বামী রেখে যায় তাহলে পরকালে সে একশ'জন স্বামী লাভ করবে! দৈহিক নেয়ামতের ওয়াদা করা যদি খোদা তাআলার মর্যাদা বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে তওরাতের যাত্রা পুস্তক : ৩ অধ্যায় ৮ শ্লোক; দ্বিতীয় বিবরণ: ৬ অধ্যায় ৩ শ্লোক; ৭ অধ্যায় ১৩ শ্লোক; ৮ অধ্যায় ১৭ শ্লোক: দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ শ্লোক; এবং বিচারক: ৯ অধ্যায় ১২ শ্লোক; দ্বিতীয় বিবরণ : ৩২ অধ্যায় ১৪ শ্লোক; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ অধ্যায় ২০ শ্লোক; লেবীয় পুস্তক : ২৬ অধ্যায় ১৩ শ্লোক : লেবীয় পুস্তক : ২৫ অধ্যায় ১৮-২৩ শ্লোক; ইয়োব : ২০ অধ্যায়১৫-১৭ শ্লোকগুলোতে কখনও দৈহিক নেয়ামতসমূহের ওয়াদা দেয়া হতো না। যিশু কি বলেন নি : 'আমি বেহেশ্‌তে দ্রাক্ষারস পান করবো"? কী অদ্ভুত যিশু যিনি মুসলমানদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার আকাঙ্খা রাখেন যেখানে দৈহিক নেয়ামতসমূহও রয়েছে!! আরও আশ্চর্যের বিষয় যে কেবল দেহিক নেয়াম্মতসমূহের প্রতিই প্রলুব্ধ হয়েছেন কেবল তাই নয়, 'ঐশী দর্শন লাভ'-এরও উল্লেখ করেন নি! লুয়াজেরের কাছে পানি চাওয়ার বিষয়টির কথাও একটু স্মরণ করুন। যে বেহেশ্‌তে পানি নেই এতে পানির উল্লেখ এ প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করায় : "দরোগ গো রা হাফ্‌যা না বাশদ" অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না। এটা সত্য যে বেহেশ্‌তে বসবাসকারীরা ফিরিশ্‌তাদের মত হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোথায় প্রমাণিত যে মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়ে বস্তুতপক্ষেই ফিরিশ্‌তা হয়ে যাবে[২৮] এবং মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দেবে?

তবে এটা সত্য যে বেহেশ্‌তে দুনিয়ার ন্যায় বিয়ে শাদী হয় না। কিন্তু বেহেশ্‌তি ধারায় দৈহিক স্বাদ উপভোগ তো থাকবে। যেমন, যিশুর এক্ষেত্রে অস্বীকারও ছিল না, দ্রাক্ষা রস পান করার আকাঙ্খা করতে করতে গত হলেন। তওরাত থেকে প্রমাণিত যে দৈহিক প্রতিদান প্রদানও খোদা তাআলার এক স্বভাব। তাই কী করে সম্ভব যে অপরিবর্তনীয় খোদা কিয়ামতকালেও তাঁর স্বভাব বদলে ফেলবেন?!

আপনার তৃতীয় আপত্তি হচ্ছে, ইসলামের শিক্ষায় আছে যে যতক্ষণ কেউ গোনাহ্ কার্যত না করে ততক্ষণ সে-ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবে না। কেবল মনের খেয়ালের

২৮. বস্তুত পক্ষে ফিরিশ্‌তায় পরিণত হওয়াই এক, আর পবিত্রতায় তাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করাই আরেক বিষয়।

জন্য তাকে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি দেবেন না। কিন্তু ইঞ্জিলে এর বিপরীত রয়েছে অর্থাৎ মনের ভাব ও খেয়ালের ওপরও শাস্তি হবে।

উত্তর : জানা আবশ্যক, ইঞ্জিলে যদি ওরূপই লেখা থাকে তাহলে সে ইঞ্জিল খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নয়। সত্য সেটিই যা খোদা তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন : মানুষের মনে স্বতঃউদ্ভাসিত কল্পনা বিশেষ তাকে গোনাহ্র ভাগী করে না। বরং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হবার কারণ কেবল তিন প্রকার : (১) প্রথমত মানুষের মুখে যখন দ্বীন, সত্য ও ন্যায়বিচার বিরোধী কথা উচ্চারিত হয়। (২) দ্বিতীয়ত যখন তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে অবাধ্যতামূলক কাজকর্ম সংঘটিত হয়। (৩) তৃতীয়ত কারও অন্তর যখন অবাধ্যতায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয় অর্থাৎ অমুক-খারাপ কাজটি অবশ্য-অবশ্যই করবে বলে সংকল্প গ্রহণ করে। এরই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط **"ওয়া লাকিন ইউয়া-খিযুকুম বিমা কাসাবাত কুলুবুকুম"** (আল বাকারাহ্ : ২২৬) অর্থাৎ যে সব গোনাহ্ (মানুষের) অন্তর নিজ সংকল্পের মাধ্যমে অর্জন করে সে সব গোনাহর জন্য জবাবদিহিতা হবে। কিন্তু শুধুমাত্র খেয়াল যা মানব স্বভাবের নিয়ন্ত্রণে নয় তার জন্য জবাবদিহিতা নেই। পরম দয়ালু খোদা আমাদেরকে সে সব খেয়ালের জন্য পাকড়াও করেন না, যা আমাদের ক্ষমতার বাইরে হয়ে থাকে। তবে সে সময় পাকড়াও করেন যখন আমরা মুখ, হাত বা হৃদয়ের সংকল্প দিয়ে সে খেয়ালকে অনুসরণ করি, মেনে চলি। বরং কোন সময় আমরা এ সব খেয়ালের দরুন সওয়াব অর্জন করে থাকি। খোদা তাআলা কুরআন করীমে কেবল হাত-পায়ের দ্বারা সংঘটিত গোনাহ্রই উল্লেখ করেন না, বরং কান, চোখ ও হৃদয়ের গোনাহ্রও উল্লেখ করেন। যেমন তিনি তাঁর পবিত্র কালামে বলেন :

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

**"ইন্নাস্সাম্আ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুওয়া-দা কুল্লু উলা-য়িকা কা-না আনহু মাসউলা"** (বনী ইসরাঈল : ৩৭) অর্থাৎ কান চোখ ও হৃদয়–এগুলোর প্রত্যেকটির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এখন লক্ষ্য করুন, খোদা তাআলা যেমন কান এবং চোখের গোনাহ্র উল্লেখ করেন, তেমনি অন্তরের গোনাহ্রও উল্লেখ করেন। কিন্তু অন্তরের গোনাহ্ কল্পনা ও খেয়ালগুলো নয়। কেননা এগুলো তো মনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।[২৯] বরং অন্তরের গোনাহ্ হলো যে খেয়াল সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা

২৯. সওয়াব তখন অর্জন করি যখন আমাদের মনে ভর করা অবাধ্যতা ও অসৎ কাজের দিকে প্রলোভন সৃষ্টিকারী খেয়ালগুলোকে সৎকাজের মাধ্যমে মোকাবেলা করি এবং এ খেয়ালগুলোর বিপরীত কাজ করি।

হয়। মানুষের নিয়ন্ত্রণ শক্তির বাইরে যে-সব খেয়াল, কেবল সেগুলোই গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সেগুলোর সম্পর্কে সংকল্প গ্রহণ করলে এবং সেগুলো কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা পোষণ করলে গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। তেমনি ধারায় আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু (মনের) অভ্যন্তরীণ গোনাহ্ সম্পর্কে আরেক জায়গায় বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

**"কুল ইন্নামা হাররামা রাব্বিয়াল ফওয়া-হিশা মা যাহারা মিনহা ওয়া মা বাতানা"** (আল-আ'রাফ : ৩৪) অর্থাৎ খোদা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় রকম গোনাহ্ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।'

এখন আমি দাবীর সাথে বলছি, এ উত্তম শিক্ষাও ইঞ্জিলে মওজুদ নেই যেখানে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত গোনাহ্‌র উল্লেখ করা হয় এবং মনের সংকল্প এবং শুধু খেয়াল এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বস্তুত ইঞ্জিলে এ রকম উঁচু মানের শিক্ষা থাকা সম্ভব ছিল না। কেননা এ শিক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও হিকমতপূর্ণ নীতি ভিত্তিক শিক্ষা। আর ইঞ্জিল তো হলো মোটা ধরণের ধ্যান-ধারণার আঁকর মাত্র এবং গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এখন একে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন। তবে আপনার যিশু সাহেব পর্দাপোশীর (দুর্বলতা ঢাকার) উদ্দেশ্যে এ তদ্বিরটি ভালই করেছিলেন যে মানুষকে কথায় কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর শিক্ষা তেমন একটা ভাল নয় বিধায় ভবিষ্যতে এ নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ হবে। কাজেই "তোমাদের পক্ষে আর এক জনের জন্য অপেক্ষমান হওয়াই উত্তম হবে, যাঁর শিক্ষা সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্বের সকল স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতা দান করবে।" কিন্তু সাবাস পাদ্রী সাহেবান! আপনারা তাঁর এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশটির প্রতি খুব ভালই সাড়া দিয়েছেন!! অথচ ইঞ্জিলের শিক্ষাকে আপনাদের যিশু সাহেব নিজেও আপত্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন এবং ভবিষ্যতে আগমনকারী একজন পবিত্র নবীর সম্পর্কে সুসংবাদ দান করেন। তবু এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার ওপরই আপনারা লুটিয়ে পড়ছেন!!

আচ্ছা, বলুন তো দেখি, আপনাদের যিশুর শিক্ষা স্বয়ং তাঁর স্বীকৃতির মাধ্যমে অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে, না কি এখনো এতে কিছু কমতি রয়ে গেছে? তবে যিশু নিজেই যখন তাঁর শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ ও অকেজো বলে স্বীকার করেন, তখন আপনারা নিজেদের গুরুর ভবিষ্যদ্বাণীকে স্মরণে রেখে ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যরাজী আমাদের কাছে শুনুন। এবং নিজেদের যিশুকে আর মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে ইঞ্জিলের চেয়ে উত্তম ও উচ্চতর শিক্ষার অধিকারী নবী আবির্ভূত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী বাতিল হওয়ার পর্যায়ে থেকে যায়। কিন্তু সেই পূত-পবিত্র নবী তো এসে গেছেন।

আপনারা তাঁকে শনাক্ত করলেন না। আমাদের লিখা বই-পুস্তকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন যাতে আপনারা জানতে পারেন মসীহর সেই প্রতিক্ষীত পরিপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে আল-কুরআন। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি না থাকলেও কুরআনের পরিপূর্ণ এবং ইঞ্জিলের ত্রুটিযুক্ত হওয়াই খোদার অকাট্য যুক্তির পূর্ণতা সাধন করেছিল। অতএব, জাহান্নামের আগুনকে ভয় করুন এবং আগমনকারীকে মেনে নিন যার সম্পর্কে মসীহ্ সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ শিক্ষার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার যিশুর এ ক্ষেত্রে কোন এহ্সান নেই। কেননা স্বয়ং শক্তিশালী দুর্বলকে নিচে ফেলে দিয়েছে। এখন শুধু উপলব্ধির ঘাটতি মাত্র। অন্যথায়, এখন ইঞ্জিলের পা রাখার জায়গা নেই।

**চতুর্থ আপত্তি :** ইসলামের শিক্ষায় অমুসলিমদের 'মহব্বত' করার বা ভালবাসার কোথাও আদেশ নেই। বরং আদেশ রয়েছে, মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসবে না।

**উত্তর :** জানা আবশ্যক, এ সবই ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কিতাব ইঞ্জিলের কুপ্রভাব ও কুফল বিশেষ যে খ্রিষ্টানরা প্রকৃত সত্য ও বাস্তব বিষয় থেকে দূরে ছিটকে পড়েছেন। নচেৎ মহব্বত ও ভালবাসা কী এবং এর প্রয়োগ কোন্ ক্ষেত্রে হওয়া উচিত আর তেমনি ঘৃণা কী বিষয় এবং এর প্রয়োগ কিসে হওয়া উচিত তা এক গভীর দৃষ্টিতে দেখলে 'ফুরক্বান করীমে'র সত্যদর্শন উপলব্ধি করা যায়, শুধু তাই নয়, বরং মানবাত্মা এথেকে সত্যিকার জ্ঞানতত্ত্বের এক পরিপূর্ণ জ্যোতি লাভ করে থাকে।

অতএব জানা উচিত, মহব্বত বা ভালবাসা কোন কৃত্রিম ও লৌকিকতামূলক কাজ নয়, বরং মানুষের স্বভাবজ শক্তিগুলোর মাঝে এ-ও একটি স্বভাবজ শক্তি। এর মূলতত্ত্ব হচ্ছে, একটি জিনিসকে পছন্দ করে এর প্রতি হৃদয়ের আকৃষ্ট হয়ে পড়া। আর যেমন প্রত্যেক জিনিসের আসল গুণ ও বৈশিষ্ট্য এর পরিপূর্ণ বিকাশের সময় অনুভূত হয়ে থাকে ঠিক তেমনি মহব্বত ও ভালবাসার গুণ ও বৈশিষ্ট্য এর পূর্ণতম মাত্রায় পৌঁছুলেই প্রকাশ্যভাবে বিকশিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "উশ্রিবূ ফি কুলুবিহিমুল ইজ্লা" (আল বাকারাহ্ : ৯৪) অর্থাৎ তারা গোবৎসকে এতো ভালবেসেছে যে গোবৎস যেন শরবতের ন্যায় তাদের পান করিয়ে দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে যে-ব্যক্তি কাউকে পুরোপুরি ভালবাসে, সে যেন তাকে পান করে বা খেয়ে ফেলে অর্থাৎ তার চারিত্রিক গুণাবলী ও তার আচার-আচরণের রঙে রঙীন হয়ে যায় আর যত বেশি ভালবাসে তত বেশি মানুষ স্বভাবত তার প্রিয়ের গুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, এমন কি পরিশেষে তারই রূপ ধারণ করে

ফেলে যাকে সে ভালবাসে। এটাই গুঢ়তত্ত্ব ও গোপন রহস্য। খোদা তাআলাকে যে ব্যক্তি ভালবাসে, সে প্রতিচ্ছায়ারূপে নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সেই নূর ও জ্যোতি আহরণ করে নেয় যা খোদা তাআলার সত্তায় বিদ্যমান। আর শয়তানকে যে ভালবাসে সে শয়তানের মাঝে বিদ্যমান আঁধারকে গ্রহণ করে নেয়। কাজেই ভালবাসার মূলতত্ত্ব যখন এটাই তখন কী করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি সত্য কিতাব অনুমতি দিতে পারে যে, খোদাকে যেভাবে ভালবাসা উচিত সেভাবে তোমরা শয়তানকে ভালবাস, আর পরম দয়ালু খোদার প্রতিনিধিদের যেভাবে ভালবাসা উচিত সেভাবে শয়তানের প্রতিনিধিদেরকে ভালবাস। আফসোস, পূর্বে তো ইঞ্জিলের বাতিল হওয়ার সম্পর্কে আমাদের কাছে এটাই একটি দলিল ছিল যে ইঞ্জিল একজন এক মুষ্টি ধুলিবৎ অক্ষম মানুষকে খোদা বানায়। এখন এই অন্যান্য যুক্তি- প্রমাণেরও উদ্ভব হলো যে এর অপরাপর শিক্ষাও নোংরা। যেভাবে খোদাকে ভালবাসা উচিত সেভাবে তোমরা শয়তানকে ভালবাস–এটা কি পবিত্র শিক্ষা হতে পারে? যদি এ ওজর পেশ করা হয় যে যিশু ঐশী তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন না বলে ভুলবশত তাঁর মুখ দিয়ে এসব কথা বেরিয়েছে, তাহলে আলবৎ এ ওজর অবান্তর। কেননা তিনি যদি এমনই অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহলে কেন তিনি জাতির সংস্কারক হওয়ার দাবী করেছিলেন? তিনি কি শিশু ছিলেন? তিনি এটাও জানতেন না যে মহব্বত বা ভালবাসার মূলতত্ত্ব আবশ্যকীয়ভাবে এ কথার দাবী রাখে যে মানুষ যেন আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে নিজ প্রেমাস্পদের সমূদয় গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং উপাসনাযোগ্য আচারাদিকে পছন্দ করে এবং সেগুলোর দিকে আকর্ষিত হয়ে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় নিজ প্রেমাস্পদে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে সেই জীবনের অধিকারী হয় যা তার প্রিয়ের মাঝে রয়েছে? সত্য প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মাঝে আত্মবিলীন হয়ে যায়। তাঁরই মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজের ভেতর তাঁর এমন ছবি অঙ্কন করে যেন তাকে সে পান করে এবং খেয়ে ফেলে অর্থাৎ সে তারই হয়ে যায় এবং তাঁরই রঙে রঙীণ হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয় যে সে প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভালবাসায় আত্মভোলা হয়েছে। আরবীতে ভালবাসার প্রতিশব্দ হলো **'মহব্বত'**, যার প্রকৃত অর্থ 'ভরে যাওয়া'। সুতরাং আরবে এ প্রবাদ বাক্যটি সুখ্যাত: **'তাহাব্বাল হিমা-রু'** অর্থাৎ আরবরা যখন বলতে চায় : 'গাধাটির পানি খেয়ে পেট ভরে গেছে', তখন বলে, 'তাহাব্বাল হিমা-রু'। আর যখন তারা বলতে চায় : 'উটটা এত পানি পান করছে যে পেট ভরে গেছে', তখন তারা বলে 'শারিবাতুল ইবিলু হাত্তা তাহাব্বাবা'। 'হাব্ব্' শস্যদানা বা বীজকে বলে। এটিও একই ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর মর্ম হচ্ছে। এটি প্রথম বীজের সকল বৈশিষ্ট্যসহ

কেবল এ অবস্থাতেই পালনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে যখন তাদের অস্বীকার ও দুষ্কর্ম থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করা যাবে। অতি অজ্ঞ (বলে গণ্য) হবে সেই ব্যক্তি যে কিনা এই শিক্ষা দেয় যে, নিজ ধর্মের শত্রুদের ভালবাস। আমরা কয়েকবার লিখে এসেছি, প্রেম ও মহব্বত একেই বলা হয় যে তার কথা, কাজ ও স্বভাব-চরিত্র এবং ধর্মকে আমরা সুনজরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে দেখি ও তার প্রতি খুশী হয়ে তার প্রভাব ও ছাপ নিজ অন্তরে গ্রহণ করি। আর কাফিরের বিষয়ে মুসলিমের পক্ষে এমনটি যেহেতু কখনও সম্ভব নয় তাই মু'মিন অস্বীকারকারীদের প্রতি মহব্বতের পরিবর্তে 'শাফক্বাত' তথা সহানুভূতি দেখাবে এবং তাদের সাথে গভীর সহানুভূতিপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক সদ্ব্যবহার করবে এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক রুগীদের দুঃখ মোচনে ব্রতী হবে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বার বার বলেন, তোমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। ক্ষুধার্তদের খাবার দাও। দাস ও বন্দীদের স্বাধীন ও বন্ধনমুক্ত কর। ঋণীদের ঋণমুক্ত কর। ভারাক্রান্তদের ভার লাঘব কর এবং মানবজাতির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিমূলক দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبٰى **"ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুবিল আদ্‌লি ওয়াল ইহ্সানি ওয়া ইতা-য়ি যিল কুরবা"** (নাহল : ৯১) অর্থাৎ খোদা তাআলা তোমাদের আদেশ দেন, ন্যায়বিচার করার। এর চেয়ে ঊর্ধ্বস্তর হলো, তোমরা ইহ্সান করো, যেমন শিশুর প্রতি তার মা করে থাকে অথবা অন্য কেউ শুধু নিকটাত্মীয়সূলভ প্রেরণায় কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ বলেন :

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

**"লা ইয়ান্হা-কুমুল্লাহু আনিল্লাযীনা লাম ইউকা-তেলুকুম ফিদ-দীনে ওয়া লাম ইউখ্‌রিজুকুম মিন দিয়া-রিকুম আন তাবাররুহুম ওয়া তুকসিতু ইলাইহিম ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতীন"** (আল মুমতাহিনা : ৯) অর্থাৎ খ্রিষ্টান ও আন্যদেরকে 'মহব্বত' করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন বলে এমনটি মনে করবে না যে তিনি তোমাদেরকে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও উপকার করতে এবং সহানুভূতি দেখাতেও নিষেধ করেন। না, বরং যারা তোমাদের রক্তপাত ঘটাতে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দেয় নাই তারা খ্রিষ্টান হোক বা ইহুদী হোক তাদের প্রতি সাচ্ছন্দে কৃপা ও সহানুভূতিমূলক সদ্ব্যবহার কর এবং ন্যায় বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন লোকদের ভালবাসেন। এরপর তিনি আরও বলেন :

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

**"ইন্নামা-ইয়ান্হা-কুমুল্লাহু আনিল্লাযীনা কা-তালুকুম ফিদদীনে ওয়া আখরাজুকুম আন তাওয়াল্লাও হুম ওয়া মান ইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাউলা-ইকা হুমুয্যা-লেমুন"** (আল মুমতাহিনাহ্ : ১০) অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন তা কেবল সেই সব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং সবাই মিলিত হয়ে তোমাদের বের করে না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি, কাজেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব হারাম। কারণ তারা দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।' এ স্থলে একটি স্মরণীয় তত্ত্ব রয়েছে। তা এই যে **'তাওয়াল্লা'** শব্দটি[৩০] আরবী ভাষায় বন্ধুত্বকে বলে যার অপর নাম **'মওয়াদ্দাত'** (ভালবাসা)। বন্ধুত্বের মূলতত্ত্ব হচ্ছে মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি। অতএব মু'মিন খ্রিষ্টান, ইহুদী ও হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও মঙ্গল কামনা এবং ইহ্সান ও উপকার করতে পারে। কিন্তু 'মহব্বত' করতে পারে না। এ একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য যা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এরপর আপনি আপত্তি পেশ করেছেন, মুসলমানরা খোদাকেও বিনা স্বার্থে মহব্বত করে না, ভালবাসে না। তাদের এ শিক্ষা দেয়া হয় নি যে খোদা তাঁর গুণ ও সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত ও ভালবাসার যোগ্য। এর উত্তর হলো : জানা আবশ্যক, এ আপত্তিটি প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিলের ওপর প্রযোজ্য। কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা ইঞ্জিলে কক্ষনও এ শিক্ষা মওজুদ নেই যে খোদা তাআলার সাথে সাক্ষাৎ ভালবাসার সম্পর্ক রাখা আবশ্যক এবং সাক্ষাৎ ও ঐকান্তিক ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা উচিত। কিন্তু কুরআন করীম এ শিক্ষায় ভরপুর রয়েছে।

কুরআন করীম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে : فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا **"ফায্করুল্লাহা কাযিক্রিকুম আ-বা-য়াকুম আও আশাদ্দা যিকরা"** (বাকারাহ্ : ২০১) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ **"ওয়াল্লাযীনা আ-মানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লা-হ্"** (বাকারাহ্ : ১৬৬) অর্থাৎ খোদাকে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজেদের পিতাদের স্মরণ করে থাক বরং এর চেয়েও বেশি।[৩১] আর মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য

৩০. 'তাওয়াল্লি' শব্দটির 'তা' এর অর্থে একটি চেষ্টার লেশ আছে বলে নির্দেশ করে যা পারস্পারিক অমিলকে প্রমাণ করে। কিন্তু 'মহব্বত' শব্দটির অর্থে এক কণা পরিমাণ অমিল অবশিষ্ট থাকে না।

৩১. ইঞ্জিল অনুযায়ী প্রত্যেক অবাধ্য পাপাচারী 'খোদার পুত্র'। শুধু তাই নয় বরং স্বয়ং খোদা। অতএব ইঞ্জিল এ কারণে কাউকে খোদার পুত্র বলে সাব্যস্ত করে না যে সে খোদাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে বরং বাইবেল অনুযায়ী বেভিচারীরাও খোদার পুত্র এবং কন্যা।

হচ্ছে, তারা খোদাকে সবচে' বেশি ভালবাসে অর্থাৎ সেভাবে না বাপকে ভালবাসে, না মাকে আর না নিজেদের অন্যান্য প্রিয়জনকে ভালবাসে এবং সেভাবে নিজেদের প্রাণকেও ভালবাসে না। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন : حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ **"হাব্বাবা ইলাইকুমুল ঈমা-না ওয়া যাইয়ানাহু ফি কুলূবিকুম"** (আল হুজরাত : ৮) অর্থাৎ খোদা ঈমানকে তোমাদের কাছে অতি প্রিয় করে দিয়েছেন এবং একে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى **"ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহ্সা-নি ওয়া ইতা-য়ি যিল কুরবা"** (আন নাহল : ৯১) এ আয়াতটি আল্লাহ্র হক্ ও বান্দার হক্ এ উভয় বিষয় সম্বলিত এবং এতে অতি প্রাঞ্জলভাবে আল্লাহ্ তাআলা উভয় দিক দিয়ে একে কায়েম করেছেন। বান্দাদের হক্ বিষয়ের দিকটিতো আমি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। এখন আল্লাহ্র হক্ বিষয়ের দিক দিয়ে এ আয়াতের অর্থ হলো, ন্যায়বিচারের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য কর। কেননা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিপালন করেছেন এবং প্রতি নিয়ত করছেন, তাঁর অধিকার রয়েছে তোমরাও যেন তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর। তোমাদের যদি এর চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় তাহলে কেবল ন্যায়বিচারের প্রেক্ষিতেই নয়, বরং ইহ্সানের হক্ পালনের প্রেক্ষিতেও তাঁর আনুগত্য কর। কেননা তিনি 'মহ্সিন' (অনুগ্রহকারী) এবং তাঁর কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজি এতো বেশি যে তা গণনায় আয়ত্ত করা যায় না। আর এটা স্পষ্ট যে ন্যায় বিচারের স্তর থেকে উচ্চতর স্তর হচ্ছে, আনুগত্যের সময় যেন ইহ্সানও বিবেচনায় থাকে। আর যেহেতু প্রতিনিয়ত ইহ্সানের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ বস্তুত ইহ্সানকারীর চেহারা তাঁর গুণাবলীসহ সর্বদা দৃষ্টিপটে আনয়নের কারণ হয় সেহেতু 'ইহ্সানে'র সংজ্ঞায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত যে এমনভাবে তাঁর ইবাদত করবে যেন স্বয়ং খোদাকে দেখতে পাচ্ছ।

খোদা তাআলার আনুগত্যকারীগণ আসলে তিন ভাগে বিভিক্ত। প্রথমত যারা 'আবরণে আবদ্ধতা' এবং 'উপকরণে দৃষ্টিনিবদ্ধতা'র কারণে ঐশী অনুগ্রহরাজী ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না বলে সেই প্রেরণাও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় না যা ঐশী অনুগ্রহরাজীর মাহাত্ম্যে নজর দেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেই ঐশী ভালবাসাও তাদের মাঝে সক্রিয় হয় না যা অনুগ্রহকারী আল্লাহ্র মহান অনুগ্রহরাজীর কথা ভেবে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বরং তারা কেবল একটা মোটামুটি দৃষ্টিপাতে খোদা তাআলার সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি হিসেবে তাঁর প্রাপ্য অধিকার স্বীকার

করে নেয় বটে। কিন্তু ঐশী অনুগ্রহরাজীর সুবিস্তীর্ণ বিবরণে এমন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করে না যা সেই প্রকৃত কল্যাণকারী খোদাকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে। কেননা উপকরণবাদিতার ধুম্রজাল প্রকৃত উপকরণ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণকারীর পুরোপুরি চেহারা দেখতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিধায় তারা সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভে বঞ্চিত থাকে, যাতে তারা পুরোপুরিভাবে প্রকৃত দাতার সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারতো। কাজেই তাদের ত্রুটিপূর্ণ 'মারেফৎ' (ঐশী তত্ত্বোপলব্ধি) পার্থিব উপকরণবাদিতার কলুষতার সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং খোদা তাআলার অনুগ্রহরাজী ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে না বিধায় তারা নিজেরাও সে দিকে তেমন মনোযোগী হয় না যেমনটি অনুগ্রহরাজী পর্যবেক্ষণে হতে হয়, যার দরুন 'ইহ্সানকারী' আল্লাহ্র চেহারা দৃষ্টির সম্মুখে এসে যায়। বরং তাদের তত্ত্বোপলব্ধি ধুঁয়াটে অবস্থায় হয়ে থাকে। কারণ তারা কিছুটা তো নিজেদের পরিশ্রম ও নিজেদের উপায়-উপকরণে ভরসা রাখে এবং কিছুটা কৃত্রিমভাবে এ-ও স্বীকার করে নেয় যে খোদার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে প্রাপ্য অধিকার তাদের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে ন্যাস্ত রয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিসরের বাইরে বোঝা চাপান না, তাই এমতাবস্থায় তিনি তাদের কাছে কেবল এটুকুই চান, তারা যেন তাঁর প্রাপ্য অধিকারসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। বস্তুত "ইন্নাল্লাহা ইয়া'মরু বিল আদলি" আয়াতে 'আদল' দ্বারা ন্যায় বিচারের প্রেক্ষিতে আনুগত্যকে বুঝায়। কিন্তু মানুষের ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের এরও উচ্চতর স্তর রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, আমরা একটু আগে যেমন বর্ণনা করে এসেছি–মানুষের দৃষ্টি যেন পার্থিব উপকরণে নিবদ্ধতামুক্ত ও পবিত্র হয়ে খোদা তাআলার অনুগ্রহের হাতকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয় এবং এই স্তরে মানুষ উপকরণের পর্দা ভেদ করে এর সম্পূর্ণ বাইরে চলে আসে এবং উদাহরণ স্বরূপ প্রচলিত ধারায় যেমন বলা হয়, 'আমার নিজেরই পানি সিঞ্চনে আমার ক্ষেতে ফসল ফলেছে বা আমার নিজের বাহু বলেই আমার এই সফলতা লাভ হয়েছে অথবা যায়েদের মেহেরবানীতে আমার অমুক উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে এবং বকরের খবরদারিতে আমি বেঁচে গেছি'– এ জাতীয় সব কথা তুচ্ছ ও বৃথা বলে প্রতীয়মান হতে থাকে এবং একমাত্র অস্তিত্ব একমাত্র কুদরত ও একমাত্র দাতা ও কল্যাণকারী এবং একমাত্র হাত পরিলক্ষিত হয়। তখনই মানুষ সম্পূর্ণ উপকরণবাদিতামূলক শিরকের ধুলিবালিমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে খোদা তাআলার ইহ্সান ও অনুগ্রহরাজীকে দেখতে পায় এবং তার এই দেখা এত পরিষ্কার ও নিশ্চিত হয়ে থাকে যে সে এমন কল্যাণকারী খোদার ইবাদত করার সময় তাঁকে অনুপস্থিত বলে মনে করে

না বরং নিশ্চিতভাবে তাঁকে উপস্থিত ভেবে তাঁর ইবাদত করে। এই ইবাদতের নাম কুরআন করীমে 'ইহ্সান' রয়েছে এবং সহী বুখারী ও মুসলিমে স্বয়ং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'ইহ্সানে'র এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এই স্তরের পর আরেকটি স্তর রয়েছে যা 'ইতা-য়ি যিল কুরবা' নামে অভিহিত।[৩২] এর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে, মানুষ যখন এক দীর্ঘকাল যাবৎ ঐশী অনুগ্রহরাজীকে বিনা পার্থিব উপকরণের অংশীবাদীতায় দেখতে থাকে এবং তাঁকেই হাজির (বর্তমান) ও বিনা মধ্যস্থতায় (সরাসরি) কল্যাণকারী মনে করে তাঁর ইবাদত করতে থাকে তখন এই মনন ও অনুধাবনের চূড়ান্ত পরিণতি এটাই হবে যে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রতি তার এক সাক্ষাৎ ভালবাসা তৈরী হবে। কেননা ক্রমাগতভাবে হতে থাকা অনুগ্রহরাজী সদাসর্বদা পর্যবেক্ষণ আবশ্যকীয়ভাবে অনুগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে এত প্রভাব ফেলে যে সে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে পড়ে যাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তাকে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলেছে। তাই এমতাবস্থায় সে কেবল অনুগ্রহরাজীর কল্পনায় তাঁর ইবাদত করে না বরং তাঁর সাক্ষাৎ ভালবাসা তার অন্তঃকরণে আসন গেড়ে বসে। যেমন মায়ের প্রতি তার শিশু সন্তানের এক সাক্ষাৎ ভালবাসা হয়ে থাকে। অতএব এই স্তরে সে ইবাদত কালীন সময়ে খোদা তাআলাকে কেবল দেখেই না, বরং দেখে দেখে খাঁটি প্রেমিকের ন্যায় অভিভূত ও পরিতৃপ্তও হতে থাকে এবং প্রবৃত্তিমূলক সব বাসনা কামনা মিটে গিয়ে তার অন্তরে তাঁর সাক্ষাৎ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ স্তরটিকে খোদা তাআলা "ইতায়ি যিল কুরবা" শব্দ-গুচ্ছের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টির দিকেই খোদা তাআলা এ আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন : فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا **"ফায্করুল্লাহা কাযিক্রিকুম আবা-য়াকুম আও আশাদ্দা যিকরা"** (আল বাকারাহ্ : ২০১) [অর্থ : তোমরা তোমাদের বাপ দাদাদের স্মরণ করার ন্যায় আল্লাহ্কে স্মরণ করো বরং তাঁকে এর চেয়েও বেশি স্মরণ করো –অনুবাদক]।

৩২ **'ইতায়ি যিল কুরবা'** এর মর্তবাটি ক্রমাগতভাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজী পরিদর্শনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং এ স্তরটিতে ইবাদতকারীর হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ ভালবাসা জন্মায়। এবং প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনার গন্ধ ও চিহ্নও সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। প্রকৃত সত্য এই যে সাক্ষাৎ ভালবাসার উৎস-মুল হিসাবে দুটি বিষয়ই রয়েছে : (১) প্রথমত কারও সৌন্দর্য ও অবয়ব বিপুলভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং চারিত্রিক গুণাবলীকে সর্বদা স্মরণ করা ও কল্পনায় সংরক্ষণ করা (২) দ্বিতীয়ত বিপুলভাবে কারও ধারাবাহিক অনুকম্পা ও কল্যাণসমূহকে স্মরণ করা ও কল্পনায় লালন করা। তাঁর নানাহ রকম বিশ্বস্ততা ও সৌজন্যমূলক মহানুভবতা ও কৃপা সমূহ দৃষ্টিপটে রাখা এবং যাবতীয় উপকার ও অনুগ্রহের মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া।

মোট কথা, এটি হলো : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ **"ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহ্সা-নি ওয়া ইতা-য়ি যিল কুরবা"** (আল নাহল : ৯১) আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা। এতে খোদা তাআলা মানুষের সূক্ষ্মতত্ত্বোপলব্ধির তিনটি স্তর বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তৃতীয়টিকে সাক্ষাৎ ঐশী ভালবাসা বলে অভিহিত করেছেন। এ স্তরটিতে প্রবৃত্তিমূলক সব কামনা-বাসনা জ্বলে ছাই হয়ে যায় এবং হৃদয় ঐশী প্রেমে এভাবে ভরে যায় যেভাবে একটি শিশি আতরে ভরা থাকে। এ স্তরটির দিকেই এ আয়াতেও ইঙ্গিত রয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ○

**"ওয়া মিনান্ না-সে মাইঁইয়াশরি নাফ্সাহু ইবতিগা-য়া মারযা-তিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু রউফুম বিল ইবা-দ"** (বাকারা : ২০৮) অর্থাৎ কতিপয় মু'মিন এমনও আছে যারা নিজেদের প্রাণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়[৩৩] আর আল্লাহ্ এমন বান্দাদের ওপরই অতি মেহেরবান। তিনি আরও বলেন :

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

**"বালা-মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লা-হি ওয়া হুয়া মুহসিনুন ফালাহু আযরুহু ইন্দা রাব্বিহি ওয়ালা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানুন"** (আল বাকারাহ্ : ১১৩) অর্থাৎ সেই সব লোক নাজাতপ্রাপ্ত যারা খোদার কাছে নিজের সত্তাকে সমর্পন করে দেয় এবং তাঁর অনুগ্রহরাজী উপলব্ধির মাধ্যমে এমনভাবে তাঁর ইবাদত করে যেন তাঁকে তারা দেখছে। অতএব এসব লোক খোদার কাছ থেকে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

আরেক জায়গায় তিনি বলেন :

يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○

**"ইউত্য়িমুনাত্ তো'আমা আলা হুব্বিহি মিসকানাওঁ ওয়া ইয়াতীমাওঁ ওয়া আসীরা ইন্নামা নুত্য়িমুকুম লি ওয়াজ্ হিল্লা-হি লা নুরীদু মিনকুম জাযা-য়াওঁ ওয়ালা শুকূরা"** (আল-দাহ্র : ৯, ১০) অর্থাৎ মু'মিন তারাই যারা খোদার ভালবাসায় মিসকিন এতিম ও বন্দীদের খাবার খাওয়ায় আর বলে, এই খাবার খাওয়ানোর জন্য আমরা কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। এ

৩৩. প্রাণ বিক্রয় করায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ তার জীবন ও তার আরামকে 'জালালে ইলাহী' প্রকাশ করায় এবং দ্বীনের খিদমত ও সেবায় উৎসর্গ করে দেয়।

যাবতীয় সেবায় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য খোদার চেহারা (–সন্তুষ্টি লাভ)। এখন চিন্তা করা উচিত এ সকল আয়াত থেকে কত স্পষ্টভাবে জানা যায়, কুরআন করীম আল্লাহ্র ইবাদত ও সৎকর্মের উচ্চস্তর এটাই নির্ধারণ করেছে যে আল্লাহ্র ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা-প্রয়াস যেন আন্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমে সাধিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত এ উত্তম শিক্ষা কি ইঞ্জিলেও মজুদ আছে? আমরা সবাইকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে ইঞ্জিল কখনও বর্ণনা করে নি। খোদা তাআলা তো এ ধর্মের নাম 'ইসলাম' এ উদ্দেশ্যেই রেখেছেন, মানুষ যেন খোদা তাআলার ইবাদত প্রবৃত্তিমূলক কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে না করে বরং স্বভাবজাত উৎসাহ উদ্দীপনায় করে। কেননা ইসলাম সব রকম স্বার্থ ত্যাগ করার পর ঐশী সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টির নাম। দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া এ সব উচ্চাঙ্গীন ও পবিত্র উদ্দেশ্য সম্বলিত কোন ধর্ম নেই। তবে খোদা তাআলা নি:সন্দেহে তাঁর করুণার বিষয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে মু'মিনদেরকে নানা রকম বৈচিত্রময় অনুগ্রহ সম্পর্কে ওয়াদা দিয়েছেন। কিন্তু উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষী মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তাআলা এ শিক্ষাই দান করেছেন তারা যেন তাঁর সাক্ষাৎ ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করে। কিন্তু ইঞ্জিলে তো স্পষ্ট সাক্ষ্য সমূহ রয়েছে, আপনাদের যিশু সাহেবের শিষ্যরা লোভী এবং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলো কাজেই তাদের জ্ঞানবুদ্ধি, সাহস ও প্রতিভা যেমনটি ছিল তেমন হেদায়তই তারা পেয়েছিলো। আর তেমন যিশুই তারা পেয়ে গেলো, যিনি নিজের আত্মহত্যার প্রতারণার মাধ্যমে সরল-সোজা লোকদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে রুখে দিলেন।

যদি বলেন, ইঞ্জিলে খোদাকে পিতা বলার শিক্ষা দিয়ে সাক্ষাৎ ভালবাসার দিকে ইঙ্গিত করেছে, এর উত্তর হলো, এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ইঞ্জিলগুলোতে দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে যিশুখৃষ্ট খোদার পুত্র শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহার করেছেন : (১) প্রথমত যিশুখৃষ্টের সময়ে এটি এক পুরাতন রীতি ছিল, যে ব্যক্তি দয়া ও পুণ্যের কাজ করতো এবং মানুষের প্রতি বদন্যতা ও সৌজন্য এবং পরোপকার মূলক আচরণ করতো, সে প্রকাশ্যভাবে বলতো, "আমি খোদার পুত্র"। এ শব্দটির দ্বারা তার উদ্দেশ্য হতো, খোদা যেমন সৎ ও অসৎ উভয়ের প্রতি দয়া করে থাকেন এবং তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও বৃষ্টি বর্ষা দিয়ে ভাল-মন্দ সবাই উপকৃত হয়ে থাকে, তেমনি সাধরণভাবে পুণ্য করা তার স্বভাব। কিন্তু পার্থক্য শুধু এটুকু যে খোদা তো এসব কাজে বৃহৎ এবং সে হচ্ছে ক্ষুদ্র। অতএব ইঞ্জিলও এ দিক দিয়ে খোদাকে পিতা হিসেবে সাব্যস্ত করে অর্থাৎ তিনি বড় বলে তাঁকে পিতা হিসেবে এবং অন্যদেরকে

ক্ষুদ্র মনে করে পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে। কিন্তু মূলত খোদার সমতুল্যই করলো। অর্থাৎ পরিমাণে কম বা বেশি মেনে নিল কিন্তু গুণে পিতা-পুত্র একই রকম থাকলো। বস্তুত এটি ছিল গোপন শির্ক। এ কারণেই পূর্ণাঙ্গীণ কিতাব তথা কুরআন করীম এ ধরণের বাগধারাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। ইহুদীদের মাঝে তাদের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা বৈধ ছিল এবং তাদেরই অনুকরণে যিশু তাঁর কথাবার্তায় এটি ধারণ করেছেন। সুতরাং ইঞ্জিলের অধিকাংশ জায়াগায় এ ধরণের ইঙ্গিতই দেখতে পাওয়া যায় :–'খোদার ন্যায় দয়া কর, খোদার মত শত্রুদের সাথেও তেমনই সদ্ব্যবহার করবে যেমনটি তিনি বান্দাদের সাথে করেন এমনটি করলে তোমরা খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত হবে, কারণ তোমাদের কাজ তাঁর কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।' পার্থক্য মাত্র এটুকুই যে তিনি হলেন পিতা খোদা হিসেবে বড় এবং তোমরা পুত্র হিসেবে ছোট (খোদা) সাব্যস্ত হলে। অতএব এ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের কিতাবাদি থেকে গৃহীত। এ কারণেই এখনও ইহুদীদের আপত্তি যে, এটা চুরি ও অপহরণ বটে। বাইবেল থেকে চুরি করে এসব কথা ইঞ্জিলে লিখে দেয়া হয়েছে। মোট কথা এ শিক্ষা একে তো ত্রুটিযুক্ত। দ্বিতীয়ত এ ধরণের পুত্রের সাক্ষাৎ ভালবাসার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

(২) দ্বিতীয় ধরণের পুত্র সম্পর্কে ইঞ্জিলে একটা অহেতুক বর্ণনা রয়েছে। যেমন যোহন : ১০ অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে রয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত পাঠে পুত্র তো এক দিকে থাক, যে যতো দূর্বৃত্তই হোক সবাইকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে। আর এর যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে একথা পেশ করা হয়েছে যে শাস্ত্রীয় লিখনসমূহ কখনও বাতিল হওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা, ইঞ্জিল ব্যক্তিবিশেষের অনুকরণে নিজ জাতির একটি প্রসিদ্ধ শব্দ গ্রহণ করে নিয়েছে। তা ছাড়াও খোদাকে পিতা বলে আখ্যা দেয়াটা স্বয়ং ভ্রান্ত ও অসত্য। তার চেয়ে বড় অজ্ঞ, অর্বাচিন ও বে-আদব আর কে হবে যে কিনা পিতা শব্দটি খোদা তাআলার দিকে আরোপ করে। সুতরাং আমরা এ আলোচনাটি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে **"মিনানুর রহমান"** পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি। এর দ্বারা আপনাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হবে যে খোদা তাআলার প্রতি পিতা শব্দ প্রয়োগ করাটা অত্যন্ত নোংরা ও নাপাক একটি রীতি। এ কারণেই কুরআন করীম বুঝাবার জন্য এমনটি তো বলেছে যে খোদা তাআলাকে সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা বাপ-দাদাদের স্মরণ করে থাক কিন্তু এটা কোথাও বলেনি যে প্রকৃতপক্ষেই খোদা তাআলাকে পিতা বলে মনে করো।

ইঞ্জিলে আর একটি ত্রুটি হলো, এ শিক্ষা ইঞ্জিলে কোথাও দেয় নি যে ইবাদত করার সময় এর সবচেয়ে উত্তম রীতি ও পদ্ধতি হলো, প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থাবলীকে

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হোক বরং ইঞ্জিলে কোন কিছুর শিক্ষা দিয়ে থাকলে কেবল রুটি বা খাবার চাওয়ার দোয়াই শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন করীম তো আমাদেরকে এ দোয়া শিখিয়েছে : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ **"ইহ্দিনাস্ সিরা-তাল্ মুস্তাকীমা সিরা-তাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম"** (সূরা ফাতিহা : ৬,৭) অর্থাৎ 'আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত কর যা নবীদের ও সিদ্দিকদের এবং আল্লাহ্র প্রেমিকদের পথ'। কিন্তু ইঞ্জিল এ শিক্ষা দিয়েছে : 'আমাদের প্রাত্যহিক রুটি আজ আমাদেরকে দান কর।' আমরা গোটা ইঞ্জিল পড়ে দেখেছি এতে উত্তম শিক্ষার নাম গন্ধ নেই।

**পঞ্চম আপত্তি :** 'এক অচেনা নারীর ওপর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহেবের দৃষ্টি পড়লে ঘরে এসে তিনি তাঁর স্ত্রী সওদার সাথে সহবাস করেন। অতএব যিনি অচেনা নারীকে দেখে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে পারেন না তিনি কি করে পূর্ণতম মানব হতে পারেন?'

**উত্তর :** আপত্তিকারী যে হাদীসটির উল্টো অর্থ ধরে নিয়েছেন সেটি সহী মুসলিমে নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে : **"আন জাবিরিন আন্না রাসূলাল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা রায়া ইম্রাতান ফাআতা- ইমরায়াতাহু যাইনাবা ওয়া হিয়া তাম্'আসু মানিয়াতাল্ লাহা ফাকাযা- হা-জাতাহু।"** হাদীসটিতে সওদা (রা.)-এর কোথাও উল্লেখ নেই। আর হাদীসটির অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। এরপর তাঁর স্ত্রী (হযরত) যায়নাব (রা.)-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন চামড়ায় পালিশ করছিলেন। অতএব আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন।' এবার লক্ষ্য করুন হাদীসটিতে এ কথার নাম-চিহ্নও নেই যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে মহিলাটির রূপ পছন্দ হয়েছিল। বরং এ বিষয়েরও উল্লেখ নেই যে সে মহিলাটি যুবতী ছিল, না বৃদ্ধা। আর এ-ও প্রমাণিত হয় না যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন। হাদীসের শব্দগুলো শুধু এটুকুই রয়েছে : 'তিনি তাঁর প্রয়োজন পুরা করলেন'। বস্তুত 'কাযা হাজাতাহু' শব্দগুচ্ছ আরবী ভাষায় বা অভিধানে 'স্ত্রী-সহবাস' অর্থে নির্দিষ্ট নয়। 'কাযায়ে হাজত' সৌচকর্মকেও বলে এবং আরও কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি কোথাথেকে জানা গেল যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন? একটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত শব্দকে একটি বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করা প্রকাশ্যভাবে দুষ্টোমি বৈ কিছু নয়। তা ছাড়াও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জবানিতে এ কথা বর্ণিত নেই : 'আমি একজন মহিলাকে

দেখে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করি।' প্রকৃত বিষয় কেবল এটুকুই যে সহী মুসলিমে (হযরত) জাবের থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যার অনুবাদ হচ্ছে, 'তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন মেয়ে লোক দেখে এবং সে তার দৃষ্টিতে রূপসী বলে মনে হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে এসে তার পক্ষে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে নেওয়া শ্রেয় হবে যাতে কোন মন্দ চিন্তা অন্তরে দানা বাঁধতে না পারে এবং পূর্ব সতর্কতামূলকভাবে প্রতিকার হয়ে যায়। তাই সম্ভবত কোন সাহাবী হাদীসটি শোনার পর দেখে থাকবেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কখনও চলার পথে কোন যুবতী মেয়ে লোক সামনে পড়েছিলো। এরপর সে সাহাবী হয়তো এ-ও অভিহিত হয়ে থাকবেন যে এর নিকটবর্তী সময়েই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘটনাচক্রে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। এতে করে সে সাহাবী এই কাকতলীয় ঘটনার বিষয়ে নিজের ইজতিহাদ (তথা স্বকীয় চিন্তাভাবনা) থেকে নিজের খেয়াল খুশীমত এমনটি বুঝে নিয়েছিলেন যে উক্ত হাদীস অনুযায়ী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেও আমল করেছিলেন।

তবুও যদি সাহাবীর সে উক্তিটি সঠিক ছিল বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলে এথেকে কোন বিরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা কোন বদ ও খবীস ব্যক্তির কাজ বলে প্রতীয়মান হবে। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এ বিষয়ে অতি লালায়িত হয়ে থাকেন যেন প্রত্যেক পুণ্য ও তাক্‌ওয়ার এমন কাজকে কার্যকরী দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেন। তাই অনেক সময় তাঁরা নমনীয়ভাবে তাক্‌ওয়ার কাজও করে থাকেন যাতে কেবল 'আমলি' দৃষ্টান্ত তুলে ধরাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এর মোটেও কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের দর্পণে এ বিষয়টি জীবজন্তুদের মাঝেও দেখতে পাই যেমন একটা মুরগী তার ছানাগুলোকে শিখাবার উদ্দেশ্যে কেবল কৃত্রিমভাবে নিজের ঠোঁট দিয়ে শস্য দানাগুলোকে ঠোকর দিতে থাকে যে এভাবে মাটি থেকে দানা তুলতে হয়। অতএব আমলি দৃষ্টান্ত দেখানো পূর্ণ ও পরিণত ঐশী শিক্ষকদের পক্ষে জরুরী হয়ে থাকে এবং এই ঐশী শিক্ষকের এ ধরণের কোন কাজ তার অন্তরের অবস্থার মানানুগ হয় না। তাছাড়া একজন সুন্দরকে হঠাৎ তার ওপর নজর পড়ায় সুন্দর বলে মনে করা মৌলিকভাবে কোন দোষনীয় বিষয় নয়। তবে (সম্ভাব্য) মন্দ চিন্তভাবনা পরিপূর্ণ পবিত্রতার পরিপন্থী। কিন্তু যে-ব্যক্তি আগাম সতর্কতা স্বরূপ মন্দচিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে পদচারণা করে তা কি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা বিরোধী হবে? বস্তুত কুরআন করীমের এ শিক্ষাই অতি উত্তম :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "**ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহে আত্কা-কুম**" (আল হুজুরাত : ১৪) অর্থাৎ যত বেশি কেউ তাক্ওয়ার সূক্ষ্ম পাথ অবলম্বন করে তত বেশি খোদা তাআলার কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কাজেই মন্দ চিন্তার উদ্ভবের আগেই সতর্কতামূলকভাবে নিরাপদ থাকার তদ্বির করা নি:সন্দেহে তাকওয়ার এক উচ্চ স্তর বটে।

যদি দাবী করা হয় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভকারীগণ সর্বাবস্থায় মন্দ চিন্তা-ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকেন, তাদের কোন চেষ্টা-তদ্বিরের প্রয়োজন নেই– এ দাবী সর্বতোভাবে নির্বুদ্ধিতা এবং ঐশীতত্ত্বজ্ঞানের ত্রুটির কারণেই হয়ে থাকবে। কেননা নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) কোন পাপ এবং অবাধ্যতায় এক মুহূর্তের জন্যও অন্তরে সংকল্পবদ্ধ হতে পারেন না। আর এমনটি করা তাদের পক্ষে 'কবীরা গোনাহ' তুল্য। কিন্তু মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতাগুলো নিজ গুণ ও বৈশিষ্টসমূহের বহির্প্রকাশ এ ক্ষেত্রেও দেখাতে পারে যদিও নবীদেরকে মন্দ চিন্তাভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হয়েছে। যেমন একজন নবী যদি ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হন এবং চলার পথে তিনি ফলে ভরপুর কিছু ফলন্ত গাছ দেখতে পান তাহলে এটা তো আমরা স্বীকার করি যে তিনি মালিকের অনুমতি ছাড়াই ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না বরং অন্তরেও সে সব ফল পাড়ার জন্য সংকল্প গ্রহণ করবেন না কিন্তু তাঁর মনে এ চিন্তা আসতে পারে, এ ফল যদি তাঁর স্বত্তাধিকারভুক্ত হতো তাহলে তিনি এগুলো খেতে পারতেন। আর এমন চিন্তাভাবনা (সিদ্ধিলাভে) পরিপূর্ণতার পরিপন্থী নয়। আপনার স্মরণ থাকবে, আপনার খোদা সাহেব সামান্য ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ফলন্ত ডুমুর গাছের দিকে ছুটে গিয়ে ছিলেন। আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে ওই গাছগুলো তাঁর বা তাঁর পিতা মহোদয়ের স্বত্বাধিকারভুক্ত ছিল? কাজেই যে ব্যক্তি পরের গাছ দেখে নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে পারলেন না এবং পেটে ভেটদানের জন্য সে দিকে দৌড়ে গেলেন, তিনি খোদা কেন বরং আপনার উক্তি অনুযায়ী তিনি তো একজন পূর্ণমানবও নন বলেই সাব্যস্ত হন।

মোট কথা, কারও মনে এ খেয়াল আসা যে এ জিনিসটি সুন্দর–এটা একটি আলাদা বিষয়। যাকে খোদা চোখ দিয়েছেন সে যেমন কাঁটা এবং ফুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তেমনি সে সুন্দর ও অসুন্দরের মাঝেও পার্থক্য করতে পারে। আপনার খোদা সাহেবকে সম্ভবত প্রকৃতির পক্ষ থেকে এ পার্থক্যকরণ শক্তি দান করা হয় নি কিন্তু পেটপুর্তির লিপ্সার জ্বালা নিবারণের জন্য তো ডুমুর গাছের দিকে ছুটে গেলেন এবং কার এ ডুমুর গাছ এটাও চিন্তা করলেন না।

অদ্ভুত ব্যাপার যে একজন 'মদ্য পায়ী ও ভোজন রসিক'-কে যৌনতা রসিক বলা যায় না কিন্তু সেই পূত-পবিত্র ব্যক্তি যাঁর জীবন এবং যার প্রতিটি কাজ খোদার জন্য ছিল তাঁকে এ যুগের পঙ্কীল চিত্ত লোকদের 'যৌনতা রসিক' আখ্যা দেয়াটা বস্তুত এজন্য যে অদ্ভুত রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন এ যুগ! ইসলামে সর্বোত্তম শিক্ষার এটা এক নমুনা : 'জেনে শুনে কখনও কোন নারীর দিকে তাকিয়ে দেখবে না। কেননা এটা ললুপ দৃষ্টির সূচনার কারণ। আর যদি ঘটনা চক্রে কোন সুন্দরী নারীর ওপর নজর পড়ে এবং তাকে সুন্দরী বলে মনে হয় তাহলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের মাধ্যমে ঐ খেয়াল মন থেকে সরিয়ে দাও।' ভালভাবে স্মরণ রাখবেন, এ শিক্ষা ও নির্দেশ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা স্বরূপ বটে। যে-ব্যক্তি দৃষ্টান্তস্থলে কলেরার দিনগুলোতে কলেরা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলকভাবে কোন (প্রতিষেধক) ওষুধ ব্যবহার করে তার সম্পর্কে এটা কি বলা যায় যে তার কলেরা হয়েছে অথবা কলেরার লক্ষণ তার মাঝে দেখা দিয়েছে? বরং এটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে গণ্য হবে যে সে এই রোগের প্রতি স্বভাবত ঘৃণা রাখে এবং এ থেকে দূরে থাকতে চায়। তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা আত্মিক পরিপূর্ণতা ও নৈতিক উৎকর্ষের পরিপন্থী–এ কথায় আপনার সাথে কেউ-ই ঐকমত্য পোষণ করবে না। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) যদি তাক্ওয়ার নমুনা না দেখান তাহলে অন্য কে দেখাবে? যে ব্যক্তি খোদাভীরুতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রণী হয়ে থাকেন তিনিই সবার চেয়ে বেশি তাক্ওয়াও অবলম্বন করেন। তিনি পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তিনি সেই সব পথ পরিহার করেন যেগুলোতে পাপের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আপনার যিশু সাহেব সম্পর্কে কী বলি আর কী বা লিখি এবং তাঁর অবস্থা দেখে আর কত দিনই বা কাঁদি? এটা কি সমীচীন ছিল, (ইঞ্জিলের বিবরণ অনুযয়ী–অনুবাদ) তিনি এক ভেবিচারিনী মহিলাকে সুযোগ দিতেন যে সে ভর যৌবনে রূপসী অবস্থায় খোলা মাথায় কেশ ছড়িয়ে তাঁর সাথে জড়িয়ে বসতো এবং অত্যন্ত ফষ্টি-নষ্টির মাধ্যমে তাঁর পদযুগলে তার কেশ এলিয়ে দিতো এবং কুকর্মের দ্বারা উপার্জিত আতর দিয়ে তাঁর মাথা মালিশ করতো? যিশুর অন্তর যদি কুচিন্তা মুক্ত ও পবিত্র হতো, তাহলে তিনি এক যৌনকর্মী নারীকে কাছে ভিড়তে অবশ্যই নিষেধ করতেন। কিন্তু যে সব লোক কুকর্মকারিনী নারীদের ছুঁয়ে পুলকিত হয় এবং মজা পায়, তারা এমন কুরুচিমূলক উপলক্ষের সময় কোন উপদেশদাতার উপদেশেও কান দেয় না। লক্ষ্য করুন, যিশুকে একজন আত্মাভিমানী বুযুর্গ ব্যক্তি উপদেশের অভিপ্রায়ে বাধা দিতে চাইলেন : 'এমনটি করা সমীচীন নয়।' কিন্তু যিশু তার

চেহারায় ফুটে ওঠা বিরূপ ভাব দেখে বুঝে গেলেন; সে ব্যক্তি তাঁর এ কাজে অসন্তুষ্ট। তখন তিনি অসৎকর্মে লিপ্ত মাতালদের ন্যায় সেই অভিযোগটি কথায় কথায় এড়িয়ে গিয়ে দাবী করলেন, 'এই বেশ্যানারী বড়ই নিষ্ঠাবতী। এরকম নিষ্ঠা তোমার মধ্যেও দেখা যায়নি।' সুবহানাল্লাহ্! কী উত্তম জবাব! যিশু সাহেব একজন ভেবিচারিনীর প্রশংসা করছেন, 'এ তো বড়ই নেক বখ্‌ত–সৌভাগ্যবতী মহিলা!' খোদা হওয়ার দাবী আর এ ধরণের কার্যকলাপ!! যে ব্যক্তি সব সময় মদে বুঁদ হয়ে থাকে এবং কাঞ্চিনীদের সাথে মেলা মেশা বজায় রাখে এবং খানা-পিনায়ও এমন প্রথম নাম্বারের যে লোকজনের মাঝে 'ভোজন রসিক' বলে তার নাম পড়ে যায়, তার কাছ থেকে আবার কি রকম তাক্‌ওয়া ও সদাচরণের আশা করা যেতে পারে?! আমাদের মনিব ও অভিভাবক আফযালুল আম্বিয়া খাইরুল আসফিয়া (–নবী শ্রেষ্ঠ পবিত্রদের শিরোমণি) মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর তাক্‌ওয়া লক্ষ্য করুন, তিনি সেই মহিলাদের হাতেও হাত মিলাতেন না যারা সতী সাধ্বী ও সদাচারিনী হতেন এবং বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতেন। বরং তাদের দূরে বসিয়ে কেবল মৌখিকভাবে তওবার সদোপদেশ দিতেন। কিন্তু কোন্ বুদ্ধিমান ও তাক্‌ওয়াপরায়ণ মানুষ এমন ধরণের ব্যক্তিকে পবিত্রচেতা মনে করে নেবে যিনি যুবতী নারীদের সংস্পর্শকে পরিহার করেন না? একজন নষ্টা সুন্দরী মহিলা এত নিকটে বসেছে যেন বগলের সঙ্গে ঘেঁসে রয়েছে–কখনও হাত লম্বা করে (যিশুর) মাথায় আতর মলে, কখনও পা ধরে আর কখনও তার মনোরম ও কালো চুল পায়ের ওপরে মেলে দেয় এবং কোলে তামাশা করতে থাকে। আর এই যিশু সাহেব উক্ত অবস্থায় আত্মবিভোর হয়ে বসে আছেন এবং কেউ অভিযোগ ও আপত্তি করলে তাকে বকাঝকা করেন। আরও অদ্ভূত ব্যাপার হলো, তাঁর নিজেরও বয়স তখন পূর্ণ যৌবন কাল এবং তার মদপান করার অভ্যাস রয়েছে তদুপরি তিনি অবিবাহিত (কুমার) এবং একজন রূপসী যৌনকর্মী মেয়েছেলে তাঁর সামনে পড়ে আছে, শরীরের সাথে শরীর স্পর্শ করে যাচ্ছে–এসব কি পুণ্যবান মানুষের কাজ? এর কী প্রমাণ যে সেই যৌনকর্মী নারীর স্পর্শে যিশুর যৌনশক্তি আলোড়িত হয় নি? আফসোস, যিশুর এমনটিরও সুযোগ-সামর্থ্য ছিল না যে সেই পাপাচারিনীর ওপর নজর পড়ার পর নিজের কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নিতেন। হতবাগিনী বেভিচারিনীর স্পর্শ ও ফষ্টি-নষ্টির কারণে কত না (যিশুর মাঝে) কুপ্রবৃত্তিমূলক স্বভাবজ অনুভূতি ও যৌন উত্তেজনার উদ্ভব ঘটে থাকবে। এ কারণেই যিশুর মুখ দিয়ে এ বাক্যটুকুও বেরুলো না: 'হে কুকর্মী মহিলা, আমার কাছ থেকে দূরে থাক।" উল্লেখ্য যে সে

মহিলাটি কাঞ্চিনীদের অন্তর্ভুক্ত এবং ভেবিচারের জন্য সারা শহরে বিখ্যাত ছিল–এ বিষয়টি ইঞ্জিল থেকে সপ্রমাণিত।

**সপ্তম আপত্তি :** 'মুত্ আ'কে বৈধ করা। এরপর আবার এটাকে নিষিদ্ধ করা।

**উত্তর :** অজ্ঞ খৃষ্টানদের জানা নেই, ইসলাম 'মুত্আ'কে রেওয়াজ দেয় নি বরং যথাসম্ভব এটাকে দুনিয়া থেকে হ্রাস (বিলোপ সাধন) করেছে। ইসলামের বহু আগে থেকে কেবল আরব দেশেই নয় বরং দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মাঝে মুতআর প্রথাটি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত বিবাহ করা; এরপর তালাক দিয়ে দেওয়া। এ প্রথাটিকে বিস্তারদানকারী কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ এ-ও ছিল, যেসব লোক সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়ে অন্যান্য দেশে যেতো অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এক দীর্ঘ সময় অন্যান্য দেশে বাস করতো তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'বিবাহ' অর্থাৎ মুতআর আবশ্যক হতো। আর কখনও এ কারণটিও ঘটতো যে ভিন দেশের নারীরা আগেই জানিয়ে দিতো, তারা সঙ্গে যেতে রাজী নয়। কাজেই এ উদ্দেশ্যেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো যে অমুক তারিখে তালাক দেয়া হবে। অতএব এটা সত্য যে একবার কি দুবার এই পুরাতন প্রথাটি কিছু সংখ্যক মুসলমানও অনুসরণ করেছিলেন[৩৪], কিন্তু 'ওয়াহী'-এর অনুসাশনে নয় বরং জাতির মাঝে যে পুরাতন প্রথা প্রচলিত ছিল সেটিকে সাধারণভাবে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু মুতআতে এছাড়া অন্য কোন ব্যাপার ছিল না যে এটি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধন (বা চুক্তিবিশেষ) হয়ে থাকে। আর 'ওয়াহী ইলাহী' (ঐশীবাণী) পরিশেষে এটা হারাম করে দেয়। সুতরাং আমরা সুরমা শেষে 'আরিয়া' পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, খৃষ্টানরা কেন (আপত্তি হিসেবে) মুত্আর কথা তুলে, যা কেবল নির্দিষ্ট সময়মূলক বিবাহ? তারা নিজেদের যিশুর আচার-আচরণের দিকে কেন লক্ষ্য করে না যে তিনি এমন যুবতী নারীদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ তাঁর পক্ষে যথার্থ ছিল না। একজন বাজারী মহিলার সাথে এক সঙ্গে ওঠাবসা করাটা কি তাঁর পক্ষে বৈধ ছিল? হায় আফসোস, তিনি যদি মুত্আ অবলম্বীই হতেন তাহলে এই সব (অবাঞ্ছিত) কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পেয়ে যেতেন। যিশুর বুযুর্গ দাদী-নানীরা কি মুত্আ করেছিলেন, নাকি খোলাখুলি বেভিচার ছিল? আমরা খৃষ্টান মহোদয়দের জিজ্ঞেস করছি, যে ধর্মে মুত্আ' অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময়ের বিবাহও বৈধ নয় এবং দ্বিতীয় বিবাহও বৈধ নয় সে-ধর্মের

৩৪. এ কর্মটি ছিল বাধ্যবাধকতা ও নিরূপায়তার সময়ের। যেমন ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তি মৃত জীবের মাংস খায়।

সেনাবাহিনীর লোক যারা শরীরিক শক্তির সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার কারণে কুমার জীবন যাপন করতে পারে না! তারা উত্তম থেকেও উত্তম খাবার খায় যাতে করে সৈনিক সুলভ কার্যাদি সাধনে তৎপর, চৌকুস ও সতেজ থাকতে পারে যেমন ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীগুলো রয়েছে–তারা কী করে পাপকর্ম থেকে নিজেদের রক্ষা করবে? সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইঞ্জিলে কী কানুন রয়েছে? যদি কোন কানুন ছিল এবং ইঞ্জিলে যদি এমন অবিবাহিত একা জীবন যাপনকারীদের জন্য কোন প্রতিকার-ব্যবস্থার কথা লেখা ছিল তাহলে কেন আবার ইংরেজ সরকার সেনানিবাস এ্যাক্ট নাম্বার ১৩, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তন করে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যাতে ইংরেজ সৈনিকেরা বেভিচারিনী নষ্টা নারীদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজেরা নষ্ট হতে পারে? অবশেষে এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ স্যার জর্জ রাইট অধীনস্ত প্রশাসক কর্মকর্তাদেরকে আহ্বানের মাধ্যমে প্রবুদ্ধ করেছেন যাতে করে এমন সুন্দরী ও যুবতী নারীদেরকে গোরা সৈনিকদের বেভিচারের জন্য সরবরাহ করা হয়। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এমন প্রয়োজনের সময়ে যারা প্রশাসক কর্মকর্তাদেরকে এই সব লজ্জাজনক প্রস্তাবাবলীর জন্য বাধ্য করেছিলেন, ইঞ্জিলে কোন ব্যবস্থাপত্র থাকলে তারা কখনও সেই (ইঞ্জিল বর্ণিত) বৈধ ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে নোংরা পন্থাগুলোকে নিজেদের বীর সৈনিকদের মাঝে বিস্তার দিতেন না। ইসলামে বহুবিবাহের বরকত ও কল্যাণসমূহ প্রত্যেক যুগে সুলতান ও বাদশাহ্ এবং শাসকদেরকে এইসব পঙ্কিল কৌশল থেকে রক্ষা করেছে। ইসলামী সৈনিক বিবাহের মাধ্যমে নিজেদেরকে নিষিদ্ধ কুকর্ম থেকে রক্ষা করে থাকে। কুকর্ম থেকে সুরক্ষার জন্য ইঞ্জিলে বর্ণিত কোন গোপন তদ্বির ও কৌশলের কথা পাদ্রী সাহেবদের স্মরণে থাকলে সে ব্যবস্থাটির মাধ্যমে উল্লেখিত কুপন্থা অবলম্বনে সরকারকে বাধা দিন। কেননা 'টাইমস্' পত্রিকা এখন জোরে শোরে এই কানুনকে পুনরায় জারি করার জন্য সরকারের পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করেছে। এসব কথা এ বিষয়েরই সাক্ষ্য দেয় যে ইঞ্জিলের শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে কৃষ্টি ও সভ্যতার সব দিকে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হয়নি। আগামীতে বাকী অংশ ইনশাআল্লাহ্।[৩৫]

বিনীত লেখক

**মির্যা গোলাম আহমদ**

৩৫. নূরুল কুরআন, ২য় খন্ড-রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০২-৪৫২।

## পত্র নম্বর ১১

আমার মেহেরবান পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্ সাহেব।

যথাযথ সম্ভাষণের পর। আপনার পত্রটি পেয়েছি। আপনি যদি হাজার টাকা প্রাপ্তির কোন দৃষ্টান্ত উদ্ভাবন করে থাকেন তাহলে খুব ভাল কথা। কিন্তু সবচে' ভাল হবে, আপনি এমন উত্তম ও উচ্চমানের বই-পুস্তকের উদ্ধৃতির মাধ্যমে কোন প্রচারপত্র আমার নামে প্রকাশ করে দিন এবং আপনার চিঠিতে যে বিষয়বস্তু লিখেছেন সেটিই এতে লিখে দিন।

প্রচারপত্র না হোক, 'নূর আফশাঁ' পত্রিকায় প্রকাশ করুন। আপনি জানেন, আমি কোন হাতে লেখা চিঠি আপনার কাছে পাঠাইনি। বরং এক হাজার রুপী (পুরস্কারের) মুদ্রিত প্রচারপত্র পাঠিয়েছি। এ পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দিতার পদ্ধতি এটাই যে, আমি যেমন একটি দাবী জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছি এবং প্রত্যেককে এতে দৃষ্টি দেয়ার ও চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিয়েছি, আপনিও তদ্রূপই করুন। আর সেসব গ্রন্থ যা আপনার জানামতে নির্ভরযোগ্য এবং যেগুলোর ওপর বিশেষজ্ঞগণ বিরূপ সমালোচনা করেন নি এবং যেগুলোকে মিথ্যা ও জাল বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত সাব্যস্ত করেন নি, সেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান উল্লেখ করুন। এতে আপনার অনেক সুখ্যাতি হবে। কেননা আমি যখন (আপনার) এ প্ররোচনার মূলোৎপাটনের জন্য প্রতি উত্তর প্রকাশ করবো এবং তা জনগণের দৃষ্টিতে তুচ্ছ সাব্যস্ত হবে, তখন প্রকারন্তরে জনগণ আপনার এক হাজার টাকা পাওয়ার পক্ষে রায় দিয়ে দিবে। এতে করে প্রত্যেকের দৃষ্টিতে আপনি হাজার টাকার ন্যায্য প্রাপক হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আর উক্ত টাকা আমাকে দিতে হবে। অধিকন্তু এভাবে এটাও সুনিশ্চিত যে আপনার এ যুদ্ধ জয়ের পর কিছু পদোন্নতিও অবশ্যই হবে। কেননা আপনি যখন যীশু সাহেবের সম্মান সাব্যস্ত করবেন তখন মানুষ অবশ্যই আপনাকে সম্মান করবে। (তবে) আমার দৃষ্টিতে (যীশুর) হাজতে থাকা ও নিতম্বে চাবুক খাওয়া ছাড়া ইঞ্জিল থেকে আর কিছু প্রমাণিত হয় না। এরই নাম যদি সম্মান হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে যুগের বিধর্মী শাসকরা যীশুকে বিরাট সম্মান দিয়েছেন (বলে প্রতীয়মান হয়)! যা হোক, প্রথমত যে চিঠি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেটি ছেপে দিন। তবে শীঘ্র ছাপুন এবং এক কপি আমার নামে পাঠিয়ে দিন। এরপর আপনি দেখতে পাবেন, কিরূপ আমি এসব সনদের গ্রহণযোগ্যতা এবং যীশু সাহেবের সম্মান প্রমাণিত করি! আপনি এ-ও লিখেছেন যে 'নূরুল কুরআন' পুস্তকে আপনাকে গালি দেয়া হয়েছে। আপনি স্মরণ রাখুন,

গালমন্দ দেয়া, মানহানি করা ও মিথ্যা দোষারোপ করা– এ সব কিছুর ভাগী হয়ে গেছেন এ যুগের পাদ্রী সাহেবরা। কোন্ গালিটাইবা আছে আপনারা আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেন নি? কী অপমান ও মানহানিই বা আছে যা আপনারা এই আলী জনাবের করেন নি? একটি বা দু'টি নয়, বরং হাজার হাজার বই- পুস্তক আপনাদের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যা গালিগালাজে ভরে রয়েছে। সে শব্দগুলোই যদি আপনাদের বাবা, মা কিংবা যীশুর সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়, আপনারা কি তা সহ্য করতে পারবেন? আমাদের হৃদয় ব্যথা-বেদনায় এরূপ জর্জরিত করেছেন, জগতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা মৃত ব্যক্তির উপাসনাজনিত দুর্ভাগ্য যে আপনাদের অন্তর থেকে সত্যপরায়ণতার জ্যোতি একেবারে উধাও হয়ে গেছে। প্রতিটি প্রশ্ন দুষ্টামি ও শয়তানির সাথে মিশিয়ে বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেক আপত্তির মাঝে মিথ্যা দোষারোপের মেশাল দিয়ে রঙ দেয়া হয়। প্রত্যেক কথা হাসি-বিদ্রূপে মিশ্রিত হয়ে থাকে। একি ভাল লোকদের কাজ? অতএব যে অবস্থায় আপনারা সেই আলী জনাবের (সা.) সম্মান করেন না যাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সম্মান দান করেছেন এবং যাঁর দোরগোড়ায় পঁচানব্বই কোটি মানুষ মাথানত করে (নতুন গবেষনায় বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের সংখ্যা ৯৫ কোটি সাব্যস্ত হয়েছে)* । সে অবস্থায় আপনারা আমাদের কাছ থেকে আবার কী সম্মান আশা করেন? আমরা বহুভাবে যথেষ্ট চেষ্টার মাধ্যমে চেয়েছি, আপনারা যেন ভদ্রোচিত আচরণ প্রদর্শন করেন। যাতে আমরাও ভদ্রোচিত আচরণ দেখাই। কিন্তু আপনারা তদ্রূপ করতে চান না। এটা কি সত্য নয়, যেসব আপত্তি আপনারা ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে উপস্থাপন করতে পারেন সেগুলো আপনারা অপমান, ঘৃণা ও তুচ্ছতা ভরে পেশ করেন? যেমন, হযরত যয়নাবের (রা.) বৃত্তান্তে যে পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনাদের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক, আর এ আপত্তিটি মনে দুঃখ দেয়ার জন্য অপমান, ঘৃণা ও তুচ্ছাকারে উপস্থাপন করেন। তা না করে আপনারা আপনাদের অন্তর থেকে সত্যান্বেষী ও প্রকৃত শিষ্টভাষী হলে ভদ্রতার সাথে আপত্তিটি এভাবে তুলে ধরতে পারেন, 'আমাদের তাওরাত ও ইঞ্জিল অনুযায়ী পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পুত্র বললে কিংবা কোন মহিলাকে কন্যা বলা হলে সে ব্যক্তির (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রী হারাম হয়ে যায় এবং সে মহিলাকে বিয়ে করাও হারাম হয়ে যায় অথবা বিয়ে করলে সে ক্ষেত্রে তালাক প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তদুপরি যুক্তিগত দিক দিয়ে অমুক-অমুক

* ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান- অনুবাদক

যুক্তি প্রমাণে পোষ্যপুত্র ঔরসজাত পুত্রতুল্য হয়ে যায় বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ইসলাম পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে তার তালাক হয়ে গেলে বিয়ে করা বৈধ রেখেছে। তাহলে এ ধরনের আপত্তি করায় কোনো মুসলমান নারাজ (মনঃক্ষুণ্ন) হবে না অথবা দৃষ্টান্তস্থলে বহুবিবাহের বিপক্ষে আপনারা আপত্তি উত্থাপন করুন এবং নম্রভাবে প্রমাণ হিসেবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের শ্লোকসমূহ উপস্থাপন করে বলুন, এসব কিতাবে স্পষ্ট লিখা আছে, একাধিক বিয়ে করা হারাম এবং যে ব্যক্তি এমনটি করে সে ব্যভিচার করে। আর যুক্তিগত দিক দিয়েও দ্বিতীয় বিয়ের কোন প্রয়োজন প্রতীয়মান হয় না। অতএব এরকম আপত্তির দরুন কেইবা নারাজ হতে পারে? খোদা তাআলা যদি এই 'আখলাক' (নৈতিকতা) অবলম্বনের সৌভাগ্য আপনাদের দান করেন তাহলে আমরা শিশুদের মত স্নেহ-মমতা ও দয়া-মায়ার সাথে আপনাদের শিক্ষা দিতে পারি এবং ভালবাসা ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ে আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি। কিন্তু আপনারা তো হিংস্র জন্তুদের মত আমাদের আক্রমণ করেন। তখন অবশেষে আমরা ক্রোধজনিত উত্তেজনায় নয় বরং শালীনতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষার প্রয়োগ করি। তবে আপনারা যদি নৈতিকতাসূলভ আচরণ দেখাতে ও পশুত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হন, তাহলে আমরাও ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্মান প্রদর্শন করতে প্রস্তুত রয়েছি। নচেৎ আপনাদের অভিরুচি। নিশ্চয় সেই এক যুগ ছিল যখন আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন তবে এখন সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন ত্রিত্ববাদ ক্রুশবিদ্ধ হবে এবং তওরাতের মর্মানুযায়ী একে 'কাষ্ঠে' চড়ানো হবে। 'ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' (যে হেদায়াতের অনুসারী হয় তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। 'নূরুল কুরআনে'র উত্তর শীঘ্র প্রকাশ করুন। এসব আপত্তির কারণেই এ চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠাচ্ছি।[৩৬]

**গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর
১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ

৩৬. আল-হাকাম, ২১ জুন ১৯৩৪, পৃষ্ঠা ২।

## একটি স্মরণীয় পাতা

পাদ্রী লেফরায়-এর লেকচার এবং মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের পক্ষ থেকে বর্ণিত তার লেকচার সম্পর্কে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর একটি স্মরণীয় পাতা–

কাদিয়ান, ২৪ মে (যোহরের পর)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার বিস্তারিত পত্রটি পেলাম। আমীর আলী শাহের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরটি আমাকে, হযরতকে এবং আমাদের জামাতকে যারপর নাই আনন্দিত করেছে। খোদা তাআলা বড়ই ফযল করেছেন। ভাইদের ঐক্য এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সংবাদ দারুণ আনন্দ দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা অবিচল দৃঢ়তা দান করুন।

যোহরের পর মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব লাহোর থেকে এসেছেন এবং আসরের নামায পড়ে ফিরে যাবেন। বিশপ সাহেবের বক্তৃতা এবং নিজের বক্তৃতা সবই শোনালেন। আরও শোনালেন যে সর্বসাধারণ মুসলমানদের ওপর (এর) অত্যন্ত প্রভাব পড়েছে, স্বত:স্ফূর্তভাবে তারা বলতে আরম্ভ করেছে, "মির্যায়ী জিত গায়ে" (আহমদীরা জিতে গেছে)।

তিনি (বিশপ সাহেব) কুরআন করীম দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যেমন কিনা সাধারণত খৃষ্টানরা প্রমাণ করে থাকেন যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেহেতু 'যান্ব-যনূব স্বীকার করেন এবং 'ইস্তেগফার' পড়তে থাকেন–এতে প্রমাণিত হলো যে, তিনি গোনাহগার ছিলেন। মুফতি সাহেব 'যান্ব (ত্রুটি), 'জুর্ম' (অপরাধ) ও 'খাতা' (ভুল-চুক) এবং 'ইসিয়ান' (অবাধ্যতা) আর 'ইস্ম' (পাপ)-এর তাৎপর্য বর্ণনা করেন এবং 'ইস্তেগফারে'র মূলতত্ত্ব বর্ণনা করেন। বিশপ সাহেব তো বিস্মিত হয়ে গেলেন। কেননা এই কাফিররা এসব তত্ত্বকথা না কখনও শুনেছিলেন, না কখনও পড়েছিলেন। মোট কথা, এসব কথার উত্তর দিতে পারলেন না।

আগামী শুক্রবার তিনি 'জিন্দা রাসূল' বিষয়ে লেকচার দেয়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হযরত এখনই কলম ধরে ফেলেছেন এবং জিন্দা রাসূলের ওপর প্রচারপত্র ছাপানোর প্রস্তুতি নিয়েছেন, রাতে রাতেই প্রচার-পত্রটি ছেপে যাক এবং জুমার দিন আসরের সময় যেন বিলি বন্টন হয়ে যায় ঠিক সেই সময়, যখন পাদ্রী

(বিশপ) সাহেবের লেকচার সমাপ্ত হবে।' শহরে সাধারণভাবে উৎসাহ উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে। চুন্নিয়াওয়ালী মসজিদে বিশপের নূতন এ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে–সে দিক দিয়ে যখন মুফতি (মোহাম্মদ সাদেক) সাহেব অতিক্রম করছিলেন–মসজিদে উপস্থিত লোকদেরকে বাবা চাট্টু বললেন, 'এখন যদি (বিশপের সভায়) অন্য মুসলমান কেউ কথা বলে তাহলে হেরে যাবে, আর 'মির্যায়ী' (আহমদী) বল্‌লে জিতে যাবে।' সম্মানিত মুসলমান সুধীগণও সলা-পরামর্শ করেন : 'যা কিছু হোক না কেন, এখন যুদ্ধটা তো হচ্ছে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে–এতে যদি 'মির্যায়ী' বক্তব্য রাখে, তবে জয় হতে পারে। নইলে পরিষ্কার পরাজয় (অবধারিত)। খৃষ্টানরা আমাদের নবী করীম (সা.)-কে মৃত প্রমাণ করবে–এতে আমাদের অপমান বই কি!' মোট কথা, আজ খুবই তৃপ্তি পেলাম। নতুনভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও সত্যতা প্রমাণ হলো।

আফসোস, এ লোকগুলো নিজ মুখে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, আমাদের সিলসিলা যে অস্ত্র বের করেছে এটি ছাড়া খৃষ্টধর্মের খন্ডন করা সম্ভব নয়। এরপরও তারা অস্বীকার করে যাচ্ছেন?!

হযরত আকদাস আজ কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় আত্মাভিমানে বলীয়ান হয়ে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। 'আইয়্যেদাহু তাআলা বিনাসরিহি' (–তার হাতকে আল্লাহ্ নিজ সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করুন)–আব্দুল করীম, কাদিয়ান, ২৪শে মে।*

* আল হাকাম, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৭।

## পত্র নম্বর ১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

# লাহোরের বিশপ সাহেবের সমীপে প্রকৃত এক সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন

আমি শুনেছি, লাহোরের বিশপ সাহেব মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন, তারা চাইলে হযরত ঈসা (আ.)-এর মোকাবেলায় নিজেদের নবী (সা.)-এর নিষ্পাপ হওয়া প্রমাণ করে দেখাতে পারেন। আমার দৃষ্টিতে মহামান্য বিশপ সাহেবের এটি এক অতি উত্তম ইচ্ছা যে এ উভয় নবীর মাঝে কে পবিত্র ও নিষ্পাপ নবী এ বিষয়ের তিনি নিষ্পত্তি করতে চান। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কোন নবীর নিষ্পাপ হওয়া প্রমাণ করায় অর্থাৎ নবীর জীবদ্দশায় কোন গুনাহ্ বা পাপ সংঘটিত হয়নি এটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরায় তার কী উদ্দেশ্য।

আমার দৃষ্টিতে এটা বিতর্কের এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন উত্তম ফলাফল হবে না। কেননা সব জাতির এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত নয় যে অমুক কথা ও কাজ পাপের গন্ডীভুক্ত এবং অমুক কথা ও কাজ পাপের গন্ডীভুক্ত নয়। যেমন কোন কোন সম্প্রদায় মদ খাওয়াকে ঘোরতর পাপ বলে মনে করেন। আবার কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী যতক্ষণ রুটি ছিঁড়ে মদে ফেলা না হয় এবং একজন নবদীক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় পুরোহিতদের সহ সেই রুটি না খায় এবং সেই মদ পান না করে ততক্ষণ (তার) ধার্মিক হওয়ার পুরোপুরি সনদ হাসিল হতে পারে না। তেমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে অপরিচিত মহিলাকে কামলোলুপ দৃষ্টিতে দেখাও ব্যভিচার বলে গণ্য। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধান হচ্ছে, কোন স্বামীধারী (বিবাহিতা) মহিলা কোন কারণে সন্তান লাভে নিরাশ হলে ভিন্ন পুরুষের সাথে সহবাস করতে পারে। এমনটি করা শুধু বৈধই নয় বরং অতি পুণ্যের কারণও বটে। আর দশ কি এগারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত এহেন মহিলা ভিন্ন পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে। আর তেমনি কোন সম্প্রদায়ের বিবেচনায় জোঁক বা উকুন মারাও নিষিদ্ধ। আবার অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সব জীবজন্তুকে তরিতরকারীর মত ভোগ্য পণ্য বলে মনে করে। কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মমতে শূকরের স্পর্শও মানুষকে অপবিত্র করে দেয়। আবার অন্যান্য ধর্মমতে সাদা ও কালো সব রকম শূকর অতি উত্তম খাবার বিশেষ। অতএব

এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পাপের বিষয়ে দুনিয়ার মানুষ সার্বিকভাবে একমত নয়। খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ খোদা হওয়ার দাবী করেও প্রথম পর্যায়ের নিষ্পাপ বলে গণ্য। কিন্তু মুসলমানদের মতে মানুষ নিজেকে অথবা অন্য কাউকে খোদার সমতুল্য সাব্যস্ত করলে এর চেয়ে বড় আর কোন পাপ নেই। মোটকথা বিশপ সাহেব যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে না। তবে নিঃসন্দেহে এই পন্থা অতি উত্তম হবে যে হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান, কর্ম-কীর্তি, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক জীবন, আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আশিসমূলক প্রভাববিস্তার, ঈমান ও তত্ত্বোপলব্ধি ও কল্যাণ বিতরণ এবং নৈতিক ও সামাজিক উৎকৃষ্ট আচার-আচরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতার কারণ গুলোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক তুলনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখানো হোক, এসব বিষয়ে উভয়ের মাঝে কার শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত এবং কার সাব্যস্ত নয়। কারণ সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠত্বের সব দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যখন একজন নবীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো বর্ণনা করবো তখন আমাদের জন্য এ দিকটিও খোলা থাকবে যে একই অনুষ্ঠানে আমাদের জানা মতে সেই নবীর নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়গুলোও বর্ণনা করতে পারবো। কাজেই উক্ত ধারায় বর্ণনাটি যেহেতু কেবল একটি বা আংশিক বিষয় সম্পর্কীয় বর্ণনা না হয়ে বরং এটি হবে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয় অনেক বিষয় ও শাখায় বিস্তৃত বর্ণনা, সেহেতু জনসাধারণের পক্ষে এ সত্যে উপনীত হওয়া সহজ হবে, সামগ্রিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর এ সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রেখে এ উভয় নবীর মাঝে কে প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যদার অধিকারী। আর যদিও প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতার কারণগুলোও নিজের রুচি অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে, কিন্তু এটি যেহেতু মানবীয় মহৎ গুণ ও শ্রেষ্ঠতার কারণগুলোর এক ব্যাপক আকর ও সমষ্টি হবে কাজেই উক্ত পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তমকে যাচাই করতে গিয়ে তারা সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হবে না যা কেবল নিষ্পাপ হওয়ার বিতর্কের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। বরং এই তুলনা ও পর্যালোচনার বেলায় সব রকম রুচির মানুষ নিশ্চয় এমন এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের সন্ধান পেয়ে যাবে যার মাধ্যমে অতি স্পষ্ট ও সহজ পন্থায় এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে যে শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কে। অতএব আমাদের বিতর্ক যদি কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে সে পন্থাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত যাতে কোন সন্দেহ সংশয় ও গ্লানির অবকাশ নেই। এটা কি সত্য নয় যে নিষ্পাপ প্রমাণ করার বিতর্কে প্রথম পদক্ষেপেই এ প্রশ্নটি সামনে এসে

দাঁড়াবে, মুসলমান ও ইহুদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি নারীগর্ভে জন্মলাভ করে নিজেকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে বর্ণনা করে সে ঘোরপাপী বরং কাফিরও বটে? কাজেই এ অবস্থায় নিষ্পাপ হওয়ার কী-বা আর বাকি থেকে যায়?

যদি বলেন যে আপনাদের মতে এরূপ দাবী পাপ নয় এবং কুফরীও নয় তাহলে আপনারা সে একই জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেন যা থেকে রক্ষা পাওয়া উচিত ছিল। কেননা আপনাদের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্‌র ক্ষেত্রে খোদা হওয়ার দাবী করায় যেমন কোন পাপ হয় না। তেমনি (হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত) 'শাকত' মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির দৃষ্টিতে মা-বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে কোন পাপ হয় না। আবার আর্য সমাজীদের মতে প্রত্যেক অনু-পরমাণুকে নিজের অস্তিত্বের নিজেই খোদা বলে জ্ঞান করা এবং তার প্রিয় স্ত্রীকে তার উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্য কারো সঙ্গে সহবাস করানো কোন পাপ নয়। আর সনাতনি হিন্দুদের দৃষ্টিতে রাজা রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবতার ও পরমেশ্বর জ্ঞান করা এবং পাথরগুলোর সামনে সিজদা করা কোন পাপ কাজ নয়। তেমনি একজন পারসিকের দৃষ্টিতে আগুনের পূজা করা কোন পাপকাজ নয়। ইহুদীদের একটি ফির্কার ধর্মমত অনুযায়ী বিজাতিদের অর্থ-সম্পদ চুরি করা এবং তাদের ক্ষতিসাধন করা আদৌ পাপ কাজ নয়। আর মুসলমানদের ছাড়া অন্য সবার ধর্মমতে সুদ নেয়া কোন পাপ কাজ নয়। অতএব এখন এ সব বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য এমন কে অবসর হয়ে বসে আছে? কাজেই কোন সত্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নবীকে সনাক্ত করার কেবল সে পন্থাটিই খোলা রয়েছে যা আমি বর্ণনা করেছি। আর আমরা যদি ধরেও নেই যে বিভিন্ন সব ধর্মাবলম্বী নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার কারণগুলো একই রকম বর্ণনা করেন, অর্থাৎ বিভিন্ন সব ধর্মাবলম্বী যদি এ বিষয়ে ঐক্যমতও হন যে অমুক অমুক বিষয় পাপের তালিকাভুক্ত, সেগুলো থেকে বিরত থাকার অবস্থায় মানুষ নিষ্পাপ বলে অভিহিত হতে পারে, তাহলে এমনটি ধরে নেয়া যদিও অসম্ভব, তবুও কেবল মাত্র এ বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়ার দরুন যে এক ব্যক্তি মদ খায় না, ছিনতাই করে না, দস্যুতা ও ডাকাতি করে না, রক্তপাত খুন খারাপি করে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এরকম ব্যক্তিকে যদিও 'নিষ্পাপ' বলা যায়, তবুও উক্ত কারণে সে কখনো পূর্ণমানব বলে অভিহিত হওয়ার উপযোগী হতে পারে না এবং প্রকৃত পুণ্য ও উত্তম গুণের অধিকারী বলেও সাব্যস্ত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তিকে কেউ যদি নিজের এই উপকারের কথা বলে বেড়ায়, 'বহুবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমি তোমার ঘরে আগুন দেই নি এবং তোমার দুধের শিশুকে

গলাটিপে মেরে ফেলি নি' তাহলে এটা স্পষ্টতই বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে উচ্চস্তরের কোন পুণ্য বলে বিবেচিত হবে না এবং এহেন হক অধিকার ও শ্রেষ্ঠতার বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি সামান্য ভাল মানুষ বলেও গণ্য হবে না। নচেৎ একজন নাপিত যদি তার এ উপকারের কথা জাহির করে আমাদেরকে তার প্রতি কৃতার্থ করতে চায় যে চুল কাটার সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আমাদের মাথা, ঘাড় বা নাকে ক্ষুর বসিয়ে দেয় নি এবং এটাকে সে যদি পুণ্য বলে অভিহিত করে, তাহলে এতে করে সে কি আমাদের একজন হিতৈষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং বাবা-মায়ের অধিকারের মত তার অধিকারও স্বীকার করা হবে? না বরং সে নিজের এ রকম আচরণ প্রকাশ করায় এক ধরনের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে। আর একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শাসকের দৃষ্টিতে সে জামিন নেয়ার উপযোগী। মোট কথা, পাপ করা থেকে কারও নিজেকে রক্ষা করে চলা এটা কোন উচ্চস্তরের পুণ্য নয় কেননা শাস্তির আইনও তো তাকে বাধাদানের কারণ ছিল। যেমন, কোন দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি যদি সিঁদ কাটা বা প্রতিবেশীর মাল চুরি করা থেকে বিরত থাকে, তাহ'লে এর কারণ কি কেবল এটাই হতে পারে যে সে উল্লেখিত দুস্কর্ম থেকে বিরত থেকে তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল? বরং শাস্তির আইনও তো তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করছিল। কেননা সে এটাও জানতো, সে যদি সিঁদ কাটার সময়ে বা কারও ঘরে আগুন দেয়ার সময়ে বা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি গুলি চালানোর অথবা কোন শিশুর গলা টিপার সময়ে ধরা পড়ে যায়, তাহলে সরকার তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে কারাগারে পৌঁছে দেবে। মোটকথা এটাই যদি প্রকৃত পুণ্য এবং উচ্চমানবীয়গুণ হয়ে থাকে তাহ'লে দুর্বৃত্তেরা আমাদের মাঝে সেই সব লোকের অনুগ্রহকারী বলে সাব্যস্ত হবে, যাদের তারা ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। কিন্তু যেসব মহা পুরুষকে আমরা পূর্ণমানবের অভিধায় ভূষিত করতে চাই, তাদের মহত্ব প্রমাণের জন্য আমাদের কি শুধু এই কারণগুলোই উপস্থাপন করা উচিত যে তাঁরা কখনো কোন ব্যক্তির বাড়ি-ঘরে আগুন দেন নি, চুরি করেন নি, অপর কারো স্ত্রীর ওপর হামলা চালান নি, ডাকাতি করেন নি, কোন শিশুর গলা টিপে ধরেন নি? নাউযুবিল্লাহ, এ সব নীচ কার্যকলাপ কখনো মানবীয় মহত্ত্বের কারণ হতে পারে না। বরং এ রকম বর্ণনায় প্রকারান্তরে দুর্নাম প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্থলে যদি বলি, 'আমার জানামতে যায়েদ, যিনি শহরের একজন সম্মানিত ও সুখ্যাত রইস তিনি অমুক ডাকাতিতে অংশীদার ছিলেন না, অথবা অমুক নারীকে যে কতিপয় লোক প্রতারণার মাধ্যমে অপহরণ করেছিল সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না' তাহল এ রকম বর্ণনায়

আমি প্রকারান্তরে যায়েদের সম্মান হানি করছি। কেননা সংগোপনে জনগণকে তার সম্পর্কে এ ধারণা করার সুযোগ করে দিচ্ছি যে সে আসলেই খারাপ স্বভাবের মানুষ, যদিও এখন সে এতে জড়িত নয়। অতএব খোদা তাআলার নবীদের মূল্যায়ন ও প্রশংসাকে উক্ত সীমায় সীমাবদ্ধ করা নিঃসন্দেহে তাঁদের ঘোরতর কুৎসা করার শামিল। দুর্বৃত্তদের মত জনগণের কষ্টের কারণ অসঙ্গত অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে তাঁরা নিজেদের রক্ষা করেছেন কেবল এটুক বিষয়কেই তাঁদের বিরাট বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্মের কারণ বলে মনে করা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উচ্চমর্যাদার অবমাননা বৈ কিছু নয়। প্রথমত দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকা– যা নিষ্পাপ হওয়াকে বুঝায় এটা কোন উচ্চস্তরের গুণ নয়। জগতে সহস্র সহস্র এমন লোক রয়েছে যাদের কখনো সিঁদ কাটার বা ডাকতি করার বা রক্তপাত ঘটাবার বা দুধের শিশুদের টুটি চিপে মারার বা অসহায় দুর্বল মেয়েলোকের কান থেকে অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। কাজেই আমরা কত দূর পর্যন্ত এহেন পাপ বর্জনের কারণে লোকদেরকে নিজের হিতৈষী ও কল্যাণ সাধনকারী হিসেবে সাব্যস্ত করতে থাকবো এবং তাদেরকে শুধু উক্ত কারণে পূর্ণমানব হিসেবে মেনে নেব? তাছাড়াও অনিষ্ট পরিহার করা, অন্য কথায় যা নিষ্পাপ হওয়া বলে অভিহিত, এর অনেকগুলো হেতু ও উপকরণ রয়েছে। প্রত্যেকের কোথায় সেই যোগ্যতা যে রাতে একা উঠে সিঁদ কাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে, কাছা মেরে কোন অলি-গলিতে ঢুকে যাবে এবং ঠিক সুযোগ মত সিঁদ কাটবে, আর চুরি করা মাল কুক্ষিগত করে পালিয়ে যাবে? এ ধরনের কষ্ট স্বীকার করার স্বভাব নবীদের কী করেই বা হতে পারে? বস্তুত যোগ্যতা ও শক্তি ছাড়া সাহস সৃষ্টিই হতে পারে না। তেমনি ব্যভিচারও যৌনশক্তির মুখাপেক্ষী। কেবল পুরুষ হলেই হবে না, তার পর্যাপ্ত পৌরুষোচিত ক্ষমতাও থাকতে হবে। শূন্য হাতে কিছু হতে পারে না। তলোয়ার চালানোর জন্যও বাহুবলের দরকার। কিছু কৌশল, কিছু সাহস ও মানসিক শক্তিরও প্রয়োজন। অনেকে আবার একটি চড়ইপাখিও মারতে পারে না। ডাকাতি করাও প্রত্যেক কাপুরুষের কাজ নয়। এখন, এ বিষয়টির বিচার নিষ্পত্তি কেই বা করবে– যেমন কোন ব্যক্তি, যিনি একটি ফলবাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি একজন অতি পবিত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি ছিলেন বলে সেই বাগান থেকে বিনা অনুমতিতে ফল পাড়েন নি? কী কারণে এ কথা বলা যাবে না যে, দিনের বেলা ছিল এবং বাগানে পঞ্চাশ জন প্রহরী ছিল বলেই তিনি সে বাগানের ফল পাড়েন নি? ফল পাড়লে তিনি প্রহারিত ও অপমানিত হতেন। (কাজেই) নবীদের এ রকম প্রশংসা করা এবং এভাবে বারবার তাদের নিষ্পাপ হওয়ার

প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখানো যে তাঁরা অপরাধবৃত্তি করেন নি, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ এবং নিঃসন্দেহে আদব বিরোধী। তবে অজস্র উচ্চাঙ্গীন গুণাবলী তুলে ধরে প্রসঙ্গত যদি এটাও বর্ণনা করা হয়, তাহ'লে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেবলমাত্র এটুকু কথা যে এই নবী কখনো কোন শিশুকে কয়েক পয়সার লোভের জন্য গলা টিপে দেন নি, অথবা অন্য কোন কুকর্মে ব্যাপৃত হন নি। এটা নিঃসন্দেহে দুর্নাম করার নামান্তর। এগুলো কেবল সেই সব লোকের ধ্যান-ধারণা, যারা কখনো মানুষের প্রকৃত পুণ্য ও উচ্চাঙ্গীন সদ্‌গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন না। যাকে আমরা পূর্ণমানব বলে অভিহিত করি, তাঁর কেবল পাপ পরিহারের দিক দিয়ে মূল্যায়ন করা আমাদের উচিত নয়। কেননা এ মূল্যায়নের দ্বারা বড়জোর এটুকুই প্রমাণ হবে যে সে ব্যক্তি দুর্বৃত্তদের শ্রেণীভুক্ত নয়। কেবল সাধারণ ভালোমানুষদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আমি যেমন বর্ণনা করে এসেছি, কেবলমাত্র দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকা উচ্চপর্যায়ের গুণাবলীর মধ্যে পড়ে না। এমনটিতো কখনো সাপও করে থাকে যে সামনে দিয়ে নীরবে চলে যায়, কোন আক্রমণ করে না। কখনো নেকড়ে বাঘও মাথা নিচু করে হেঁটে চলে যায়। শত সহস্র শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় মারা যায়, তারা কখনো কারও কোন ক্ষতি করে নি। কাজেই পূর্ণমানব যাচাইয়ের জন্য কল্যাণ অর্জনের দিকটিই লক্ষণীয়, অর্থাৎ কী কী প্রকৃত পুণ্য তার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে এবং কী কী প্রকৃত সদ্‌গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার অন্তঃকরণ ও মন-মস্তিষ্কে, বিবেক ও চিন্তা-চেতনায় নিহিত রয়েছে এবং তিনি কী কী উচ্চাঙ্গীন মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। অতএব এ বিষয়টির প্রতিই লক্ষ্য রেখে হযরত মসীহ (আ.)-এর সাক্ষাৎ গুণ ও কল্যাণ এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের সাক্ষাৎ গুণ ও কল্যাণরাজী সার্বিকভাবে যাচাই-বাছাই করা উচিত। যেমন– বদান্যতা, উদারতা, সহানুভূতি এবং প্রকৃত গাম্ভীর্য ও সহিষ্ণুতা, যার পাশাপাশি জোরালো বক্তব্য রাখার ক্ষমতা থাকার শর্ত রয়েছে। আর যেমন প্রকৃত ক্ষমাশীলতা, যার পাশাপাশি প্রতিশোধ গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকার শর্ত রয়েছে। তেমনি প্রকৃত বীরত্ব যার পাশাপাশি ভয়ানক শত্রুদের মোকাবিলা করারও ক্ষমতা থাকার শর্ত রয়েছে। আর যেমন ন্যায়পরায়ণতা, যার পাশাপাশি জুলুম-অত্যাচারমূলক ক্ষমতা থাকারও শর্ত রয়েছে। আরও যেমন দয়া-মায়া, যার পাশাপাশি শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকার শর্ত রয়েছে। আর তেমনি উচ্চপর্যায়ের বিচক্ষণতা, অতি উচুঁমানের স্মরণশক্তি, অসাধারণ কল্যাণ ও আশিস বিতরণক্ষমতা, অতি উচ্চস্তরের অবিচলতা ও অনুগ্রহ অনুকম্পা এ যাবতীয় সদগুণের নমুনা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনও শর্ত সাপেক্ষ বটে।

অতএব এ প্রকারের উত্তম গুণাবলীতে মোকাবেলা ও তুলনা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেবল অনিষ্ট পরিহার বিষয়ে তুলনা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয় যে বিষয়টিকে বিশপ সাহেব নিষ্পাপ হওয়া বলে অভিহিত করেন। কেননা নবীদের সম্পর্কে এমনটি ধারণা করাও পাপ যে তাঁরা সুযোগ পেয়েও চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি থেকে নিজেদের রক্ষা করেন অথবা এ সব অপরাধ তাঁদের সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ হতে পারেনি। বরং হযরত মসীহ্ (আ.) যেমন বলে গেছেন, 'আমাকে নেক বলো না' এটি তাঁর এমন একটি তাগিদপূর্ণ উপদেশ ছিল যা পাদ্রী সাহেবদের পালন করা উচিত ছিল। বিশপ সাহেব যদি সত্যানুসন্ধানে প্রকৃতপক্ষেই আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি দিন, মুসলমানদের সাথে তিনি এ পন্থায় বিতর্ক করতে চান যে ঈমান ও মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী, আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও প্রভাবাদি, ঐশীতত্ত্বজ্ঞান ও পরম পবিত্রতা এবং মানবজীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বিধি-বিধান ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে এ উভয় নবীর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। যদি তিনি এমনটি করতে চান এবং কোনো তারিখ নির্ধারণ করে আমাদের অবহিত করেন, তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট তারিখ মোতাবেক ঘোষণাকৃত সভাস্থলে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। অন্যথায়, (বিশপ সাহেবের সদ্যঘোষিত) বিতর্কের প্রস্তাবটি নিছক ধোঁকা দেয়ার কৌশল ছাড়া অন্যকিছু নয়। এর এ উত্তরটিই যথেষ্ট। তিনি যদি মেনে নেন, তাহলে এ শর্তটি জরুরী বলে গণ্য হবে যে আমাদের অবগতির জন্য পাঁচ ঘন্টার চেয়ে কম সময় যেন দেয়া না হয়।[৩৭]

বিনীত লেখক
**মির্যা গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান
২৫মে, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

৩৭. মজমূয়া ইশতিহারাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮৩।

অতএব এ প্রকারের উত্তম গুণাবলীতে মোকাবেলা ও তুলনা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেবল অনিষ্ট পরিহার বিষয়ে তুলনা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয় যে বিষয়টিকে বিশপ সাহেব নিষ্পাপ হওয়া বলে অভিহিত করেন। কেননা নবীদের সম্পর্কে এমনটি ধারণা করাও পাপ যে তাঁরা সুযোগ পেয়েও চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি থেকে নিজেদের রক্ষা করেন অথবা এ সব অপরাধ তাঁদের সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ হতে পারেনি। বরং হযরত মসীহ্ (আ.) যেমন বলে গেছেন, 'আমাকে নেক বলো না' এটি তাঁর এমন একটি তাগিদপূর্ণ উপদেশ ছিল যা পাদ্রী সাহেবদের পালন করা উচিত ছিল। বিশপ সাহেব যদি সত্যানুসন্ধানে প্রকৃতপক্ষেই আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি দিন, মুসলমানদের সাথে তিনি এ পন্থায় বিতর্ক করতে চান যে ঈমান ও মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী, আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও প্রভাবাদি, ঐশীতত্ত্বজ্ঞান ও পরম পবিত্রতা এবং মানবজীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বিধি-বিধান ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে এ উভয় নবীর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। যদি তিনি এমনটি করতে চান এবং কোনো তারিখ নির্ধারণ করে আমাদের অবহিত করেন, তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট তারিখ মোতাবেক ঘোষণাকৃত সভাস্থলে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। অন্যথায়, (বিশপ সাহেবের সদ্যঘোষিত) বিতর্কের প্রস্তাবটি নিছক ধোঁকা দেয়ার কৌশল ছাড়া অন্যকিছু নয়। এর এ উত্তরটিই যথেষ্ট। তিনি যদি মেনে নেন, তাহলে এ শর্তটি জরুরী বলে গণ্য হবে যে আমাদের অবগতির জন্য পাঁচ ঘন্টার চেয়ে কম সময় যেন দেয়া না হয়।[৩৭]

বিনীত লেখক
**মির্যা গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান
২৫মে, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

৩৭. মজমূয়া ইশতিহারাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮৩।

## পত্র নম্বর ১৩

# লাহোরের বিশপ মহোদয় রাইট রেভারেন্ড জর্জ লেফরয় ডি ডি-এর নামে পত্র

পত্রটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে লিখেছিলেন এবং এক মজলিসের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠির শেষে তাঁদের নামের ফিরিস্তি আমি ছেড়ে দিয়েছি (সম্পাদক)

মহাত্মন,

বিনীত সম্ভাষণের পর অতি সম্মানের সাথে জনাবে আলীর খিদমতে নিবেদন, ইহজগতের সংক্ষিপ্ত এ জীবন যেহেতু শীঘ্রই নিজ সফর পুরা করতে যাচ্ছে এবং অচিরেই সে সময় এসে যাচ্ছে যখন এ ধরাপৃষ্ঠে আমাদের কারো জড়দেহের নাম চিহ্নও থাকবে না। সেহেতু আমাদের অন্তর এ চিন্তায় ব্যথিত, কোন উপায়ে যেন সত্যপরায়ণতা ও প্রকৃত প্রশান্তির সাথে এই সফর সমাপ্ত হয় এবং সেই ধর্মের উপর এর পরিসমাপ্তি ঘটে, যা প্রকৃতপক্ষে খোদা তাআলার সন্তুষ্টিসম্মত ধর্ম। আমরা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকি তাহলে আমাদের অন্তর সেই সত্যতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, যা উজ্বল যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। কাজেই কোন বুযুর্গ ব্যক্তি যদি ময়দানে (জনসমক্ষে) অবতীর্ণ হয়ে খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা আমাদের সামনে প্রমাণ করে দেখান তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় অন্য কোন উপকার হতে পারে না। এই সত্যানুসন্ধানের জন্য আমাদের হৃদয় ব্যথিত। আমাদের আন্তরিক বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের এক তুলনামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা যেন সেই সত্য রসূলের (আনুগত্যের) দোরগড়ায় নিজেদের মাথা ঠেকিয়ে দেই, যিনি পবিত্রতা ও সদ্‌গুণে এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ও মানবীয় চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে সব যুগের সব মানুষের চেয়ে অগ্রগামী ও তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন বলে সাব্যস্ত হন। বস্তুত যে দিন আপনি লাহোরে 'নিষ্পাপ নবী ও জীবিত রসূল কে?' এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন, সেদিন থেকে আমাদের অন্তর সাড়া দিয়ে ওঠে যে এ দেশে আপনিই খ্রিষ্টধর্মে অতি মর্যদাসম্পন্ন একমাত্র জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব বটে। তখন থেকেই আমাদের মনে এ ধারণার উদয় হয়েছে যে উক্ত কাজের জন্য খ্রিষ্টান মহোদয়দের মাঝে উত্তম অন্য কাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা

আপনার জ্ঞান অনেক ব্যাপক বলে মনে হয় এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় আপনার বেশ দক্ষতা রয়েছে। আপনার আখলাক তথা চারিত্রিক গুণও অতি পছন্দনীয় এবং বুযুর্গসুলভ। আর অন্য দিকে মুসলমানদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের দিক দিয়ে আমরা যখন দৃষ্টি দেই তখন আমাদের বিবেচনায় এ কাজের জন্য কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সমতুল্য অন্য কেউ নেই বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার কেবল দাবীই করেন না বরং তিনি বহু অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণও করে দিয়েছেন যে তিনি সেই ব্যক্তি, দুনিয়াতে যাঁর আগমন সম্পর্কে পবিত্র ইঞ্জিল ও কুরআনে প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে (এ যাবৎ) প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মোটকথা, এ সময়ে পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের সব জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ খ্রিষ্টানদের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব বড়ই দুর্লভ এবং মুসলমানদের মাঝে রয়েছেন স্বনামধন্য মির্যা সাহেব যিনি খোদার মনোনীত ও স্পর্শিত ব্যক্তি। আমাদের এটা সৌভাগ্য যে এমন উত্তম সুযোগ আমরা পেয়ে গেছি– এক দিকে তো আপনি রয়েছেন এবং অন্য দিকে রয়েছেন সেই ব্যক্তি যিনি খোদার 'মসীহ্' বলে অভিহিত এ কারণেই আমাদের পক্ষ থেকে, যাদের নাম নিম্নে লিখা হয়েছে তাদের সবার এই আবেদন, কয়েকটি মতবিরোধমূলক বিষয়ে আপনি এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' হযরত মির্যা সাহেব উভয়ে যেন আপসে বাহাস করেন। আর হযরত মির্যা সাহেব এ কথার অনুমোদন ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, পাঁচটি বিষয়ে আপসে লিখিতভাবে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হোক। বিষয়গুলো হলো:

১. এ দু'জন নবী অর্থাৎ হযরত মসীহ্ (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর মাঝে কোন্ নবীর সম্পর্কে তাঁর (সংশ্লিষ্ট) কিতাব অনুযায়ী এবং অন্যান্য আরও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে নিষ্পাপ বলে সাব্যস্ত হন।

২. উভয় মহান নবী (আ.)-এর মাঝে তিনি কে যাঁকে তাঁর কিতাব এবং অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণ অনুযায়ী ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন জীবিত রসূল হিসাবে অভিহিত করা যায়?

৩. উভয় মহান নবীর মাঝে তিনি কে যাঁকে তাঁর ঐশীগ্রন্থ ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণ অনুযায়ী শিফায়াতকারী বলা যায়?

৪. খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম-এ উভয় ধর্মের মধ্যে সেই ধর্ম কোন্‌টি যাকে আমরা জীবন্ত ধর্ম বলে অভিহিত করতে পারি?

৫. ইঞ্জিল ও কুরআনের শিক্ষার মাঝে সে শিক্ষা কোন্‌টি যাকে আমরা উত্তম ও উচ্চতম শিক্ষা বলতে পারি? শিক্ষার ক্ষেত্রে তৌহীদ (তথা একত্ববাদ) ও ত্রিত্ববাদ এই বিতর্কের বিষয়ভুক্ত।

এ পাঁচটি প্রশ্নে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। এ বিতর্কের জন্যে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী কড়াকড়িভাবে মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।

প্রথম শর্ত: উপরে বর্ণিত পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্পর্কে বিতর্কের ক্ষেত্রে এক দিন করে দরকার হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিতর্ক পাঁচ দিনে শেষ হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: প্রত্যেক পক্ষকে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পুরোপুরি তিন ঘন্টা করে সুযোগ দেয়া হবে। আর এভাবে প্রতিদিনের সভা সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সময়ে পুরা হয়ে যাবে।

তৃতীয় শর্ত: প্রত্যেক পক্ষ কেবল নিজ নবী বা কিতাব সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরবে। অপর পক্ষের নবী বা কিতাব সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তব্য উপস্থাপনের বৈধ অধিকারী হবে না। কেননা এ রকম আক্রমণ নিতান্ত বৃথা এবং প্রায়শ মনোমালিন্যের কারণ হয়ে থাকে। বস্তুত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে জনগণ নিজেরাই জেনে যাবে, কোন্ পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ শক্তিশালী এবং কোন্ পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তবে প্রত্যেক পক্ষের অধিকার থাকবে, যে যে ক্ষেত্রে আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, সেসব আশঙ্কাজনক প্রশ্নের উত্তর নিজ বিবরণে দিতে পারবেন।

চতুর্থ শর্ত: বিতর্ক লিখিতভাবে হবে। তবে লিপিবদ্ধকরণের পদ্ধতি হবে প্রত্যেক পক্ষের সাথে একজন করে সুলেখক (কাতেব) থাকবে। বিতর্ককারী বক্তা বলতে থাকবেন এবং 'কাতেব' লিখতে থাকবে। এবং প্রত্যেক পক্ষের এমন একজন ব্যক্তিও থাকবেন যিনি বক্তব্য লিখা শেষ হলে তা উপস্থিত শ্রোতাদের পড়ে শোনাবেন। এবং শোনানোর পর দস্তখতযুক্ত এর এক কপি বিপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পঞ্চম শর্ত: এ বিতর্কটি লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে এবং আপনার এক্তিয়ারে থাকবে, বিতর্ক সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনি যেখানে ইচ্ছা স্থান নির্ধারণ করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা সমীচীন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ষষ্ঠ শর্ত: বিতর্ক অনুষ্ঠানের দিন যখন শেষ হবে তখন উভয় পক্ষের মাঝে এক বা উভয় পক্ষ বিতর্কের লিখিত বিষয়সমূহ পুস্তকাকারে ছেপে প্রকাশ করবে এবং পরে এতে নিজ পক্ষ থেকে কোন কিছু মিশাবার কারো অধিকার থাকবে না।

এগুলো সেই সব শর্ত যা আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ মির্যা সাহেবের কাছে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছি এবং শর্ত-সমূহ অতি পরিষ্কার ও সর্বতোভাবে ন্যায়-ভিত্তিক বিধায় আশা করি, জনাবও এগুলোর অনুমোদন দান করে (আমাদের) অবগত করাবেন যে এ রকম বাহাস তথা ধর্মীয় বিতর্কের জন্য কবে এবং কোন্ মাসে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আমরা আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অতি বিনয় ও মিনতি এবং আদবের সাথে নিবেদন করছি যে জনাব অবশ্যই এ বিতর্ক পদ্ধতিটি মঞ্জুর করে নিন। আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মান ও মর্যাদার দোহাই দিয়ে জনাবের খিদমতে সবিনয় আবেদন করছি। জনাব আল্লাহ্‌র এই প্রিয় ও মনোনীত নবীর নামে (পেশকৃত) আমাদের উক্ত আবেদন মঞ্জুর করে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজ অনুমোদন সম্পর্কে অবহিত করুন। এ আবেদনটিতে কোন অতি মানবীয় কিংবা কোন বৃথা বিষয় নেই এবং উল্লেখিত বিতর্কের পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ভদ্রোচিত ও সর্বত নিরীহ এবং নেক নিয়্যত ও সত্যের সন্ধান ভিত্তিক বটে। তদুপরি জনাবের মত একজন অতি সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তিকে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর কসম দেয়া হয়েছে বিধায় আমরা আবেদনকারীদের পরিপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে জনাব এ বিনীত নিবেদনটিকে, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন অবশ্য অবশ্যই কোন রকম বিয়োগ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে হযরত মসীহ্‌র নামের সম্মান রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন। কেননা আমরা জানি, এ রকম ন্যায়-ভিত্তিক আবেদন আমাদের কাছে হযরত মসীহর ইজ্জতের দোহাই দিয়ে পেশ করা হলে এর প্রত্যাখ্যানকে আমরা মহাপাপ ও বেয়াদবি বলে মনে করবো। কিন্তু আপনার তো হযরত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার দাবী অনেক বেশি। এর পরীক্ষারূপে আমাদের এটাই প্রথম সুযোগ। এর বেশি আর কোন কষ্ট আমরা দিতে চাই না। কেবল (ইতিবাচক) উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। প্রত্যাশিত উত্তর গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ানে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এম.এ. এল.এল.বি এডভোকেটের নামে আসা উচিত। কেননা তিনিই এ মজলিসের সেক্রেটারী। আবেদনকারীদের নাম: ...।

## লেফরায়ের পলায়ন
## এ চ্যালেঞ্জের উত্তরে বিশপ সাহেব নিম্নবর্ণিত চিঠি লিখেন
### হারভিংটন, শিমলা, ১২ জুন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় জনাব! আপনার এবং আরো কয়েকজনের দস্তখতযুক্ত একটি মুদ্রিত চিঠি আমি পেয়েছি। এতে আমার কাছে অনুরোধ করা হয়েছে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ান নিবাসীর সাথে ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মের কতিপয় নীতির ওপর একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্যে আমি যেন সময় ও স্থান নির্ধারণ করি। আফসোস! দঃখের সাথে বলছি, আমি আপনার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। এর বড় বড় কারণ বা অজুহাত হলো :

১। আপনার প্রস্তাবিত বিতর্কানুষ্ঠানে যে ধরণের বন্ধুসুলভ সম্পর্কাবলীর প্রয়োজন হবে সে ধরণের সম্পর্কাদির সঙ্গে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সাথে মিলিত হতে আমি অস্বীকার করি। মির্যা সাহেব নিজেকে মসীহ্ নামে অভিহিত করার ক্ষেত্রে এককণা পরিমাণ উপযোগিতা ছাড়াই এমন একটি নাম ধারণ করেছেন যে নামে আমরা খ্রিষ্টানরা অভিহিত হয়ে থাকি এবং যাকে আমরা পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। এভাবে যাঁকে আমি আমার খোদাওন্দ ও মালিক মনে করে উপাসনা করি তিনি তাঁর কঠোর অবমাননা করেছেন বিধায় কী করে সম্ভব যে আমি মির্যা সাহেবের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হতে পারি?

২। আপনি আপনার চিঠিতে ইঙ্গিত করেন, সমস্ত বিতর্কে আমার এই আকাঙ্খা থাকে সেগুলো যেন নম্রতার ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং যাদের সাথে আমি আকীদা-বিশ্বাসে মতানৈক্য করতে বাধ্য তাদের ভাবধারণাকে যেন আদবের দৃষ্টিতে দেখা হয়। আমি সত্যি সত্যি বলছি, এ নিয়ম-নীতিকে মেনে চলা এবং যারা আমার সাথে মতভেদ রাখেন বৈধভাবেও তাদের চিন্তাভাবনায় আঘাত দেয় এমন কথা না বলা। এটাই সর্বদা আমার সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মির্যা সাহেব বিভিন্ন সময় খ্রিষ্টধর্মের সম্পর্কে যা লিখেছেন সেই সব লেখা যখন পড়ি এবং দেখি, সেগুলোতে অতি কঠোর ভাষায় তিনি ওই সব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেন যা আমাদের খোদাওন্দ যিশু খ্রিষ্ট-এর সম্পর্কে চারি ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ আছে যেগুলোকে আমরা খ্রিষ্টানরা খোদাওন্দ তাআলার পাক কালামের অংশ বলে মনে করি এবং সম্মান ও মর্যাদা দেই। তখন আমি কেবল এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে মির্যা সাহেব তাঁর বিরুদ্ধবাদীর সাথে বাহাস-বিতর্কে সেই নম্রতা ও আদবের মান বজায় রাখেন

না যে দিকে সর্বদা আমার লক্ষ্য রয়েছে। কাজেই এ যুক্তিতেও আমি মির্যা সাহেবের সাথে সমতার সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হতে পারি না।

৩। আপনি যেমন আমাকে নিশ্চয়তা দেন মির্যা সাহেবের বহু সংখ্যক অনুসারী (উপস্থিত) হবেন। কিন্তু এটা অনিস্বীকার্য যে তাঁর মসীহ্ হওয়ার দাবী বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রত্যাখ্যান করে, হেয় দৃষ্টিতে দেখে এবং এ নিয়ে বিদ্রুপ করে থাকে। কাজেই আমি ব্যক্তিগত ভাবে যতই অযোগ্য হয়ে থাকি না কেন, এক হিসেবে আমার প্রাপ্ত পদাধিকার বলে আমি খ্রিষ্টান জাতির উকিল (প্রতিনিধিত্বকারী) বটে। মির্যা সাহেব কোন ভাবেও মুসলমানদের উকিল হতে পারেন না। তাই এমতাবস্থায় কী করে বিতর্কের ক্ষেত্রে আমি তাকে নিজের সমান ভাবতে পারি?

৪। এটা স্মরণ রাখা আবশ্যকীয়, যখন থেকে আমি এই জেলার বিশপ হয়েছি আমার প্রথম এবং জরুরী কাজ হলো খ্রিষ্টান চার্চের আবশ্যকতার দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি দেই এবং একে সুদৃঢ় করতে এবং খোদা তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান ও জীবনের পবিত্রতায় একে যেন ভেতর থেকে তৈরী করা হয় সে লক্ষ্যে পুরোপুরি চেষ্টা করি। আর এ কারণে একজন মামুলি 'ওয়ায়েয' এর কাজ (অর্থাৎ এমন ব্যক্তির কাজ যে কিনা তার সময় ওয়ায করায় এবং যে সব লোক এখন খ্রিষ্টধর্মের গন্ডীর বাইরে রয়েছে তাদেরকে খ্রিষ্টধর্মে ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যয় করেন) আমার সময় এবং চিন্তাভাবনায় কেবল একটি ছোট বা নিম্ন স্তরের কাজ। এতে সন্দেহ নেই এটা এমন একটি কাজ যার সাথে আমি অনেক জড়িত এবং এতে আনন্দের সাথে অংশ নিয়ে থাকি। কিন্তু খোদা যখন আরেক ভাবে নিজের খিদমত পালনের জন্য আমাকে ডেকে নিয়েছেন, তখন তাঁর ডাকে আমার সাড়া দেয়া উচিত। আর তাই আমি আমার আসল কাজের মধ্য থেকে সে পরিমাণ সময় দিতে পারি না যা আপনার প্রস্তাবকৃত বিতর্কের জন্য আবশ্যক।

৫। অবশেষে আমি এটা বর্ণনা করা জরুরী বলে মনে করি যে এরকম বাহাস-বিতর্ক থেকে যে ফলাফল লাভ হতে পারে তা আপনি এবং আমি অনেক বড় এক পার্থক্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আপনি তো আপনার চিঠিতে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে এই অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে আমরা যেন সেই মুকাদ্দস (–মহাপবিত্র) নবীর সামনে মাথা নত করে দেই যিনি হৃদয়ের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতায়, পবিত্রকরণ শক্তিতে ও চারিত্রিক উৎকর্ষে এবং নৈতিকভাবে সত্যপরায়ণতায় সারা দুনিয়ার তুলনায় সর্বোচ্চ পার্যায়ে রয়েছেন। অন্য কথায় আপনি এটা সম্ভবপর মনে

করেন যে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সত্যধর্মের পথ এবং একটি ধর্মের ওপর আরেকটি ধর্মের শ্রেষ্ঠতা জানা যেতে পারে।

আমি বিশ্বাস রাখি, এ ধারণাটি নীতিগতভাবে ভুল এবং খোদা তাআলার পাক কালামের পরিপন্থী। এদেশের অধিকাংশ মানুষের অন্তরে এ ধারণাটির প্রাধান্য বিস্তার অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করেছে। কাজেই আমি আমার কোন কাজের দ্বারা এটাকে যথার্থ বলে মেনে নিতে বা এর সমর্থন করতে চাই না। আমরা বিশ্বাস রাখি, ধর্ম কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির কাছেই সাহায্য চায় না বরং মানুষের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার কাছে অর্থাৎ তার ইচ্ছার কাছে, তার অনুভূতির কাছে তার নৈতিক আকাঙ্ক্ষার কাছে তার ঈমানী অবস্থার কাছে বা সংক্ষেপে তার হৃদয় ও মস্তিষ্কের কাছে আমাদের খোদাওন্দ যীশু খ্রিষ্টের শিক্ষায় খোদা এবং তাঁর সত্য ধর্মের জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিগুলোর তীক্ষ্নতার সাথে তেমন সম্পর্কযুক্ত নয় যেমনটি হৃদয়ের পবিত্রতা এবং জীবনের কার্যাদিতে তাঁর সত্যিকার আজ্ঞানুবর্তিতার সাথে জড়িত রয়েছে। যেমন এক উপলক্ষে যীশুখ্রিষ্ট বলেন, "মুবারক তারাই যারা পবিত্র হৃদয়ের। কেননা তারা খোদাকে দেখবে' (মথি : ৫-৮)। এবং আরেক জায়গায় খ্রিষ্ট বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি তাঁর মর্জি (পালন) করতে চায় (অর্থাৎ খোদার মর্জি) তাহলে সে শিক্ষা সম্পর্কে জেনে যাবে তা কি খোদার পক্ষ থেকে, না কি আমি আমার পক্ষ থেকে (বানিয়ে) বলছি (যোহন : ৭ : ১৭)। আমার পাকাপোক্ত ঈমান যে কোন ব্যক্তি সত্য খোদার জীবন্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে না তবে কেবল পবিত্রাত্মার সাহায্যেই। আর এ রকম সাহায্য, আমি যেমন পূর্বেই বলে এসেছি, তওবাকারী, হৃদয়ের পবিত্র ও বিনয়ী এবং সত্যবাদীদেরকে দেয়া হয়। তাদেরকে দেয়া হয় না যাদের যুক্তিজ্ঞান প্রখর হয়ে থাকে এবং যারা ধর্মীয় বিতর্কে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম–উভয় ধর্মের অনুসারী একে অন্যকে জানুক এবং একে অন্যের আকীদা-বিশ্বাস পূর্বের চেয়েও উত্তমভাবে বুঝুক। এ কারণেই একদিকে তো আপনাদের ধর্মের সেই সব লেখা পড়তে আমি খুব পছন্দ করি যা আমাকে এর সত্য বিষয়বস্তু ও শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করাতে পারে। আর অন্যদিকে আমি এ রকম লেকচার দিতে পছন্দ করি যেমন সম্প্রতি আমি লাহোরে দিয়েছি। এগুলোর দ্বারা যেন উপস্থিতবৃন্দকে এমন প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয় যার মাধ্যমে তারা ধর্মের নীতিসমূহ আরও ভালভাবে ও অধিক স্বচ্ছতার সাথে বুঝতে পারে। কিন্তু আমি চিন্তা করি এটা এমন বিষয় নয় যেমন একটি বাহাস-বিতর্কে যোগদান, যার অনস্বীকার্য পরিণতি এই দাঁড়ায় যে বিতর্কে

যোগদানকারীরা সেই ধর্ম গ্রহণ করে নেবেন যা খোদার পক্ষ থেকে হওয়া তখন অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে–এমন কোন বিতর্কে উক্ত শর্তে আমার পক্ষে কখনও যোগদান সম্ভব নয়। যদিও এ চিঠি মূদ্রিত নয় কিন্তু আপনার এটা ছাপাবার বা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। আমি মনে করি আমার ব্যাপারটি মুসলমান আশ্রাফদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই এ চিঠি ছাপা হলে সম্পূর্ণটি যেন হুবহু ছাপা হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
দস্তখত
জি-এ লাহোর

এর উত্তরে মুসলমানদের কমিটি নিম্নরূপ বিস্তারিত চিঠি বিশপকে লিখেন যাতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আরও ভালভাবে চিন্তাভাবনা করেন। এ চিঠিটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামই লিখিয়েছিলেন।

কাদিয়ান, ১০ জুলাই ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় জনাব! যে উত্তরটিতে আপনি মির্যা গোলাম আহমদ (রয়ীসে কাদিয়ান) এর সাথে একটি মনোজ্ঞ ধর্মীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন তা কমিটিকে শুনানো হলো। তারা এতে অত্যন্ত দুঃখ ব্যক্ত করেন। অস্বীকার সম্পর্কে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন এগুলো কেবল কিছু ভুল বুঝাবোঝি ও ভ্রম-বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি মাত্র। আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে এগুলোর বিস্তারিত খন্ডন একটি পুস্তকাকারে লিখতে যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। আপনার পক্ষ থেকে যদি এই আবেদনের উত্তর তেমন নৈরাশ্যজনকই হয় যেমনটি প্রথম চিঠির উত্তর ছিল তাই এ পুস্তিকা প্রকাশের পূর্বে এটা সমীচীন বলে মনে করা হয়, এরকম বিতর্কের আবশ্যকতার দিকে যেন অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিপুল সংখ্যক মুসলমান এর জন্য ঐকান্তিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করে আছেন। মুসলমান কি খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই বিতর্কটিতে সম্মতি দেখতে চেয়েছিলেন। অনেকগুলো এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা এতে কেবল গভীর আগ্রহই প্রকাশ করেননি বরং নিজেদের সুস্পষ্ট রায় ও অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে এ বিতর্কের প্রস্তাবটি, যে কোন দিক দিয়ে এতে দৃষ্টি দেয়া হোক না কেন অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিতর্ককারীদের বিপুল সুখ্যাতি ও জ্ঞানগত ব্যুৎপত্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক দিয়ে,

চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী কমিটির ব্যাপকতার দিক দিয়ে, বিতর্কে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাবলীর দিক দিয়ে, শর্তাবলীর অতি উচ্চপর্যায়ে ন্যায়সঙ্গত হওয়ার দিক দিয়ে, প্রত্যাশিত অতি লাভজনক সুফলের দিক দিয়ে, মোট কথা সব দিক দিয়েই প্রস্তাবিত বিতর্কটি কোন শর্ত পরিবর্তন ছাড়াই আপনার গ্রহণ করে নেয়ার উপযোগী ছিল। আপনার প্রতি লক্ষ্য স্থির করে যে মুসলমানদের বক্তব্য ছিল তারা দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন, তাঁরা উন্নত স্তরের ও উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন যাঁদের অনুরোধের দিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। এ প্রস্তাব দেয়ার পেছনে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এ সদোদ্দেশ্য ছিল, সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে মানুষ যে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তের মধ্যে পড়ে আছে তা থেকে যেন তাদের উদ্ধার করা যায়। বিতর্কের শর্তাবলী এমন ন্যায় সঙ্গত ছিল যেমনটি যথাসম্ভব প্রত্যাশিত হতে পারে। কেননা বিরোধিতামূলক আক্রমণের এতে অনুমতি ছিল না। এক সুদীর্ঘ সময় ধরে এ দেশে মিশনারী হিসেবে আপনার কাজ করা, প্রাচ্যের মানুষদের কৃষ্টি, (সামাজিক) রীতি-নীতি, ধর্ম ও ভাষার সাথে আপনার পরিচিত হওয়া, লাহোরে আপনার দেয়া লেকচারগুলোতে আপনার উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণের খন্ডনে মুসলমানদের বক্তব্য শোনে আপনার সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া এবং এ যাবতীয় ঘটনাকে আপনার বর্তমান উচ্চ মর্যাদা দ্বারা আরও বেশি গুরুত্ববহ করে তোলা–এ সবকিছু মিলিয়ে মুসলমানদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে বিতর্কের ময়দানে খ্রিষ্টধর্মের পক্ষ থেকে আপনি সর্বোত্তম উকিল (–প্রতিনিধিত্বদানকারী) হতে পারেন। তদুপরি আপনার পক্ষ থেকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে আপনি মুসলমানদেরকে যিশু খ্রিষ্টের মোকাবিলায় নিজেদের পয়গম্বরের (সা.) নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবন প্রমাণ করতে আহ্বান করেন। এটি এমন এক বিতর্ক ছিল যাতে মুসলমানদের পক্ষে না ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব ছিল, আর না তাদের পক্ষ যথেষ্ট সময় পাওয়ার সুযোগ ছিল আর না তাদের পক্ষে নিজেদের ভাল কোন উকিল উপস্থিত করা সম্ভব ছিল–এটা মুসলমানদেরকে বরং আরও উদ্বুদ্ধ করে তোলার কারণ হলো যেন আপনাকে এমন এক বিতর্কের জন্যে ডাকা হয় যাতে উভয় ধর্মের এবং এদের প্রবর্তকদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বমূলক বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য সমূহের বেশি সমীচীনরূপে পরীক্ষা নীরিক্ষা হতে পারে। এ বিষয়টিও বিশেষ লক্ষণীয় যে ইসলামের যে উকিলকে তাঁরা আপনার মোকাবিলায় পেশ করেছিলেন তিনি কোন সাধারণ মোল্লা ও ওয়াজকারীদের মধ্যেকার কেউ ছিলেন না। কেননা তাদের পাক্ষ থেকে এমন সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী

উপস্থিত করায় আপনার যোগ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। বরং আপনার মর্যাদা, অবস্থান ও যোগ্যতা যেমন উচ্চস্তরের ছিল, ঠিক তেমনি আপনার মোকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাঁকে পেশ করা হয়েছিল তিনিও একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের খ্যাতিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাঁর ওপর এ সময় তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করার কারণে সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং যাঁর জামাত ভিতর ও বাইরের উভয় দিক দিয়ে কঠিনতম বিরোধিতা সত্ত্বেও বিস্ময়কর এক উন্নতি সাধন করে দেখিয়েছিল।

দুনিয়ার দুটি সবচে' বড় ধর্মের এমন দু'জন বিখ্যাত উকিল যখন মওজুদ ছিলেন তখন সর্বসাধারণকে সেই সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয় যেসব প্রশ্ন প্রত্যেক যুগেই বড় বড় মানুষের দৃষ্টিপটে থাকে। যদিও আপনি খ্রিষ্টান চার্চের ভেতর থেকে মেরামত করাকে নিজের আসল কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু আপনি এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে প্রত্যেক সৎ খ্রিষ্টানের প্রকৃত কর্তব্য হওয়া উচিত সেই সব মানুষকে জীবন ও আলোর দিকে আনয়ন করা, যারা তার বিবেচনায় মৃত্যু এবং অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত আর তাই (খ্রিষ্ট-ধর্মে) দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকের তুলনায় ভয়ানক আতঙ্কজনক অবস্থায় রয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীরা তো আপনার দৃষ্টিতে নরক থেকে রক্ষা প্রাপ্ত। কিন্তু অদিক্ষিত মানুষ তো খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুযায়ী দোযখের চিরস্থায়ী আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখন আমি আপনার বিবেকের কাছে আপিল করছি, এ উভয় কাজের মাঝে আপনার দৃষ্টিতে কোনটি জরুরী– যারা বিপদমুক্ত হয়েছে তাদের প্রয়োজনাদির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত, না কি যারা মৃত্যু ও অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত তাদের হাত ধরা কর্তব্য? আপনি কি বিতর্ক সম্পর্কিত প্রস্তাবটি এ যুক্তির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন যে আপনি এমন সৎ কাজের জন্যে আপনার সারা জীবন থেকে পাঁচ দিনের সময়ও বের করতে পারেন না? এরপর আপনি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সথে এ কারণে বন্ধুসূলভ সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হতে স্বীকার করেন যে তিনি এমন একটি নাম ধারণ করেছেন যাকে খ্রিষ্টানরা নিজেদের খোদা ও মালিক মনে করে সম্মান ভক্তি ও উপাসনা করে থাকেন। বাস্তব ঘটনা যদি এমনটিও হতো যেমনটি আপনি ভেবেছেন তবুও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কর্তনের জন্যে এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। কেননা আপনার পবিত্র বাইবেল এ শিক্ষা দেয় : 'শত্রুদেরকেও ভালোবাস।'

নিজের ধর্মীয় বিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে এ ধরণের ব্যবহার ও আচরণ কোন ধর্মের অনুসারীর পক্ষ থেকেই কখনও হওয়া উচিত নয়। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীর পক্ষ থেকেই বা কেন হবে? বিশেষত চার্চের এমন একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার কর্তব্য কেবল এ-ই নয় যে তিনি নিজেই মথি : ৫ অধ্যায় ৪৪ শ্লোকের অনুশাসন মেনে চলবেন বরং এ-ও কর্তব্য যে তিনি এ শিক্ষা অন্যান্য খ্রিষ্টানকেও শিখাবেন বরং অ-খ্রিষ্টানদের কাছেও জরুরী সদোপদেশ হিসেবে তুলে ধরবেন। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মির্যা সাহেব এটা বলেন না যে তিনি জ্বলজ্যান্ত যিশু মসীহ্ বরং তার দাবী হলো, তিনি 'বরূযীভাবে' তথা আত্মিক প্রতিবিম্বাকারে নবী ঈসা মসীহ্র রঙ্গে ও আঙ্গিকে আগমন করেছেন, যেভাবে ইতোপূর্বে যোহন (তথা ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম) এলিয়া (তথা ইলিয়াস আলাইহেস সালাম)-এর রঙে ও আঙ্গিকে আত্মিক প্রতিবিম্বাকারে আগমন করেছিলেন এবং তিনি সেভাবেই শিক্ষা দেন যেভাবে হযরত মসীহ্ (আ.) শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাছাড়া মুসলমানগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে একজন সত্যবাদী ও মর্যাদাবান নবী বলে বিশ্বাস করেন, আর মির্যা সাহেব যিনি তাঁর যুগে 'আওওয়ালুল-মুসলিমীন' তিনি তাদের চেয়েও উত্তম ও উন্নতভাবে অনুরূপ বিশ্বাস করেন। অথচ কোটি কোটি অন্যান্য লোক যাদের ধর্ম ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্ম কোনটিই নয় তারা তাঁকে নবী বলেও মানে না, আর এভাবে তাঁর অমর্যাদা ও অবমাননা করে। আমি মনে করি, আপনি এরকম লোকদের সাথে বিপুলভাবে দেখা-সাক্ষাৎও করে থাকেন কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি তাদের সম্পর্কে কখনও তেমন বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব ব্যক্ত করেন যেমনটি আপনি আমার নামে আপনার চিঠিতে মির্যা সাহেব সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ স্থলে আমি আপনার দৃষ্টি আরেক অতি জরুরী বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। যখন এ বিষয়টির উল্লেখ মির্যা সাহেবের সামনে করা হলো এবং এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বিশপ সাহেব যেভাবে আপনার সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্কাদির মাধ্যমে দেখা করতে অস্বীকার করেন, আপনিও কি সেভাবে বিশপ সাহেব সম্পর্কে একই রকম মনোভাব পোষণ করেন। তখন তিনি নিম্নরূপ জবাব দিলেন:

"আমি দুনিয়ার কাউকে আমার শত্রু বলে মনে করি না। আমি মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না বরং যে সব মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস তারা পোষণ করে থাকে সেগুলোর প্রতি আমি ঘৃণাবোধ করি। মানুষের সম্পর্কে আমার খেয়াল ও চিন্তাচেতনা পরম সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হয়ে থাকে। কাজেই কীভাবে

আমি এমন ব্যক্তিকে আমার শত্রু বলে ভাবতে পারি যিনি তাঁর স্বধর্মীয়দের মাঝে সম্মানিত হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়াও যিনি তাঁর পদ ও শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে সম্মানযোগ্য তাঁর প্রতি আমি ভালবাসা রাখি। যদিও আমি তাঁর নীতিগুলো পছন্দ করি না তবুও আমার ঘৃণা ঐ সব আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি কেবল ততটুকুই, যতটুকু কিনা খোদা তাআলার গুণাবলীকে মানুষের দিকে আরোপ করা হয়েছে, (মানুষকে খোদা তাআলার গুণাবলীর অধিকারী করা হয়েছে) এবং মানবীয় দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা 'রাব্বুল আলামীন' আল্লাহ্‌র দিকে আরোপ করা হয়েছে, (মানবীয় দোষ-ত্রুটি আল্লাহতে সাব্যস্ত করা হয়েছে)। আমি বন্ধুসূলভ সম্পর্ক নিয়ে বিশপ সাহেবের সাথে দেখা সাক্ষাতে ঘৃণা করি না। কারণ যথাসম্ভব কোন পক্ষ অপর পক্ষের কাছে কিছু উপকৃত হতে পারে। কেননা আবশ্যকীয়ভাবে শুভাকাঙ্ক্ষার বীজ থেকে ফল হয়। ঐশী সংস্কারক বা উপদেশদাতা হিসেবে যে ব্যক্তিকে কর্তব্য পালন করতে হয় তার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধর্মীয় প্রতিপক্ষ বা মতবিরোধকারীর সাথে সে অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ ভরে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশা করবে। সত্যি কথা, আমি কেবল আমার মুজাদ্দিদ (–সংস্কারক) হওয়ার কাজকেই পরিত্যাগকারী বলে সাব্যস্ত হবো না বরং নৈতিক নিয়ম-কানুনকেও ভীষণ আঘাতকারী বলে বিবেচিত হবো যদি আমি সেই লোকদেরকে এই কারণে নিজের দুশমন বলে মনে করে বসি যে তারা দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে। তাদের প্রতি বরং আমার দয়া-মায়া ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। আমি যদি এর বিপরীত করি তাহলে আমি এক বড় জনগোষ্ঠীকে সেই সব পবিত্র ও উচ্চস্তরের সত্য থেকে বঞ্চিতকারী বলে সাব্যস্ত হবো অথচ সবার কাছে সত্য পৌঁছে দেয়া আমার কর্তব্য। কোন ব্যক্তি এমন কারও সাথে পুণ্য করতে পারে না যাকে সে তার শত্রু বলে ভাবে। কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বলছি, আমার যদি কখনও এমন সুযোগ হয় যে আমি বিশপ সাহেবের সাথে ভাল ও মন্দ উভয় আচরণ করতে সামর্থবান হই তাহলে আমি (সেই সুযোগে) তার সাথে এমন পুণ্য করবো যা সারা জগতকে বিস্ময়াবাক করে দেয়। মানুষকে পবিত্রতার পথে আহ্বানের শক্তি এবং তাদের ভেতর পরিবর্তন আনয়নের জন্য সত্যিকার উদ্দীপনা সত্যিকার ভালোবাসা ও সহানুভূতি থেকেই সৃষ্টি হয়। শত্রুতা জ্ঞান-বুদ্ধিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সহানুভূতিকে বিপন্ন করে দেয়। কুরআন করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলে : **"আযীযুন আলাইহে মা আনিত্তুম হারীসুন**

**আলাইকুম"** এরপর অন্যত্র বলেন : **"লা'আল্লাকা বা-খিউন্ নাফ্সাকা আন্লা-ইয়াবূনূ মু'মিনীন"**। এর অনুবাদ হলো, আমরা তোমাদের কাছে এক নবী পাঠিয়েছি, যার হৃদয় তোমাদের সহানুভূতিতে এমন ভরপুর যে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাকে এত আঘাত দেয় যে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যেন তার নিজেরই বলে প্রতীয়মান হয় এবং তোমাদের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণকরী। অপর আয়াতটির মর্ম হচ্ছে, হে নবী! তুমি কি নিজেকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে এ দুঃখ-বেদনায় যে মানুষ সত্যকে কেন গ্রহণ করে না। শেষোক্ত আয়াতটি সেই সত্যিকার কুরবানী ও ত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে যা খোদা তাআলার প্রেরিত বান্দারা মানুষের কুসংস্কার সংশোধনের জন্য বরণ করে থাকেন। এগুলো সেই সব আয়াত যা আমি পালন ও তদনুযায়ী আচরণ করে থাকি। এতে করে প্রত্যেকেই সহজেই বুঝতে পারেন, যারা নিজেদেরকে আমার শত্রু বলে ভাবেন তাদের সম্পর্কে আমার খেয়াল ও চিন্তাচেতনা কী এবং কেমন হওয়া উচিত।"

এ চিঠি শেষ করার আগে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে চাই, যদিও বিতর্কের আবেদনপত্রে কেবল মির্যা সাহেবের কয়েক জন অনুসারীর দস্তখত ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মুসলমান জাতির সাধারণভাবে সবাই এর প্রতি আপনার সম্মতির জন্য অপেক্ষমান ছিলো। ধর্মের মূলনীতি সমূহের ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলমানের সাথে মির্যা সাহেবের কোন মতভেদ নেই বরং মতভেদ কেবল এমন সব বিষয়ে রয়েছে যেমন প্রত্যেক বড় ধর্মের বিভিন্ন ফির্কার মাঝে হয়ে থাকে। স্বয়ং খ্রিষ্টধর্ম সবচেয়ে বেশি এ ধরণের মতভেদের স্বাক্ষর বহন করে। আপনি এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকলে, মির্যা সাহেবের অনুসারী নয় এমন হাজার হাজার শিক্ষিত মুসলমান বিতর্কের আবেদনপত্রে দস্তখত দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। অনুবাদের কপিসহ যা আপনি চেয়েছিলেন আমি বিগত উনিশ মাসের ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফও আপনাকে পাঠাচ্ছি, এর যে সংখ্যাগুলোতে এই বিতর্ক-চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রয়েছে। আমি আশা করি, আপনি পুনর্বিবেচনার পর আপনার উত্তরটিতে উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং এই বিপুল সংখ্যক মানবহৃদয়কে নিরাশ করবেন না যারা এতে আপনার সম্মতির জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে।

দস্তখত
মুহাম্মদ আলী, সেক্রেটারী

কিন্তু বিশপ সাহেব বিতর্কের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিতে সম্মত হলেন না। উত্তরে লিখলেন, আপনার চিঠি আমি চলতি মাসের ১০ তারিখে পেয়েছি। কিন্তু যে সব অজুহাত আমি আগের চিঠিতে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সঙ্গে বিতর্ক করতে অস্বীকার সম্পর্কে উপস্থাপন করেছি সেগুলোতে আমি এখন কোন পরিবর্তনও করি না এবং কোন সংযোজনও করি না। আপনি আপনার প্রথম চিঠির যেসব অতিরিক্ত কপি পাঠিয়েছেন সেগুলোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

দস্তখত

জি-এ, লাহোর

উল্লেখ্য, বিশপ লেফরায় তার চিঠিতে যেসব উপাত্ত উত্থাপন করেছেন সেগুলোর সুবিস্তৃত উত্তর রিভিউ অফ রিলিজিউন্স ১ম ভলিউম ৯ম পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে। উৎসুক পাঠকবৃন্দ সেখান তেকে উপকৃত হতে পারেন (নাযের ইশা'আত)।

# জন আলেকজান্ডার ডুই-এর নামে পত্রাবলী

## পরিচিতি

আমেরিকার এলিয়া হওয়ার মিথ্যাদাবীকারক জন আলেকজান্ডার ডুইকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে চিঠি চ্যালেঞ্জ হিসেবে লিখেছিলেন সে চিঠির অনুবাদ উপস্থাপনের পূর্বে পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে এ ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরা জরুরী বলে মনে হয়। জানা আবশ্যক, জন আলেকজান্ডার ডুই আসলে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিল। আমেরিকায় সর্বপ্রথম ১৮৮৮ সালে সান ফ্রানসিস্কোয় এসে নামে। ইতঃপূর্বে সে এককালে টসমানিয়ায় জেলখানায় ছিল। ১৮৯২ সালে সে ধর্মীয় উপদেশমূলক ভাষণাদি দিতে শুরু করে এবং নিজের একটা আলাদা ফির্কার গোড়াপত্তন করতে আরম্ভ করে। তার দাবী ছিল, সে লোকদের রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য করতে পারে। আর এ দাবীর কারণেই দুর্বলচেতা ও কুসংস্কারপ্রবণ অনেকেই তার ভক্ত হয়ে পড়ে। এসব মানুষের টাকায় সে একজন ধনী লোকে পরিণত হয় এবং ১৯০০ সালে সে বর্তমান সিহুন (যায়েন) শহরটির জায়গা ক্রয় করে। পরবর্তীতে এর প্লট আবার নিজ মুরিদদের কাছেই উঁচু দরে বিক্রি করে এবং প্রচার করে, অচিরেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এ শহরেই অবতীর্ণ হবেন। ২ জুন, ১৯০১ তারিখে সে তার এ দাবী প্রকাশ করে যে সে হচ্ছে সেই এলিয়া (তথা ইলিয়াস) যে মসীহর আগমনের উদ্দেশ্যে লোকদের প্রস্তুত করতে এসেছে। এ দাবীর দরুন তার অর্থ সম্পদ ও ভক্তদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হয় যে বছরের শুরুতে সে তার ভক্তদের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে দশ লক্ষ ডলার গ্রহণ করতো। যখন সফর করতো সে অতি বিলাস বহুল আয়োজনের মাধ্যমে ভ্রমণে বের হতো। ১৯০২ সালে সে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করলো যে মুসলমানরা যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তা ছাড়াও সে নানাভাবে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করতো। যখন সে ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে আক্রমণ চালালো তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনোনীত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আত্মাভিমানবোধ উদ্দীপ্ত করলেন এবং তিনি সেপ্টেম্বর ১৯০২ সালে তাকে ইংরেজী ভাষায় একটি চিঠি দিলেন যা 'রিভিউ অফ রিলিজিয়নস'-এর ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করলেন। এ বিস্তারিত চিঠির সারাংশ ছিল, উভয় পক্ষ দোয়া করুক: 'আমাদের মাঝে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, খোদা তাআলা তাকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ধ্বংস করুন'। এটি ছিল ডুই-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উত্তর

যা সে ইসলামধর্মাবলম্বী সবার নিপাত যাওয়ার সম্পর্কে করেছিল। এ চিঠি ব্যাপকভাবে আমেরিকার বিপুল সংখ্যক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইংল্যান্ডেও কিছু সংখ্যক (পত্রিকা) তা প্রকাশ করে। এত বিপুল সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে এর প্রকাশ ও প্রসার ঘটে যে আমাদের কাছেও এ রকম বহু পত্র-পত্রিকা পৌছেছে যেগুলোতে এ মুবাহালার বর্ণনা ছিল।

এখানে যেহেতু বিস্তারিত সব ঘটনা লিখা উদ্দেশ্য নয় সেহেতু আপাতত এটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করছি। এ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মারা যায় (সম্পাদক-ইরফানী)।

## পত্র নম্বর ১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্মাদুহ ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল করীম

# সকল মুসলমানের ধ্বংস সম্পর্কে ডুই-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উত্তর

সত্যান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত, আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তাআলার চিরায়ত নিয়ম হলো, এ বিশ্বচরাচরে যখনই অপবিশ্বাস ও অপকর্ম ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সেই প্রকৃত ও সত্য খোদাকে ত্যাগ করে বসে যিনি আদমের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তারপর শিশ, নূহ, আর তেমনি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ ও মূসার কাছে এবং পরিশেষে সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। মোটকথা শিরক তথা অংশিবাদিতা, অপবিত্রতা, অপকর্ম, জড়বাদিতা ও সংসারপূজা এবং অবজ্ঞা ও অবহেলাপূর্ণ জীবনযাপনের কারণে পৃথিবীর কলুষিত হয়ে পড়া প্রত্যেক যুগে সেই খোদা কোন বান্দাকে প্রত্যাদিষ্ট করে ও নিজ পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুৎকার করে মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাকে নিজ বুদ্ধিমত্তার, নিজ শক্তি ও ক্ষমতার এবং নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অংশ বিশেষ দান করেন। আর তার মাঝে খোদার প্রেরিত হওয়ার এটি এক নিদর্শন হয়ে থাকে যে দুনিয়া তার মোকাবেলায় বিজয়ী হতে পারে না। ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের দিক দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ায়, তাহলে এ দিক দিয়ে সে-ই বিজয়ী হয়। আর যদি

অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মোকাবেলা হয় তাহলে এতে কেবল সে-ই প্রাধান্য লাভ করে। আর কেউ যদি পারস্পরিকভাবে অথবা এককভাবে মুবাহালা করে অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে দোয়া করে, 'আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে আমার আগে মারা যাক', তাহলে নিশ্চয় তার শত্রু তার আগেই মারা যায়।

বর্তমান যুগে যখন খোদা তাআলা দেখলেন পৃথিবীবাসী বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, কোটি কোটি মানুষ শিরকের পথ অবলম্বন করেছে চল্লিশ কোটিরও বেশি সেই সব মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যারা একজন অক্ষম-অসহায় মানুষ অর্থাৎ মরিয়মের পুত্রকে খোদা বানাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে মদাসক্তি, অশ্লীলতা, পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিমগ্নতা ও অবজ্ঞা-অবহেলাপূর্ণ জীবন যাপন চরমসীমায় পৌছে গেছে। তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সব খারাপি শুধরানোর উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। অতএব এ যাবৎ আমার হাতে প্রায় এক লক্ষ লোক পাপাচার অপবিশ্বাস ও অপকর্ম থেকে তৌবা করেছে। দেড় শ'রও বেশি সংখ্যক ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ এসব নিদর্শনের সাক্ষী। জগতব্যাপী পুনরায় তৌহীদ তথা একত্ত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং মানবপূজা বা প্রস্তরপূজা থেকে লোকদের মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় খোদার দিকে তাদের আত্মনিবেদিত করানোর উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আমি লক্ষ্য করছি, মানুষের মধ্যে এক আলোড়ন ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। সহস্র সহস্র লোক আমার হাতে তৌবা করে প্রকৃত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন, আকাশ থেকে এমন বায়ুও প্রবাহিত হচ্ছে যে এর ফলে (সাধারণ ভাবে মানুষের) মনমানসিকতা তৌহীদের অনুকূল হয়ে চলছে এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, এখন খোদা তাআলা পৃথিবী থেকে মানবপূজার বিলোপ ঘটাতে চান। এই ইচ্ছার বাস্তবায়নে শত শত উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সৃষ্টি পূজারী মানুষ বলতে এখানে আমার দৃষ্টিতে সেই সব খ্রিষ্টানকে বুঝায় যারা মরিয়মের পুত্রকে খোদা বলে বিশ্বাস করেন। দুঃখের বিষয় যে তারা তাদের শিরেকী ধর্মের এ যাবৎ যে উন্নতি সাধিত হয়েছে কেবল এতেই সন্তুষ্ট নয় বরং তারা চায় গোটা জগত যেন প্রকৃত খোদাকে ছেড়ে সেই দুর্বল ও অসহায় মানুষটিকে খোদা বলে মেনে নেয়, যাকে আটক করে লাঞ্ছিত ইহুদীরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। খ্রিষ্টানদের উল্লেখিত এ আকাঙ্ক্ষার কারণ কেবল এটাই যে সৃষ্টিপূজার প্রথা অত্যন্ত এক খারাপ অভ্যাস। এর শিকার হয়ে এতে অভ্যস্ত হওয়ার পর মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাদ্রীদের এতো আস্পর্ধা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে তারা চান না, ভূপৃষ্ঠে সেই প্রকৃত খোদায় বিশ্বাসী একজন

ব্যক্তিও (বেঁচে) থাকুক, যে খোদা ইবনে-মরিয়ম ঈসা ও তাঁর মায়ের জন্মেরও পূর্বে থেকে মজুদ ছিলেন। বরং তারা চান, আকাশের নিচে গোটা ভূপৃষ্ঠের সব মানবজাতি যেন মরিয়মপুত্র মসীহকেই খোদা বলে বিশ্বাস করে এবং তাকেই নিজেদের উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা ও পরিত্রাতা হিসেবে মেনে নেয়। আমি লক্ষ্য করছি, তাদের ইচ্ছার মোকাবেলায় প্রতাপান্বিত খোদা অনেক ধৈর্য ধরেছেন। তাঁর ইজ্জত ও মর্যাদা অক্ষম বান্দাকে দেয়া হয়েছে। তাঁর প্রতাপ ও মহিমাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এ যাবৎকাল ধৈর্য ধরেছেন। কারণ তিনি যেমন আত্মমর্যাদাভিমানী তেমনি তিনি সহিষ্ণুও বটে। এই জালেম সৃষ্টিপূজারীরা সব ঐশীগুণ মরিয়মপুত্র যিশুকে দিয়ে ফেলেছেন। এখন তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই কেবল যীশু। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন প্রকৃত ও সত্য খোদার দৃষ্টান্ত হলো, এক বিত্তশালী ব্যক্তি তাঁর প্রিয়জনদের জন্য এক বাগানবাড়ী তৈরী করেন, যেখানে নানা রকম ফুল, ফল ও ছায়াদার গাছ ছিল। সে বাড়ীর এক অংশে তিনি তাঁর আপনজনদের রাখেন। আরেক অংশে তাঁর ধন-সম্পদ ও দামী আসবাবপত্র রেখে তালাবদ্ধ করেন এবং একটি অংশ পথিক ও ভ্রমণকারীদের জন্য সরাইখানা হিসেবে ছেড়ে দেন। কিন্তু মালিক যখন কয়েকদিনের জন্য ভ্রমণে যায়, তখন একজন উগ্রস্বভাবের ভিনদেশী মানুষ সরাইখানারূপে তাঁর যে ঘরটি ছিল সেটি দখল করে নিল এবং যে কয়টি কক্ষে তাঁর প্রিয়জনরা ছিল আর যেগুলোতে তাঁর ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র ছিল সে সবগুলোই ক্রমান্বয়ে নিজ ব্যবহারের আওতায় নিতে আরম্ভ করলো। প্রথমে সরাইখানাটিকে নিজ বাসস্থানে পরিণত করলো। কেবল এটুকুতেই সে ক্ষান্ত হলো না, বরং সেই বাড়ি থেকে এর মালিকের আপনজনদের বের করে দিল এবং তালাবদ্ধ কক্ষগুলোর তালা ভেঙ্গে সব ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নিল। এখন মালিক, যিনি কেবল সে গৃহের মালিকই নন, বরং সেদেশের বাদশাহও বটে, তিনি যখন এ শহরে আসবেন এবং এ জুলুম ও ঔদ্ধত্য নিজ চোখে দেখবেন তখন তিনি কী পদক্ষেপ নেবেন? এর উত্তর এটাই, তাঁর রাজ ক্ষমতা আত্মমর্যাদাভীমান ও পরাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী আবশ্যকীয় সবই বাস্তবায়িত করে দেখাবেন। এ গৃহকে সেই জালেমের কবল থেকে মুক্ত করে আবারও এতে মজলুম আপনজনকে প্রবেশ করাবেন ও হরণকৃত সব ধন-সম্পদ তাদের (ফিরিয়ে) দিবেন এবং সে সরাইখানাটিও তাদেরই দান করবেন, যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ এতে বেশি কাল অবস্থান করতে না পারে। অনুরূপভাবে এখন সে যুগ সমাগত, যখন (তিনি) সব ধর্মীয় বিবাদের মীমাংসা করে দেবেন। মানুষের মাঝে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তাদের যুদ্ধ কিংবা জেহাদের মাধ্যমে এর মীমাংসা হতে পারে নি। অবশেষে

তাদের তলোয়ার ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। এতে করে মানুষের এই ভুল ভাঙ্গলো যে ধর্মীয় বিবাদের মীমাংসা তলোয়ার করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, স্বর্গীয় মীমাংসা সন্নিকট। কেননা পৃথিবীতে আত্মমর্যাদাভিমানী খোদাকে অত্যন্ত হেয় করা হচ্ছে। প্রত্যেক খ্রিষ্টান মিশনারী তার অন্তরে এ উত্তাপ-উদ্দীপনা লালন করে, তৌরাতে যে খোদার সম্পর্কে এখনও সঠিক শিক্ষা মজুদ রয়েছে তাঁকে সম্পূর্ণ বাতিল করে তাঁর সিংহাসন যেন মরিয়মপুত্রকে দেয়া হয় এবং পৃথিবীতে তাঁর নাম উচ্চারণকারী কোন একজন ভক্তও না থাকে বরং প্রত্যেক জাতির মুখে এবং প্রত্যেক দেশে যেন কেবল এ আওয়াজই উত্থাপিত হয় যে যীশু মসীহই বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রতিপালক খোদা এবং খোদাওন্দদেরও খোদা। আর এটা কেবল (তাদের) আকাঙ্ক্ষাই নয়। বরং যীশু মসীহ্কে খোদা বানানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, বই-পুস্তক ছাপা হয়েছে এবং যে পরিমাণ চেষ্টা-তদবির করা হয়েছে, দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

আফসোস, এক দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানদের এ স্বভাব হয়ে গেছে যে তারা যুক্তিযুক্ত ও সোজাসরলভাবে এ (খ্রিষ্ট) ধর্মের মোকাবেলা করেন না। বরং বিশেষ সভা-সমাবেশে কখনো এর উল্লেখ এসে গেলে তারা জেহাদকে নিজেদের উন্নতির বড় উপায় বলে নির্ধারণ করেন এবং তারা এমন এক যুগের জন্য অপেক্ষমান, যখন কিনা তাদের কোন মাহদী ও মসীহ্ তলোয়ারের মাধ্যমে জগতব্যাপী সব জাতিকে নাস্তানাবুদ করে দেবেন। অন্য কথায়, অর্বাচিনরা যে আপত্তি আঁ হযরত (সা.)-এর তলোয়ারের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিল এর উত্তরও তলোয়ারই হবে (নাউযুবিল্লাহ্)। আমার জানা মতে এটাই মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ যে মানবীয় দয়া-মায়া তাদের হৃদয় থেকে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রত্যেক মুসলমানকে আমি এ রকম বলে মনে করি না। কিন্তু আমি এও অস্বীকার করতে পারি না যে মানবজাতির রক্তপিপাসু কোটি কোটি সংখ্যক মানুষ তাদের মাঝে এখনও মজুদ রয়েছে। আমি বিস্ময়াভিভূত। তারা কি পছন্দ করেন, তাদেরকে অন্য কেউ হত্যা করুক, ফলে তাদের এতীম-অনাথ শিশু সন্তান ও বিধবা স্ত্রীরা অসহায় অবস্থায় থেকে যাক? তবুও তারা অন্যদের সম্পর্কে এমনটি (অবস্থা সৃষ্টি) করা কেন সঙ্গত বলে মনে করেন? আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে মুসলমানরা এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে থাকলে তারা গোটা ইউরোপের হৃদয় জয় করতে পারতো। প্রত্যেক পবিত্রচেতা বিবেকবান ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে খ্রিষ্টধর্ম অন্তঃসারশূন্য মাত্র। মানুষকে খোদা বানানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অন্যান্য মানুষের তুলনায় যীশু মসীহ্র এক কণা পরিমাণ আলাদা কোন বিশেষত্ব নেই।

বরং তাঁর চেয়ে অনেক উচু স্তরের কোন কোন মানুষ অতীতে হয়েছেন এবং এখনও এ অধম সর্বশক্তিমান খোদা কর্তৃক মানুষকে তা দেখানোর উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছে। এ অধমের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সে মসীহর চেয়ে বেশি রয়েছে। আর যীশু মসীহ্ কিনা এখনও জীবিত আছেন, আকাশে আছেন, তিনি কি না সত্যি-সত্যি মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে পরে জেরুযালেমের সবাই যারা আদমের যুগ থেকে মসীহর সময়কাল পর্যন্ত মারা গিয়েছিল তারা জীবিত হয়ে শহরে চলে এসেছিল! এ সবই মিথ্যা কাহিনী মাত্র। যেমন হিন্দুদের পুরাণে অনুরূপ কল্প কাহিনী বর্ণিত আছে। সত্য কেবল এ টুকুই যে মসীহ্ও কতিপয় মু'জিযা (তথা অলৌকিক ঘটনা) দেখিয়েছেন, যেমন নবীরা দেখাতেন। আর যেমন খোদা তাআলা এখন এই অধমের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন। কিন্তু মসীহর কর্মকান্ড অল্প সংখ্যক ছিল। আর মিথ্যা সেগুলোতে বেশি বেশি পরিমাণে যোগ করা হয়। এটা যে কতো লজ্জাজনক মিথ্যা যে তিনি জীবিত হয়ে আকাশে উঠে যান! প্রকৃত ঘটনা কেবল এটুকই যে তিনি ক্রুশে বিদ্ধাবস্থায় মারা যান নি। ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয়, মারা যাওয়ার কোন পরিস্থিতি ছিল না। তিন ঘন্টার মধ্যে তাঁকে ক্রুশ থকে নামানো হয়। অত্যন্ত ব্যথার কারণে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন মাত্র। ইহুদীদের কবল থেকে উদ্ধার করাই ছিল খোদা তাআলার অভিপ্রায়। কাজেই তখন গ্রহণ লাগার দরুন ঘোর অন্ধাকার ছেয়ে পড়ে। ইহুদীরা ভয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে যায় এবং ইউসুফ নামক তাঁরই গোপন এক শিষ্যের হাতে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। এরপর তাঁকে একটি কামরায় রাখা হয় যা কবর বলে প্রসিদ্ধ করা হয়। সেখানে রেখে (তাঁর ক্ষতগুলো) উপশম হলে পরিশেষে তিনি সে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এরপর অতি দৃঢ় ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত যে তিনি ভ্রমণ করতে করতে কাশ্মীরে যান। সেখানেই জীবনের বাকি অংশ কাটান। শ্রীনগরে মহল্লা খানইয়ারে তাঁর কবর রয়েছে। আফসোস, অযথা মিথ্যা কাহিনীরূপে তাঁকে আকাশে তোলা হয়। অথচ পরিশেষে কাশ্মীরে তাঁর কবর প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে দু এক জন নয়, বরং বিশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক সাক্ষী রয়েছেন।

এ কবরটির সম্পর্কে আমি অত্যন্ত গবেষণার মাধ্যমে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এ জাতির মিশনারীদের প্রতি আমার খুবই আফসোস হয় যে তারা দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল সবকিছু পড়ে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং অহেতুক একজন অক্ষম-অসহায় মানুষকে উপস্থাপন করে তাকে খোদা বলে মেনে নিতে বলেন। সুতরাং সম্প্রতি আমেরিকায় যীশু মসীহ্র একজন রসূল পয়দা হয়েছেন।

তার নাম ডুই। তাঁর দাবী হলো, ঈশ্বরত্বের পদপর্যাদায় যীশু মসীহ্ তাকে দুনিয়াতে এ বিষয়ের দিকে সবাইকে আকর্ষণ (ও আহ্বান) করার জন্য পাঠিয়েছেনঃ মসীহ ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই। কিন্তু এ কী রকম খোদা যিনি ইহুদীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি? একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাঁকে ধরিয়ে দেয়। তিনি তার কোন প্রতিকার করতে পারেননি। ডুমুর গাছের দিকে তিনি দৌড়ে গেলেও বুঝতে পারেননি যে এতে ফল নেই। আর কিয়ামত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, তা কবে ঘটবে তিনি নিজ অজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। আর সেই অভিশাপ যার অর্থ হচ্ছে হৃদয় অপবিত্র হয়ে যায়, খোদার প্রতি বিতৃষ্ণ ও বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং খোদা ও তাঁর দয়া থেকে দূরে সরে পড়ে, সেই অভিশাপ কিনা তাঁর ওপরে বর্ষিত হয়! এরপর তিনি আকাশের দিকে এ কারণে আরোহণ করলেন যে পিতা তার থেকে অনেক দূরে ছিলেন– কোটি কোটি মাইলের চেয়েও বেশি দূরে। আর এই দূরত্ব তিনি সশরীরে আকাশে আরোহণ না করা পর্যন্ত ঘুচতে পারতো না! লক্ষ্য করুন, কতো স্ববিরোধী কথা!! এক দিকে তিনি কিনা বলেন 'আমি, এবং পিতা এক ও অভিন্ন'। আবার অপর দিকে কোটি কোটি মাইল অতিক্রম করে তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যান! পিতা ও পুত্র যখন এক ও অভিন্নই ছিলেন, তখন কেনই বা সফরের এতো কঠিন কষ্ট স্বীকার করতে গেলেন? যেখানে তিনি ছিলেন সেখানেই তো পিতারও থাকার কথা। উভয়ইতো এক ও অভিন্ন। কাজেই তিনি কার দক্ষিণ হস্তে উপবিষ্ট হলেন?

এখন ডুই, যিনি যীশু মসীহকে খোদা মানেন ও নিজেকে তাঁর রসূল আখ্যা দিয়ে বলেন, তৌরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায় ১৫ শ্লোকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি তার স্বপক্ষে বিধায় স্বয়ং তিনি 'এলিয়া' এবং তিনিই 'অঙ্গীকারের রসূল'। তাঁকে আমি সম্বোধন করে বলছি, তিনি কি জানেন না, তাঁর এই কৃত্রিম খোদার অস্তিত্ব মূসার স্বপ্নে বা কল্পনাতেও কখনো ছিল না? মূসা বনী ইস্রাঈলকে বার বার বলেন, 'পৃথিবীতে এবং আকাশে কোন জড়বস্তু, মানুষ ও জীবজন্তুকে খোদা বলে আখ্যা দিও না। খোদা তোমাদের সাথে কথা বলেছেন। তবু তোমরা তাঁর কোন আকৃতি দেখ নাই। অতএব তোমাদের খোদা আকৃতি ও জড় দেহ ধারণের উর্ধ্বে ও পবিত্র।' কিন্তু এখন ডুই মূসার খোদা থেকে বিপথগামী হয়ে এমন এক খোদাকে উপস্থাপন করেন যাঁর চার ভাই ও মাও আছে। আর ডুই বার বার তার পত্রিকায় লেখেন, তার খোদা যীশু মসীহ্ তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, সব মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা মরিয়ম পুত্র মসীহকে খোদা মানবে এবং ডুইকে এ কৃত্রিম খোদার রসূল হিসেবে মেনে নেবে, তারা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেউ জীবিত থাকবে না'।

আমি ডুইকে এক বার্তা দিচ্ছি, 'সব মুসলমানকে মেরে ফেলার তার কি প্রয়োজন? বেচারী মরিয়মের অসহায় পুত্রকে তারা কী করে খোদা বলে মেনে নেবে? বিশেষত এ যুগে যখন ডুইয়ের খোদার কবরও এ দেশে (ভারতবর্ষে) মজুদ রয়েছে? আর তাদেরই মাঝে সেই প্রতিশ্রুত মসীহও মজুদ আছেন? যিনি ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষভাগে ও সপ্তম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর সত্যতার বহু জ্বলন্ত নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে। আর ডুইয়ের এ ইলহাম (ঐশীবাণী) যে সমস্ত মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাবে; কেবল তারাই বাকি থাকবে যারা যিশু মসীহ্কে খোদা বলে মানবে আর সেই সাথে ডুইকেও এই খোদার রসূল বলে মেনে নিবে। এ ইলহাম অনুযায়ী তো অন্যান্য খ্রিস্টানদেরও রক্ষা নাই কেননা তারা যদিও মরিয়মের সাহেবজাদাকে খোদা বলে মানেন কিন্তু এই মিথ্যা রসূল ডুইকে এখনও তারা স্বীকার করেন নাই, অথচ ডুই স্পষ্টাক্ষরে এ ইলহাম প্রকাশ করে দিয়েছেন যে তারা যতক্ষণ ডুইকেও মেনে না নেন ততক্ষণ কেবল যিশু খ্রিষ্টকে খোদা হিসেবে মানা যথেষ্ট নয়। বস্তুত তাদের স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত যে ডুই এলিয়া ও ডুই 'অঙ্গীকারের রসূল' এবং তওরাতে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় ১৫ শ্লোকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী ডুই সম্পর্কেই বটে। (এমনটি মানলে) তবেই কিনা তারা রক্ষা পাবে, নচেৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। মোটকথা ডুই বার বার (পত্র-পত্রিকায়) প্রকাশ করছেন যে যীশু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বে ও ডুই-এর প্রেরিতত্বে বিশ্বাসী দলটি ছাড়া বাকী সব মানুষ অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রিষ্টানদের উচিত তারা সবাই যেন শীঘ্র ডুইকে মেনে নেন, যাতে তারা ধ্বংস না হন। আর যেহেতু তারা একটি অযৌক্তিক বিষয় অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব মেনে নিয়েছেন সেহেতু তারা এ দ্বিতীয় অযৌক্তিক বিষয়টিও মেনে নিক অর্থাৎ যিশু খ্রিষ্টের ইশ্বরত্বতো মানেই এর পর এ দ্বিতীয় অযৌক্তিক বিষয়টিও মেনে নিক যে ডুই এই খোদার প্রেরিত।

আর মুসলমানদের প্রসঙ্গে ডুই সাহেবের কাছে আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, এ বিবাদের ক্ষেত্রে কোটি কোটি মুসলমানকে মারার কী দরকার? একটি সহজপন্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে ডুই-এর খোদা সত্য, না আমাদের খোদা সত্য– এ বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাবে। সেটি হলো, ডুই সাহেব বারবার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী মুসলমানদের শোনাবেন না, বরং তাদের মাঝে কেবলমাত্র আমাকে নিজ দৃষ্টিতে রেখে এ দোয়া করুন, আমাদের উভয়ের মাঝে যে মিথ্যেবাদী সে প্রথমে (তথা সত্যবাদীর জীবদ্দশায়) মারা যাক। কেননা ডুই যীশু খ্রিষ্টকে খোদা বলে জানেন ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি তাঁকে একজন অসহায় দুর্বল বান্দা (মানুষ) কিন্তু

নবী বলে জানি ও বিশ্বাস করি। এখন বিচার নিষ্পত্তির বিষয় হলো, এ উভয়ের মধ্যে কে সত্যবাদী। উক্ত দোয়াটি তিনি (পত্রিকার মাধ্যমে) ছেপে দিন এবং এতে কমপক্ষে এক হাজার মানুষের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করুন। আর এটি যখন পত্রিকায় ছেপে আমার কাছে পৌছবে, তখন আমিও এর উত্তরে একই দোয়া করবো এবং ইনশাআল্লাহ এক হাজার মানুষের সাক্ষ্য সহ পত্রিকায় ছেপে দেবো। ডুইয়ের এ মোকাবেলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অন্য সব খ্রিষ্টানের জন্য সত্যকে সনাক্ত করার পথ বেরিয়ে আসবে। এ দোয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা আমার নয়, বরং ডুইয়ের। তার অগ্রসরতাকে লক্ষ্য করে আত্মমর্যাদাভিমানী (এক-অদ্বিতীয়) খোদা তাআলা আমার হৃদয়ে ওরূপ দোয়ার জন্য জোশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমি এ দেশে (তথা ভরতবর্ষে) নিছক একজন সাধারণ মানুষ নই। বরং আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, যাঁর (আবির্ভাবের) জন্য ডুই অপেক্ষমান রয়েছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ডুই বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ পঁচিশ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। আর আমি সুসংবাদ দিচ্ছি যে সে (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ আবির্ভূত হয়ে গেছেন। আমিই সে মসীহ্। শতশত ঐশী নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবী থেকে আমার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার সঙ্গে লক্ষাধিক লোকের জামাত রয়েছে। যারা জোরেশোরে দ্রুত বেগে উন্নতি করছে। নিজ সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ডুই অহেতুক কথাবার্তা লেখেন যে তিনি মনঃসংযোগে হাজার হাজার রুগীকে আরোগ্য করেছেন। আমি এর উত্তর দিচ্ছি, তাহলে তিনি কেন তার অসুস্থ মেয়েকে আরোগ্য করতে পারেননি? সে শৈশবেই মারা যায়। তার অসুস্থতার দরুন ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু সে মৃত্যুপথে যাত্রা করে। স্মরণ রাখা আবশ্যক, এ দেশের শতশত সাধারণ মানুষ এ ধরনের আমল করে থাকেন এবং মনোসংযোগে রোগ-ব্যাধি নিরসনের ক্ষেত্রে তাদের অনেকে পারদর্শী হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য কেউ তাদের বুযুর্গী স্বীকার করে না। তাই আমেরিকার সরলপ্রাণ লোকদের প্রতি অত্যন্ত তাজ্জব হয়, তারা কোন্ ধ্যান-ধারণার জালে আটকে পড়লেন? তাদের জন্য কি যীশু খ্রিষ্টের অযথা খোদা বানানোর বোঝা যথেষ্ট ছিল না যে এ দ্বিতীয় বোঝাটাও নিজেদের গলায় ঝুলালেন? ডুই যদি নিজ দাবীতে সত্য হয়ে থাকেন এবং প্রকৃতপক্ষেই যীশু খ্রিষ্ট খোদা হয়ে থাকেন তাহলে এ ফয়সালা কেবলমাত্র এক ব্যক্তির মৃত্যুর মাধ্যমেই হয়ে যাবে। পৃথিবী জুড়ে সব মুসলমানের মৃত্যু ঘটাবার কী প্রয়োজন? কিন্তু তিনি যদি এ নোটিশের (তথা চ্যালেঞ্জের) উত্তর না দেন অথবা নিজ আত্মম্ভরিতা ও লম্ফ-ঝম্ফের রীতি অনুযায়ী উল্লেখিত মুবাহালার দোয়া করে ফেলেন, ফলে আমার মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়া থেকে তাঁকে তুলে নেয়া হয়, তাহলে এটা অবশ্যই সারা

আমেরিকার জন্য এক ঐশী নিদর্শন হবে। কিন্তু এ শর্ত থাকবে, কারও মৃত্যু যেন মানবীয় হাতে সংঘটিত না হয় বরং কোন রোগব্যাধির মাধ্যমে বা বিদ্যুৎপাতে বা সর্পদংশনে বা কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আমরা এর উত্তরের জন্য ডুইকে তিন মাস পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি এবং দোয়া করি, খোদা তাআলা সত্যবাদীদের সহায় হোন, আমীন।

স্মরণ রাখা আবশ্যক, দুনিয়ার সব জাতির মাঝে সাধারণভাবে প্রচলিত এক ও অভিন্ন বিষয়াবলী সত্য দাবীদার ও মিথ্যে দাবীদারের ক্ষেত্রে (সত্যাসত্য নির্ণয়ে) ফয়সালা করার জন্য মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা এ বিষয়গুলো কম-বেশি সব জাতিতেই দেখতে পাওয়া যায়। মনঃসংযোগে রোগব্যাধির নিরাময়ও এসব বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এ নিরাময় পদ্ধতি অজানা প্রাচীনকাল থেকে সব জাতির মধ্যেই প্রচলিত। হিন্দুরাও অনুরূপ কৌশলগত পারদর্শিতা দেখিয়ে থাকেন। ইহুদীদের মধ্যেও এ পদ্ধতিটি চলে আসছে। মুসলমানদের মাঝেও অনেকে মনঃসংযোগের মাধ্যমে রোগনিরাময়ের দাবীদার রয়েছেন। সত্য কথা এই যে হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা করার সঙ্গে এ নিরাময় পদ্ধতিটির কোন সংস্রব নেই। কেননা সত্যানুসারী ও মিথ্যানুসারী উভয় শ্রেণীর মানুষ এতে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে। তাই ইঞ্জিল থেকেও প্রমাণিত, হযরত ঈসা যখন এ মনঃসংযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে কোন কোন রোগ নিরাময় করতেন, সে সময় তাঁর জীবদ্দশাতেই এমন লোকও মজুদ ছিলেন, যারা তাঁর শিষ্য বা হাওয়ারী ছিলেন না কিন্তু অনুরূপ রোগ-ব্যাধির নিরাময় করতেন, যেমন হযরত ঈসা করতেন। আর সে সময় এমন একটি পুকুর ছিল, যেটিতে ডুব দিয়ে অধিকাংশ রুগী ভাল হয়ে যেতো। অতএব এ মনঃসংযোগমূলক অনুশীলন ও রোগব্যাধি নিরাময় রীতি যা সাধারণভাবে সব জাতির মধ্যেই প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায় এটি সত্য ধর্মের জন্য পূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে এভাবে অবশ্যই সাক্ষ্য সাব্যস্ত হতে পারে যে এমন দুটি পক্ষ যারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের সত্য হওয়ার দাবীদার, তারা (আরোগ্যদানের উদ্দেশ্যে) কয়েকজন রুগী ধরুন বিশজন রুগী লটারীর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে ভাগ করে নেবেন। এরপর যে পক্ষের রুগীরা প্রতিদ্বন্দ্বী অপর পক্ষের রুগীদের তুলনায় অনেক বেশি আরগ্য লাভ করবে সে পক্ষটিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কিছুকাল পূর্বে এ দেশে (ভারতবর্ষে) আমি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অনুরূপভাবে আহ্‌বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়া দেয়নি। কিন্তু আমি সত্য সত্যই বলছি ডুই অথবা ডুইয়ের সমশ্রেণীর অন্য কেউ যদি এ

প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আমার সম্মুখে আসে তাহলে আমার খোদা তাকে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত করবেন। কেননা সে মিথ্যাবাদী এবং তার খোদাও নিছক মিথ্যার এক ঝুলি মাত্র। কিন্তু আফসোস, এত ব্যবধানে থেকে এ মুকাবিলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তবে খুশির বিষয় ডুই নিজেই বিবাদ নিষ্পত্তির এ পন্থা পেশ করেছেন যে মুসলমানরা মিথ্যেবাদী, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিবাদ মীমাংসার এ পন্থাটিতে আমি এটুকু সংশোধন করছি যে সব মুসলমানকে লক্ষ্যস্থল বানাবার প্রয়োজন নেই। এতে করে তো ডুইয়ের হাতে ধূর্ত প্রতারকদের মত এ অজুহাত অবশিষ্ট থেকে যাবে যে মুসলমানরা ধ্বংস হবে না কিন্তু পঞ্চাশ, ষাট বা একশ বছর পর ইতোমধ্যে ডুই নিজে মারা যাবেন। তখন কোন ব্যক্তি তার কবরের পার্শে গিয়ে তাকে অভিযুক্ত করবে: 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।' অতএব ডুইয়ের যদি সোজাসরল নিয়্যত হয়ে থাকে এবং তিনি জানেন যে এ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তার বানানো খোদা মরিয়ম পুত্রই তাকে দিয়েছেন, তাহলে এ প্রতারণামূলক পন্থাটি তাঁর অবলম্বন করা উচিত নয়। কেননা এর মাধ্যমে কোন নিষ্পত্তি হবে না। কাজেই সঠিক পন্থা বরং এটাই, তিনি যেন তার কৃত্রিম খোদার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমার সাথে উল্লেখিত বিষয়ে মোকাবেলা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) করেন। আমি একজন বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তি। আমার বয়স খুব সম্ভব ছেষট্টি বছরের বেশি এবং বহুমূত্র ও দাস্ত রোগ দেহের নিম্নাংশে এবং মাথাঘোরা ও নিম্নরক্তচাপ দেহের উর্ধা অংশে রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার জীবন বা আয়ু আমার স্বাস্থ্যে নির্ভরশীল নয় বরং আমার খোদার আদেশের ওপর নির্ভরশীল। অতএব ডুইয়ের কৃত্রিম খোদার এতটুকুও শক্তি থাকলে নিশ্চয় তাকে আমার বিপক্ষে দাঁড়াবার অনুমতি দেবেন। সব মুসলমানকে ধ্বংস করার বিনিময়ে যদি কেবল আমাকে ধ্বংস করলে কাজ হয়ে যায়, তাহলে খুব বড় একটি নিদর্শন ডুইয়ের হাতে এসে যাবে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিয়মপুত্র যীশুকে খোদা হিসেবে মেনে নেবে। আর সেই সাথে ডুইয়ের রিসালতকেও মেনে নেবে। আমি সত্যসত্যই বলছি, খ্রিষ্টানদের খোদার প্রতি জগদ্ব্যাপী সব মুসলমানের ঘৃণাকে যদি বাটখাড়ার এক পাল্লায় স্থাপন করা হয় এবং অপর পাল্লায় আমার ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিকে রাখা হয়, তাহলে খ্রিষ্টানদের কৃত্রিম খোদার প্রতি আমার ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি সব মুসলমানের মিলিত ঘৃণার চেয়ে ওজনে বেশি সাব্যস্ত হবে।

আমি সব পাখীর চেয়ে কবুতর (এর মাংস) খেতে বেশি পছন্দ করি। কেননা এটি খ্রিষ্টানদের (বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের) খোদা! জানি না, ডুইয়ের এ বিষয়ে কী মত। তিনিও কি এর নরম নরম হাড় দাঁতের নিচে রেখে চিবান অথবা খোদা

হওয়ার সাদৃশ্যের কারণে এর প্রতি কিছুটা দয়া করেন এবং এর নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতি? এ দেশের হিন্দুরা যখন থেকে গরুকে পরমেশ্বরের অবতার বলে মেনেছেন, তখন থেকে তাঁরা কখনো গরু খান না। কাজেই তারা এই খ্রিষ্টানদের চেয়ে শ্রেয় সাব্যস্ত হয়েছেন, ভাল অবস্থায় রয়েছেন। যারা এ কবুতরকে এজন্য কোন মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দেয়নি যে কবুতরের সাদৃশ্যে ও আকারে তাদের সেই খোদা প্রকাশিত হয়েছেন, যিনি মসীহকে আকাশ থেকে ডেকে বলেন, তুমি আমার প্রিয় পুত্র। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে তাঁদের বিশ্বাস অনুয়ায়ী কবুতর যীশু খ্রিষ্টের পিতা বলে প্রতীয়মান হয়। অন্য কথায় কবুতর খোদার পিতা সাব্যস্ত হয়। তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানরা এর (মাংস) খাওয়া থেকে বিরত হয়নি। অথচ এটি খোদাওন্দ খোদা বলে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। খোদা যখন তৌরাতে একথা বলেন যে তিনি আদমকে নিজ আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই মানুষের মাংস মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। তথাপি কী কারণে মসীহকে খোদার পুত্রের অধিকার দেয়ার দরুন খ্রিষ্টানদের খোদার পিতা বলে প্রতীয়মান কবুতরকে হত্যা করে এর মাংস ভক্ষণ করা হয়? শুধু তাই নয়, বরং এর মাংসের প্রশংসাও করা হয়। যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া ১৯ খন্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, কবুতরের মাংস সব পাখীর চেয়ে বেশি সুস্বাদু হয়ে থাকে। যেসব লোকের সৌভাগ্যক্রমে কবুতরবৎ 'ফ্রুট চিকেন' খাওয়ার সুযোগ ঘটেছে তারা এ সাক্ষ্যটি দিয়েছেন। আর ইহুদীদের শরীয়ত অনুযায়ী যার ছাগল কুরবানী দেয়ার সামর্থ্য নেই সে কবুতর জবাই করবে (লুক, ২৩ : ২৪) এবং মরিয়মও দুটি কবুতর জবাই দিয়েছিলেন, কেননা তিনি গরীব ছিলেন (লুক, ২ : ২৪)। এখন লক্ষ্য করুন এক দিকে তো কবুতরকে খোদা বানানো হয়, কিন্তু অপর দিকে কবুতরের গলায় সব সময় ছুরি চালানো হয়। মসীহ্ তো শুধুমাত্র একবার ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে সব খ্রিষ্টানের সুপারিশকারী বনে যান। কিন্তু বেচারী কবুতর এই সুপারিশ করণ থেকে কোন অংশ পেলো না! অথচ তার মাংসের প্রতিটি টুকরো দাঁতের নিচে চিবানো হয়। সুতরাং আমি গতকাল একটি সাদা রঙের কবুতর খেয়েছিলাম। কাজেই 'রূহুল কুদুস'-এর সাহায্যে আমার হৃদয়ে এ বিষয়টির উদ্রেক হয়। ইনসাইক্লোপিডিয়ায় যে পাঁচ শ'রকম কবুতরের কথা লিখা হয়েছে এটিও আমার মতে ত্রুটিযুক্ত। কেননা এতে সেই কবুতরকে শামিল করা হয় নি, যার আকৃতিতে খ্রিষ্টানদের খোদা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কাজেই এ বর্ণনাটির এভাবে সংশোধন করা উচিত যে, কবুতর ৫১ রকম। সেই সাথে এমর্মে এর ব্যাখ্যা করে দেয়া উচিত যে এটি এক সেই নতুন রকমটিকে শামিল করা হয়েছে যে রকমটিতে খোদা যীশু মসীহ্র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আমি এ রকম ব্যক্তির ঘোর শত্রু যে কোন নারীর গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেও মনে করে, সে কিনা খোদা। যদিও আমি মরিয়ম পুত্র মসীহকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে নির্ধারণ করি। তিনি কখনও খোদা হওয়ার দাবী করেন নি। তবে আমি তেমন দাবীকারককে সব পাপীর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। আমি জানি এবং আমাকে দেখানো হয়েছে যে মরিয়ম পুত্র মসীহ্ উক্ত মিথ্যা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সত্যবাদী। কয়েক বার (দিব্যস্বপ্নে) আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্যাৎ হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনি তাঁর বিনয় এবং উপাসকত্ব অভিব্যক্ত করেন। একবার আমি এবং তিনি কাশ্‌ফ তথা দিব্যাবস্থায় যা অন্যকথায় জাগ্রত অবস্থা ছিল, আমরা উভয়ে এক জায়গায় বসে একই বাটিতে গরুর মাংস খাই।[৩৮] তিনি আমার প্রতি তাঁর অমায়িকতা ও ভালোবাসা পূর্ণ আচরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন যে তিনি আমার ভাই এবং আমিও অনুভব করি যে তিনি আমার ভাই। তখন থেকে আমি তাঁকে এক ভাই বলে মনে করি। অতএব যা আমি দেখেছি তদনুযায়ী আমার বিশ্বাসও এটাই যে তিনি আমার ভাই। যদিও মহা ঐশী প্রজ্ঞায় আমার ওপর তাঁর তুলনায় বেশি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে এবং আমাকে তাঁর তুলনায় বেশি অনুগ্রহ ও কৃপার প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে। তিনি ও আমি রূহানীয়তে তথা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একই জহরতের দুটি টুকরো বিশেষ। এ কারণেই আমার আগমন তাঁরই আগমন। আমাকে যে অস্বীকার করে, সে তাঁকেও অস্বীকার করে। তিনি আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন। অতএব যে আমাকে দেখে অসন্তুষ্ট হয়, আমাদের উভয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই– আমার সাথেও না এবং মরিয়মপুত্র মসীহর সাথেও না। মরিয়মপুত্র মসীহ্ আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং আমি খোদা তাআলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মুবারক (ধন্য) সে ব্যক্তি, যে আমাকে চিনে ও সনাক্ত করে। হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যার দৃষ্টির কাছে আমি গোপন থাকি।[৩৯]

বিনীত

**মির্যা গোলাম আহমদ**

কাদিয়ান নিবাসী

---

৩৮. তাযকিরাহ্ ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩৯।

৩৯. রিভিইউ অফ রিলিজিওনস (উর্দু) সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪৮।

# জন আলেকজাণ্ডার ডুই-এর নামে

## দ্বিতীয় খোলাপত্র

ডুই যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চিঠির উত্তর দিল না তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডুইয়ের নামে আরেকটি চিঠি লিখলেন যা আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর এই বিপুল প্রচারণা সত্ত্বেও ডুই এ চ্যালেঞ্জেরও কোন উত্তর দিলো না এবং তার 'লিভ্‌স্ ওফ হিলিং' পত্রিকায়ও এর কোন উল্লেখ করলো না। তবে ইসলাম সম্পর্কে সে তার অশ্লীল বক্তব্য অব্যহত রাখে। সুতরাং ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সে তার পত্রিকায় এ বাক্যগুলো প্রকাশ করলো – 'আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করি, সেই দিন যেন শীঘ্র আসে যখন ইসলাম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হে খোদা! তুমি আমার এ প্রার্থনা গ্রহণ কর। হে খোদা, তুমি ইসলামকে ধ্বংস কর'। ইতঃপূর্বে তো কেবল গোলমেলে ভাষায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কিন্তু এই চিঠির পর স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের ধ্বংস হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করাটা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণেরই নামান্তর ছিল। কেননা সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি মনে করতো (সম্পাদক)।

এরপর ১৫ আগস্ট ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সে আবারও ইসলামের উল্লেখ করে লিখলো– 'মানবতার মুখে এই অত্যন্ত কুৎসিৎ কলঙ্ককে (অর্থাৎ ইসলামকে) জায়ন ধ্বংস করেই ছাড়বে'।

অতএব সে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগীরণ থেকে নিবৃত্ত হলো না এবং প্রকাশ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও অবতীর্ণ হলো না, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন যা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যপক ভাবে প্রচারিত হলো। এ বিজ্ঞপ্তিটিও ব্রিটিশ ও আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। এ বিজ্ঞপ্তিটির শিরোনাম ছিল– 'পিগেট ও ডুই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী'। শিরোনামটির থেকেই যেমন প্রকাশ পায়, এখন এটি শুধুমাত্র মুবাহালার ডাকই ছিল না, বরং এতে সুস্পষ্টভাবে ডুইয়ের ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছিল। নিম্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পত্রটির উর্দু তরজমা (বঙ্গানুবাদ) পেশ করা গেল। এ তরজমাটি 'রিভিউ অফ রিলিজওনস' ষষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

## পত্র নম্বর ১৫
## জন আলেকজাণ্ডার ডুই এর নামে দ্বিতীয় খোলাপত্র

পৃথিবী যখন পাপাচারে ও অংশীবাদিতায় কলুষিত এবং মানবসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম কৃপার তাগিদে পূর্ণ স্বভাবজ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মানুষকে তাঁর নিজের সাথে এক পবিত্র সম্পর্ক দান করে ও নিজ সম্ভাষণ ও বাক্যলাপে ভূষিত করে এবং তাকে নিজ ভালোবাসার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত করে তার মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীকে পাক-সাফ করতে চান। মানুষ অবশ্যই খোদায় পরিণত হতে পারে না, কিন্তু তাঁর সাথে সে অতি নিবীড় সম্পর্কাবলী গড়ে নেয়। সে যখন সম্পূর্ণ খোদার জন্য হয়ে যায় এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র করতে করতে এক স্বচ্ছ আয়নার মত হয়ে পড়ে, তখন সে আয়নায় প্রতিবিম্বাকারে খোদার চেহারা দৃশ্যমান হয়। এমতাবস্থায় সে মানবীয় ও ঐশী উভয় রকম গুণাবলীতে এক ধরনের এক ও অভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়। কখনো তার মাধ্যমে ঐশী গুণাবলীর বহির্প্রকাশ ঘটে, কেননা তার আয়নাবৎ সত্তায় খোদার চেহারা প্রতিবিম্বিত হয়। আর কখনো তার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলীর বহির্প্রকাশ ঘটে, কেননা সে মানুষ। এ রকম মানুষদের যারা দেখে থাকে তারা কখনো ধোঁকা খেয়ে এবং কেবলমাত্র এক দিকের চমৎকারিত্ব দেখে তাদেরকে খোদা বলে ভাবতে শুরু করে। দুনিয়াতে সৃষ্টিপূজা এ কারণেই এসেছে এবং শত শত মনুষকে এ ধোঁকার দরুনই খোদা বানানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের এ যুগে যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত মসীহকে খোদা বলে জানে তারা যতটা এ ধোঁকার শিকার, ততটা অন্য কোন জাতি শিকার নয়। মসীহর শত শত বছর পূর্বে যাদেরকে খোদা বানানো হয়েছিল যেমন রাজা রামচন্দ্র, রাজা কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ আমাদের এ যুগে তাঁদের অনুসারীরা তাদের নিজেদের এসব ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়ে চলছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হযরত মসীহর অনুসারীরা এ যুগেও অহেতুক ঈশ্বরত্বের পদবী তাঁকে দিয়েই যাচ্ছে। যদিও এ ধারণাটির অসত্যতা স্বতঃসিদ্ধভাবে এত স্পষ্ট ছিল যে কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আফসোস, খ্রিষ্টানরা এখনও এ যুগের হাওয়া থেকেও দূরে সরে বসে আছেন। বরং তাদের কোন কোন ব্যক্তি যখন দেখলেন অধুনা যুগ স্বয়ং প্রতিনিয়ত এ রকম বেহুদা ও বৃথা ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে চলে

যাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের সাধারণ পদ্ধতিগুলোর প্রতি নিরাশ হয়ে এক নয়া পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাদের মাঝে কেউ এলিজা (প্রতিশ্রুত ইলিয়াস) বনে গিয়েছেন আবার কেউ স্বয়ং মরিয়ম পুত্র মসীহ তথা খোদা হওয়ার দাবী করে বসেছেন। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে একথা বুঝায় যে, লন্ডনে তো মি. পিগেট খোদা হওয়ার ও মসীহ হওয়ার দাবী করেছেন। আর আমেরিকায় মি. ডুই এলিজা বনে বসেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে মরিয়মপুত্র মসীহ্ পঁচিশ বছর নাগাদ পৃথিবীতে এসে যাবেন। উভয়ের মাঝে পার্থক্য এটাই যে ডুই তো কাপুরুষতা দেখিয়েছেন। এলিজা বনে বসার ক্ষেত্রেও নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়াকে ভয় পেতে থাকেন তাই মসীহ না বনে বরং তাঁর খাদিম বনেছেন। পিগেট অনেক সাহস দেখিয়েছেন। স্বয়ং মসীহ বনে গেছেন। শুধু মসীহই নয় বরং খোদা হওয়ারও দাবী করেছেন। এখন লন্ডনবাসীদের জন্য যাদের শহরে খোদা নেমে এসেছেন কোন রোগ-ব্যাধি ও আপদ বিপদের কিইবা আশংকা? কিন্তু আমি শুনেছি লন্ডনে কিছু সংখ্যক ইহুদীও বাস করে। সে কারণে অবশ্যই স্বভাবত তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে যে এ লোক তো সেই মসীহ্ যাকে ক্রুশ থেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণে ভুলবশত জীবিতাবস্থায় নামানো হয়, তারপর সুযোগ পেয়ে সে প্রাচ্য অঞ্চলগুলোর দিকে পালিয়ে যায়। অবশেষে এখন তাকে এমনভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হোক যাতে জীবন সাঙ্গ হয়ে যায় তারপর আর যেন কোন দিকে পালাতে না পারে। সেই সাথে এ সংশয়ের ব্যাপারটিও রয়েছে যে খ্রিষ্টানদের না আবার খেয়াল এসে যায়, আগের প্রায়শ্চিত্ত পুরান ও অকেজো হয়ে পড়েছে এবং মদ্যপান ও ঘোর অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব প্রমাণও করে দিয়েছে, সে আগের প্রায়শ্চিত্তের প্রভাব নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এখন এক নূতন খুনের (রক্তের) প্রয়োজন! অতএব আমি সহানুভূতির সাথে বলছি, মি. পিগেটের উচিত হবে এ সম্প্রদায় দু'টির থেকে সাবধান থাকা।

মোটকথা, এ যুগে যখন পৃথিবীতে এমন সব মিথ্যা ও অপবিত্র দাবী করা হয়েছে, এ কারণে তখন খোদা যিনি পৃথিবীতে পাপ ও অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করেন না তিনি আমাকে নিজ মসীহ করে পাঠিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর অন্ধকারকে নিজ তৌহীদের মাধ্যমে আলোকিত করেন এবং শিরকের কলুষতা থেকে পরিত্রাণ দান করেন। অতএব আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যার আগমন এরূপ যুগে

অবধারিত ছিল। আর আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ তা কেবল মৌখিকভাবেই বলছি না, বরং আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তিনি এই সাক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শত শত নিদর্শন আমার জন্য প্রদর্শন করেছেন এবং (এখনো) করছেন। আমি সত্যসত্যই বলছি, আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ আমার পূর্বে আগত মসীহর তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। আমার আয়নায় তাঁর চেহারা তার চেয়ে অনেক ব্যাপক আকারে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী মসীহর আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। আমি যদি কেবল মৌখিকভাবে বলে থাকি, তাহলে আমি মিথ্যেবাদী। কিন্তু তিনি যদি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করে থাকেন, তাহলে কেউ আমাকে মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত করতে পারে না। আমার (সত্যতার) জন্য তাঁর সহস্র সহস্র সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যা আমি গুণে শেষ করতে পারি না। কিন্তু সেসব সাক্ষ্যের মাঝে একটি এও যে এই সাহসী মিথ্যা দাবীকারক অর্থাৎ পিগেট, যিনি লন্ডনে খোদা হওয়ার দাবী করেছেন, তিনি আমার চোখের সামনে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবেন। দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি হলো, মি. ডুই যদি আমার মুবাহালার আবেদন গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে আমার মোকাবেলায় দাঁড়ান, তাহলে আমার দেখতে দেখতেই অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখ-কষ্টের সাথে এ নশ্বর জগৎ ছেড়ে যাবেন। এ দুটি সেই নিদর্শন, যা ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হায়! তারা যদি এর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতেন এবং এগুলো থেকে উপকার লাভ করতেন!

স্মরণ রাখা আবশ্যক, এখনো মি. ডুই আমার এই মুবাহালার আবেদনের কোন উত্তর দেন নি এবং নিজ পত্রিকায়ও কোন সংকেত করেন নি। সে কারণে আমি আজ ২৩ আগস্ট, ১৯০৩ তারিখ থেকে তাকে পুরো সাত মাসের আরো অবকাশ দিচ্ছি। তিনি যদি এ সুযোগে আমার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন এবং মোকাবেলা করার জন্য আমার প্রকাশিত প্রস্তাব পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নিজ পত্রিকায় সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ছেপে দেন, তাহলে অতি শীঘ্র দুনিয়া এ মোকাবেলার পরিণতি দেখতে পাবে। আমার বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি এবং তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৫০ বছরের যুবক, যাকে আমার তুলনায় মাত্র একজন শিশুই বলা যায়। কিন্তু আমি আমার অতি বয়ঃবৃদ্ধির কোন পরোয়া করি না। কেননা এই মুবাহালার ফয়সালা বয়সের শাসনের মাধ্যমে হবে না। বরং সেই খোদা যিনি সব

ন্যায়বিচারকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিচারক তিনিই এর ফয়সালা করবেন। আর ডুই যদি এ মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যান তাহলে আজ আমি সারা আমেরিকা ও ইউরোপের অধিবাসীদেরকে এ বিষয়ে সাক্ষী নির্ধারণ করি যে তার এ ভূমিকাটিও তার পরাজয় বলে বিবেচিত হবে এবং তার এ আচরণে জনসাধারণেরও বিশ্বাস করা উচিত তার প্রতিশ্রুত এলিয়াস বা ইলিজাহ হওয়ার এসব দাবী নিছক মুখের ফাঁকা বুলি ও প্রতারণা ছিল। আর যদিও সে এভাবে মৃত্যু থেকে পালাতে চাইবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ অসাধারণ মোকাবেলাকে এড়িয়ে যাওয়াও এক ধরনের মৃত্যুই বটে। অতএব সুনিশ্চিত বিশ্বাস করুন যে তার সিহুন (জায়েন) এর ওপর অতি শীঘ্র এক বিভীষিকা এক মহা বিপদ আসন্ন। কেননা উল্লেখিত দুটি অবস্থার যে কোন একটিতে সে (আল্লাহর কাছে) ধরা পড়বে।

এখন আমি এ দোয়ার মাধ্যমে আমার এ বক্তব্য শেষ করছি, হে সর্বশক্তিমান ও পরিপূর্ণ (গুণাবলীর অধিকারী) খোদা! যিনি সর্বদা নবীদের ওপর সুপ্রকাশিত হতে থাকেন এবং হতে থাকবেন, হে খোদা! তুমি এ ফয়সালাটি শীঘ্র (তরান্বিত) কর, পিগেট এবং ডুই-এর মিথ্যাচার মানুষের কাছে প্রকাশ করে দাও। কেননা এ যুগে তোমার অসহায় বান্দারা নিজেদেরই মত মানুষের উপাসনার কবলে বন্দি হয়ে তোমাথেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। অতএব হে আমাদের প্রিয় খোদা! তাদেরকে তুমি সৃষ্টি পূজার প্রভাববলয় থেকে উদ্ধার কর এবং নিজ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরা কর, যা এ যুগের জন্য তুমি তোমার নবীদের মাধ্যমে দান করেছ। এসব কন্টক থেকে ক্ষতবিক্ষত লোকদের বের করে আন এবং প্রকৃত পরিত্রাণের উৎসের মাধ্যমে তাদের পরিতৃপ্ত কর। কেননা এসবই তোমার তত্ত্বোপলব্ধি ও তোমার প্রেম ভালোবাসায় নিহিত, কোন মানুষের রক্তে নির্ভরশীল নয়। হে অতি দয়ালু বার বার কৃপাকারী মহানুভব খোদা! সৃষ্টিপূজায় তাদের বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। এখন তাদের প্রতি তুমি দয়াপরবশ হও এবং তাদের চোখ খুলে দাও। হে সর্বশক্তিমান ও অতি কৃপালু খোদা! সবকিছুই তোমার ক্ষমতায় রয়েছে। এখন তুমি এ বান্দাদেরকে শিরকের বন্দিত্বের কবল থেকে রেহাই দান কর এবং মসীহর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া ও রক্ত দেওয়ার (মিথ্যা) ধ্যান-ধারণা থেকে রক্ষা কর। হে সর্বশক্তিমান ও মহানুভব খোদা এদের জন্য আমার দোয়া শোন এবং আকাশ থেকে এদের হৃদয়ে এক নূর অবতীর্ণ কর যাতে তারা তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে

পারে। কে ভাবতে পারে যে তারা তোমায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে? কার বিবেকে সাড়া দেয় যে তারা সৃষ্টিপূজা ছেড়ে দিয়ে তোমার ডাক শোনবে? তবু হে খোদা! তুমি সবই (করতে) পার। তুমি নূহের যুগের ন্যায় এদেরকে ধ্বংস করে দিও না, অবশেষে এরা যে তোমারই বান্দা বরং এদের প্রতি তুমি দয়াপরবশ হও এবং এদের অন্তঃকরণকে সত্য গ্রহণ করার জন্য উন্মোচিত কর। প্রত্যেক তালার চাবিকাঠি তোমার হাতে রয়েছে। যেহেতু তুমি আমাকে এ কাজের জন্য পাঠিয়েছ, অতএব আমি বিফলতার মৃত্যু থেকে তোমার সত্তার আশ্রয় চাই। আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, তুমি তোমার ওহীর (ঐশীবাণীর) মাধ্যমে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছ সেগুলো তুমি নিশ্চয়ই পুরা করবে। কেননা তুমি আমাদের খোদা সত্যবাদী খোদা। হে আমাদের অতি দয়ালু বার বার কৃপাকারী খোদা, এ দুনিয়াতে আমার বেহেশ্‌ত কী? ব্যাস্! এটাই যে তোমার বান্দারা সৃষ্টিপূজা থেকে মুক্তি পেয়ে যাক। অতএব আমার বেহেশ্‌ত আমাকে দান কর এবং এ সব লোকের পুরুষদের, এদের নারীদের ও এদের শিশু-সন্তানদের কাছে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দাও, যে খোদার দিকে তওরাত এবং অন্যান্য সব পবিত্র কিতাব আহ্বান করে, তাঁর সম্পর্কে এরা অনভিজ্ঞ। কাজেই হে কাদের ও করীম (সর্বশক্তিমান ও মহানুভব) খোদা! আমার দোয়া সব শোন, সবই গ্রহণ করে নাও, সব ক্ষমতা যে তোমারই রয়েছে। আমীন, সুম্মা আমীন।[৪০]

***উল্লেখ্য,*** *হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে ডুইয়ের পরিণাম এবং তার ধ্বংস সম্পর্কিত সুস্পষ্ট সংবাদটি আমেরিকার বহুসংখ্যক পত্র-পত্রিকা বড় বড় শিরোনামের মাধ্যমে প্রকাশ করে এবং এরপর অবিকল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ডুই চরম লাঞ্ছনার সাথে অত্যন্ত করুণ ও অসহায় অবস্থায় মার্চ, ১৯০৭ সালে এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করে এবং তার প্রতিষ্ঠিত জায়েন শহর উৎসন্ন হয়ে যায়* ***(–সৈয়দ আব্দুল হাই)।***

৪০. রিভিউ অফ রিলিজিওনস উর্দু, এপ্রিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৫।

## পত্র নম্বর ১৬
## একজন ইংরেজের নামে হযরত আকদাসের একটি চিঠি

আমার প্রিয় বন্ধু!

আপনার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রটি পেলাম। এর বিষয়বস্তু অবহিত হয়ে এবং আপনার কুশল সংবাদ জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ইরেজী জানা কোন লোক না পাওয়ার দরুন এ চিঠিখানা কিছু দেরীতে লিখার জন্যে আমি দু:খিত। এ পত্র লিখা অবধি আমি আমার পরিবার পরিজনসহ মঙ্গলমত আছি এবং দোয়া করি, খোদা তাআলা উভয়পক্ষের সবাইকে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ও অবাঞ্ছিত বিষয়াদি এবং পরীক্ষাগুলো থেকে রক্ষা করে তাঁর বিশেষ রহমত ও চিরস্থায়ী করুণায় ভূষিত করুন। আমার হৃদয়ে দিন দিন আপনার অবিচল দৃঢ়তা এবং অপরিবর্তনীয় আন্তরিকতার কারণে আপনার প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা বেড়ে চলেছে এবং আমার মনে হয়, আপনার মত একজন অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান বন্ধু পেয়ে আমি যেন একটি রত্ন ভান্ডার পেয়েছি কিম্বা একটি বাজ পাখি আমার হস্তগত হয়েছে, যার দরুন বড় বড় সুফলের আশা-প্রত্যাশা রাখি। আপনার জন্য দোয়া করি, দয়াময় খোদা তাআলা প্রতিনিয়ত নিজ প্রেম ও তত্ত্বোপলব্ধি, বিশ্বস্ততা, দৃঢ়চিত্ততা, অধ্যবসায় ও অবিচলতায় আপনাকে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করুন, এবং আমার হৃদয়ের সাথে আপনার হৃদয়কে একীভূত করে এক ও অভিন্ন করে দিন। ইসলামের প্রতি আপনার টান ও ভালোবাসা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে খোদা তাআলা আপনার হৃদয়কে অত্যন্ত সরল সুস্থ-সবল ও সুযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং একটি ভিন জাতির জন্যে আপনাকে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা বানাতে চেয়েছেন। কেননা বিশ্বজগতদর্পণে দৃষ্টিপাতে যে ধর্মকে আমরা পূর্ণাকারে প্রত্যক্ষ করতে পারি সেটি কেবল ইসলামই বটে। ইসলাম কোন নতুন বিষয় শিখায় না এবং নতুন কোন উপাস্যও উপস্থাপন করে না এবং নাজাত বা পরিত্রাণের কোন অস্বাভাবিক ও অচেনা পন্থাও আবিষ্কার করে নি এবং প্রকৃতির মহাগ্রন্থের সাক্ষ্যযুক্ত পরিপূর্ণ ঐশীগুণাবলীর মাঝে কোন কিছু কমও করে না এবং অননুপযোগী কোন গুণও তাঁর দিকে আরোপ করে না। বরং কুরআনের শিক্ষা (বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির সর্বত্র ছড়ানো) আল্লাহ্ তাআলার কার্যাবলীতে অঙ্কিত

অবয়ব ও ইঙ্গিতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করে, আর সেগুলোর সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন বিধিবিধানই প্রবর্তন করে, সেগুলোকে স্মরণ করায় এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। কুরআন করীমের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্টাবলীর মাঝে একটি বড় বৈশিষ্ট্য এটিই যে এতে এক কণা পরিমাণও বানোয়াট ও কৃত্রিমতার গন্ধ নেই। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবে যে সব শক্তি ও ক্ষমতা নিহিত রয়েছে সেগুলো কুরআনের শিক্ষার সামনে এমনই, যেমন সেগুলো যেন এক কাঠামো বিশেষ, যা স্বভাবত আত্মাবৎ সেই শিক্ষাকে ধারণ করার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে। যে ব্যক্তি এ ধর্মের পুরোপুরি অবয়ব দেখে নেয়ার উপযোগী সরল স্বভাবের অধিকারী হয় সে এই নেয়ামত গ্রহণে বঞ্চিত হতে পারে তা আমি ভাবতে পারি না। এ উদ্দেশ্যেই সেই পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে যার (ইংরেজী) অনুবাদ আপনার খিদমতে পাঠাতে চাই। দুঃখিত যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কিছু বাধ্যবাধকতার দরুন শীঘ্র নিজের ওয়াদা পুরণ করতে পারি নাই। আমি যদি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হতাম তাহলে এ অসুবিধাগুলো আমার হতো না। যা হোক আশা রাখি, এখন আমার দ্বিতীয় পত্রটি সে পুস্তকের কোন অংশসহ আপনার কাছে পৌঁছবে। এ ওয়াদা করতে পারি না কবে নাগাদ পৌঁছবে। তবে আশা করি, সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা এতে খুব একটা বিলম্ব ঘটতে দেবেন না। খোদা তাআলা আপনার সাথে থাকুন এবং সে (শুভ)-দিনটি আসুক যখন পত্রালাপের মাধ্যমে যেমন এক রূহানী সাক্ষাৎ লাভ হচ্ছে, তেমনি বাহ্যিক সাক্ষাতেও যেন আমরা সুখী হতে পারি। আমীন। ওয়াস্‌সালাম–

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
**গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর।[৪১]

৪১. আল হাকাম, ৫ম খন্ড, ২৪ জুন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩।

## পত্র নম্বর ১৭

# বাঁশবেরেলীর একজন মুসলমানের চিঠির উত্তর

### [ভূমিকা মূলক বক্তব্য]

১৯০৬ইং সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে একজন মুসলমান হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামের সমীপে এক খ্রিষ্টান পাদ্রীর লেখা 'ইয়ানা'বীউল-ইসলাম' নামক পুস্তকে প্রভাবান্বিত হয়ে একটি বেদনাত্মক পত্র লিখেন এবং সে পুস্তকটির উত্তর দানের জন্য আকুল আবেদন জানান। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামকে তো খোদা তাআলা ইসলামের গৌরব প্রকাশ এবং ক্রুশভঙ্গের উদ্দেশ্যেই প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন। তিনি এর উত্তর লিখেন। সে উত্তরটি আলাদা এক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও সে উত্তরটি স্বয়ং একটি পুস্তিকা। তবু তা একটি চিঠিরই উত্তর আর সে হিসেবে একটি চিঠি বটে। কাজেই আমি এ পুস্তকের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর পুরোটা (এখানে) লিপিবদ্ধ করা জরুরী বলে মনে করি। এ উত্তরটি পাঠে জানতে পারবেন, ইসলামের জন্যে কী পরিমাণ গয়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। এ পত্রটির তিনি 'চাশমায়ে মসীহি' নামকরণ করেছিলেন (–ইরফানী কবীর)।

# 'চশমা-এ-মসীহী'

## 'ইয়ানাবীউল ইসলাম'-এর উত্তরে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনি 'ইয়ানাবীউল ইসলাম' নামক খ্রিষ্টান পুস্তক পাঠ করে আমাকে যে পত্র লিখেছেন তা আমি অতি পরিতাপের সাথে পাঠ করেছি। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যাদের খোদা মৃত, যাদের ধর্ম মৃতধর্মে পরিণত, যাদের ধর্মগ্রন্থ জীবনশক্তিশূন্য ও আধ্যাত্মিক চক্ষুহীনতায় যারা সর্বস্বান্ত ও প্রাণহীন তাদের অসত্য কথা ও অপবাদ সম্বলিত কাহিনী অধ্যয়নে আপনি আজ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

স্মরণ রাখবেন, এ জাতি শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহে প্রক্ষেপ করেনি বরং স্বধর্মের উন্নতিকল্পে অসত্য প্রচার ও অপবাদ সম্বলিত পুস্তক রচনায় জগতের যাবতীয় জাতির অগ্রণী হয়েছে। সত্যের সাহায্যকল্পে যে জ্যোতি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে বহুসংখ্যক প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা সত্য ধর্মকে স্পষ্ট ও পৃথক করে দেখিয়ে দেয়, সে স্বর্গীয় জ্যোতি তাদের কাছে মজুদ নেই বলে তারা চিরজীবিত ও জ্যোতির্ময় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে মানব হৃদয়ে অসন্তোষ জন্মাতে নানাবিধ মিথ্যা কথা, প্রতারণা, ছলনা, ধোকাবাজী, জালিয়াতী প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বন করে।

হে স্নেহবর! এদের হৃদয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কালিমাময়। এরা খোদাকে ভয় করে না। কিভাবে মানুষ আঁধারের সাথে প্রেম করে আলো পরিত্যাগ করবে দিবারাত্রি এরা সেই উপায় উদ্ভাবনায় ব্যস্ত।

আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে এরূপ লোকের প্রণীত পুস্তক পাঠে বিচলিত হতে দেখে আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যে যাদুকররা মূসা নবীর সম্মুখে রজ্জুগুলোকে সাপে পরিণত করে দেখিয়েছিল এরা সেই যাদুকরদেরকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু যেমন মূসা খোদার নবী বলে তাঁর যষ্টি তাদের সাপগুলোকে গিলে ফেলেছিল, সেরূপ কুরআন শরীফ খোদার যষ্টি বলে দিন দিন এদের রজ্জু নির্মিত সর্পগুলোকে

গ্রাস করছে। এমন এক সময় আসবে বরং সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন এ রজ্জু নির্মিত সর্পগুলোর নাম ও চিহ্ন ধরাতল হতে বিলুপ্ত হবে।

'ইয়ানাবীউল ইসলাম' প্রণেতা যদিও এটা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে কুরআন অমুক অমুক গল্পকাহিনী বা গ্রন্থসমূহ হতে সঙ্কলিত হয়েছে কিন্তু তার কৃতকার্যতা, জনৈক ইহুদী বিজ্ঞ পন্ডিত ইঞ্জিলের মূল নির্ণয় করতে যে চেষ্টা করেছেন, তার কৃতকার্যতার হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। উক্ত পন্ডিত তার মতে সপ্রমাণ করেছেন যে ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষা ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তালমূদ' ও অন্যান্য কতগুলো ইহুদী পুস্তক হতে সংগৃহীত। এবং অপহরণকার্য এতই সুস্পষ্ট যে পাতার পর পাতা অক্ষরে অক্ষরে নকল করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ইঞ্জিল শুধু অপহৃত সামগ্রীর সমষ্টি মাত্র। প্রকৃতপক্ষেই তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে চূড়ান্তভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত পার্বতীয় উপদেশ–Sermon on the mount-কে, যা নিয়ে খ্রিষ্টানগণ এত গর্ব করেন, তালমূদ হতে শব্দে শব্দে উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণরূপে এরই লিখিত বর্ণনা ও বাক্যাবলী বলে প্রমাণ করেছেন। এরূপে অন্যান্য পুস্তক হতে ইঞ্জিলের বহু অপহৃত বাক্য উদ্ধৃত করে জগদ্বাসীকে হতভম্ভ করে তুলেছেন। ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ সমালোচক পন্ডিতগণও আজ আন্তরিক অনুরাগের সাথে এ দিকে আকৃষ্ট। বর্তমান যুগে আমি জনৈক হিন্দু রচিত একখানা পুস্তক পাঠ করেছি। এতে তিনি ইঞ্জিলকে বুদ্ধের ধর্মনীতি হতে সঙ্কলিত ও অপহৃত পুস্তক বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়ে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা উদ্ধৃত করত এর প্রমাণ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, শয়তান বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে কয়েক স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে নানারূপে চেষ্টা করেছে বলে বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত এক অতি প্রসিদ্ধ গল্প ইঞ্জিলেও লিখিত আছে দেখে সবাই এ ধারণা করতে পারেন যে সামান্য পরিবর্তন সহ সেই অপহৃত বৌদ্ধ গল্পই ইঞ্জিলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা সুচারুরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ঈসার কবর যে কাশ্মীরের শ্রীনগরে বিদ্যমান, তাও আমি প্রমাণ দিয়ে সুসিদ্ধ করেছি। অতএব প্রতিবাদকারীগণ একথা বলতে আরও সুযোগ পান যে বর্তমান ইঞ্জিলসমূহ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মেরই এক প্রতিমূর্তি ও নকল মাত্র। এ প্রমাণসমূহের পরিমাণ এত অধিক যে এটা গোপন রাখা অসম্ভব। আরও আশ্চর্যের বিষয় ইউয্ আসফের পুরাতন ধর্ম গ্রন্থের সাথে (যা অধিকাংশ বিজ্ঞ

ইংরেজ পন্ডিতদের মতে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বেই লিখিত হয়েছিল এবং যা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে নানা দেশে প্রচারিত হয়েছে) ইঞ্জিলের অধিকাংশ কথায় এত সামঞ্জস্য আছে যে বহু স্থানে বর্ণনাগুলোতে বাক্যসমূহ এর সাথে সম্পূর্ণ একরূপ। ইঞ্জিলে বর্ণিত উপাখ্যানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে উক্ত পুস্তকেও বর্ণিত আছে। মূর্খতায় কেউ অন্ধ প্রায় হলেও বিশ্বাস করবে উক্ত পুস্তকের অবিকল বর্ণনাই অপহৃত হয়ে ইঞ্জিল সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কিছু সংখ্যক লোকের অভিমত, এটি গৌতম বুদ্ধ প্রণীত পুস্তক যা প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ছিল, পরে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। কতিপয় গবেষক ইংরেজেরও একই অভিমত। কিন্তু এটি স্বীকার করলে ইঞ্জিলের আর কিছুই বাকী থাকে না। নাউযুবিল্লাহ্, হযরত ঈসা তাঁর সমস্ত শিক্ষায় অপহরণকারী বলে প্রমাণিত হন। এ পুস্তক মজুদ রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার মতে এটা ঈসা (আ.)-এর ভারত ভ্রমণকালে লিখিত ইঞ্জিল এবং অন্যান্য ইঞ্জিল অপেক্ষা সুরক্ষিত ও পবিত্র। কিন্তু কোন কোন ইংরেজ গভেষক, একে বুদ্ধের প্রণীত পুস্তক বলে নির্দেশ করে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন, যা হযরত ঈসা (আ.)-কে চোর সাব্যস্ত করে।

এটা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য, পাদ্রী সাহেবদের ধর্মগ্রন্থগুলো লজ্জাজনকভাবে দুরবস্থায় পতিত। তাঁরা শুধু নিজেরা অনুমান করে কতগুলো ধর্মগ্রন্থকে স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থ ও কতগুলোকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন। তাঁরা চারটি ইঞ্জিলকে মূল ও সত্য বলে নির্দেশ করেন এবং শুধু কল্পনা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অবশিষ্ট প্রায় ৫৬ খানা ইঞ্জিলকে কৃত্রিম বলে প্রচার করেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। প্রচলিত ইঞ্জিল ও অন্যান্য ইঞ্জিলে অনৈক্য দেখা যায় বলে তাঁরা নিজেদের মতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু সমালোচক পন্ডিতগণ বলেন, এ ইঞ্জিলসমূহ কৃত্রিম কি সেই ইঞ্জিলসমূহ কৃত্রিম তা আমরা সঠিক বলতে পারি না। এ কারণেই সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেককালে, লন্ডনের পাদ্রীগণ যেসব ইঞ্জিলকে লোকেরা কৃত্রিম বলে ধারণা করে, সেইগুলোকে প্রচলিত চারটি ইঞ্জিলের সাথে একত্র করে একই গ্রন্থে বাঁধাই করে তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। এ সঙ্কলিত গ্রন্থের এক কপি আমার কাছে মজুদ আছে। অতএব চিন্তার বিষয়, উক্ত ইঞ্জিলসমূহ যদি প্রকৃত পক্ষেই অপ্রকৃত ও কৃত্রিম হতো, তবে পবিত্র ও অপবিত্র

পুস্তকসমূহ একই গ্রন্থরূপে বাঁধাই করায় অনেক বড় পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলত এরা সন্তোষজনকভাবে কোন গ্রন্থকেই মৌলিক বলে নির্দেশ করতে পারেন না। তারা শুধু নিজেদের মতে এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন এবং ঐকান্তিক অন্ধবিশ্বাস ও হঠকারিতাবশত কুরআন শরীফের অনুকূল ইঞ্জিলগুলোকেই কৃত্রিম বলে প্রকাশ করেন। বার্ণাবাসের ইঞ্জিল (যাতে শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে), একে শুধু এ কারণেই কৃত্রিম বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে এতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষায় ভাবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেল সাহেব তাঁর প্রণীত তফসীরে (তথা বাইবেলের ব্যাখ্যা গ্রন্থে–অনুবাদক) একজন খ্রিষ্টান সন্যাসীর উক্ত ইঞ্জিল পাঠ করেই ইসলাম গ্রহণের বিবরণ লিখে গেছেন। বস্তুত তাঁরা যেসব ইঞ্জিলকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন, নিম্নলিখিত দু'কারণেই সেগুলোকে কৃত্রিম মনে করেন। (এক) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো প্রচলিত চার ইঞ্জিলের অনুরূপ নয়। (দুই) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো কুরআনের সাথে কিছু পরিমাণে অনুরূপ। কোন কোন অসাধু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মানব এ পুস্তক কৃত্রিম–এ কথা সর্বদাবীসম্মত বলে কল্পনা করে[৪২] বলে, কৃত্রিম পুস্তকের বিবরণীই কুরআনে লেখা রয়েছে এবং এ রূপে অজ্ঞলোকদেরকে প্রতারণা করে। বাস্তবিক তৎকালীন কোন ধর্মশাস্ত্র কৃত্রিম কি মৌলিক, খোদার নতুন ওহী বা প্রত্যাদেশবাণী ছাড়া সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। খোদার ওহীতে যে বিবরণী সত্য বলে প্রকাশিত, অজ্ঞ মানব তা মিথ্যা বলে নির্দেশ করলেও তা-ই প্রকৃতপক্ষে সত্য। খোদার কথায় যা মিথ্যা বলে প্রকাশিত তা মিথ্যা।

কেউ কুরআন সম্বন্ধে যদি এ ধারণা পোষণ করে যে এসব সুপ্রসিদ্ধ বিবরণী, উপাখ্যান বা ফলকসমূহ অথবা ইঞ্জিল হতে কুরআন সংকলিত হয়েছে, তবে এটা তার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক মূর্খতা হবে। পবিত্র ও স্বর্গীয় গ্রন্থে কি কোন পুরাকালীন বিবরণী সন্নিবেশিত থাকতে পারে না? দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন হিন্দুদের বেদগ্রন্থেরও (যা কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল) কোন

৪২. খ্রিষ্টান ধর্মমতে স্বধর্মের সহায়কল্পে সব ধরনের অপবাদ ও মিথ্যা কথা অনুমোদিত ও পুণ্যকর্ম বলে উল্লেখিত (পৌলের বাক্য দ্রষ্টব্য)।

কোন সত্য বাণী কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি আমরা মনে করতে পারি, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বেদও পাঠ করেছিলেন? মূদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বাইবেল এখন সুলভ ও সুপরিচিত হলেও, প্রাচীন আরবগণ এর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তারা ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর জাতি। তাদের দেশে বিরলভাবে কোন খ্রিষ্টান বাস করলেও তার স্বধর্মের বিস্তারিত জ্ঞান ছিল না।[৪৩] সুতরাং এ অপবাদ যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এসব পুস্তক হতে অপহরণ করে এ বিবরণসমূহ কুরআন শরীফে লিখেছিলেন, এটা এক মহা অভিশাপজনক অপবাদ। আঁ হযরত (সা.) ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় জ্ঞান তো দূরের কথা, মাতৃভাষা আরবীও তিনি পড়তে জানতেন না।

সেকালে কোন্ প্রাচীন গ্রন্থ হতে বর্ণনা অপহরণ করা হয়েছিল এর প্রমাণ আবশ্যক। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকেই এই প্রমাণ দিতে হবে। অসম্ভবকে যদি সম্ভব মনে করে কল্পনা করে নেয়া হয় যে কোন কোন অপহৃত বিষয় কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তবে জিজ্ঞাস্য এই, ইসলাম ধর্মের পরম শত্রু আরব খ্রিষ্টানগণ কেন তখন নি:শব্দ হয়ে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসে ছিল? তারা কেন তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলে উঠল না, 'আমাদের গ্রন্থ হতেই অপহরণ করে ও আমাদের কাছেই শ্রবণ করে এসব বাক্য কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে?'

এটা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য, শুধু কুরআনই নিজেকে মানবশক্তি বহির্ভূত অলৌকিক গ্রন্থ বলে জোর দাবি করেছে এবং প্রবল প্রতাপে ঘোষণা করছে[৪৪] এর

৪৩. আরবের খ্রিষ্টানগণ পশুর ন্যায় ও সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল, পাদ্রী ফিন্ডেল সাহেব তাঁর লিখা 'মীযানুল হক'-এ এটা স্বীকার করেছেন।

৪৪. কুরআন শরীফ নিজেকে অলৌকিক ও অদ্বিতীয় বলে দাবী করত উ"চস্বরে ঘোষণা করেছে, কুরআনের বাণী কোন মানবের বাণী বলে কারও মনে যদি সন্দেহ হয়, তবে জগতে যে কোন মানব এরূপ বাণী প্রচার করে এর প্রতিযোগিতা করুক। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীগণ সবাই নি:শব্দ থেকে কুরআনের নির্দোষিতা ও পবিত্রতাকে প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু ইঞ্জিলকে তৎকালীন ইহুদীগণ চুরির মাল বলে নির্দেশ করেছেন। ইঞ্জিলে এমন দাবীও নেই যে মানুষ এমন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে অসমর্থ। সুতরাং চুরির কথা ইঞ্জিল সম্বন্ধে সম্ভবপর হলেও কুরআন শরীফ সম্বন্ধে কখনো সম্ভবপর নয়। কুরআনের দাবিই এই– কোন মানুষই এমন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে কক্ষনো সক্ষম হবে না। বিরুদ্ধবাদীরা সবাই নি:শব্দ থেকে এ দাবির সত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন।

যাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণী ও উপাখ্যান ওহী বা ঐশী বাণী। এতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ভবিষ্যদ্বাণীরূপে লিপিবদ্ধ আছে। সুকথা ও বাগ্মিতায় এটা মানবশক্তি বহির্ভূত অলৌকিক পুস্তক। অতএব তৎকালীন খ্রিষ্টানগণ সহজেই কোন কোন গল্পকাহিনী ও বিবরণী কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতেন, তাদের অমুক অমুক পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ হতে অপহরণ করে এ বিষয়গুলো কুরআনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এমনটি হলে ইসলামের সব কর্মকান্ড জলাঞ্জলী যেত। কিন্তু এখন তো এদের সব আপত্তি এমনই যেমন কথিত আছে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এ পুস্তকগুলো মৌলিক ধর্মগ্রন্থ হোক বা কৃত্রিম ধর্মগ্রন্থ হোক, আরবী খ্রিষ্টানগণ তা অপ্রকাশিত রেখে চুপ করে বসে ছিল, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এমন কথা স্বীকার করতে পারে না। অতএব কুরআনের যাবতীয় বিবরণীই যে ঐশীবাণী এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ঐশীবাণীর অবতরণ এত বড় অলৌকিক কার্য যে কেউই এর সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয় নি। এটাও নিশ্চয় ভেবে দেখার বিষয়, যে ব্যক্তি পরের পুস্তক হতে বর্ণনা চুরি করে তাঁর গ্রন্থ সঙ্কলন করেছিলেন এবং স্বয়ং অবগত ছিলেন যে অমুক অমুক পুস্তক হতে অমুক অমুক বিষয় ও বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে আর এগুলো ঐশী বাণী নয় তিনি কিরূপে সারা পৃথিবীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে দু:সাহসী হলেন? প্রতিদ্বন্দ্বীগণই বা কেন এ কাজে অগ্রসর হতে সাহস করল না? আর কেউই তাঁর দোষ উন্মোচন করতে সমর্থ হলো না! বস্তুত সত্য কথা এই, খ্রিষ্টানগণ কুরআনের ওপর বড়ই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। তাদের বিরাগ ও অসন্তোষের কারণ, এ কুরআন খ্রিষ্টধর্মের যাবতীয় ডানা ও পালক ছিঁড়ে ফেলেছে। কোন মানবের পক্ষে স্বয়ং খোদা হওয়া যে সম্পূর্ণ অলীক ও অসম্ভব, তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানদের ক্রুশ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে খন্ডন করেছে। ইঞ্জিলের যে নৈতিক শিক্ষা নিয়ে খ্রিষ্টানগণ এত গর্ব করতেন তা এককভাবেই অসম্পূর্ণ ও অচল বলে প্রতিপন্ন করেছে। কাজেই খ্রিষ্টানেরা তাদের স্বার্থহানি দেখে ক্ষেপে উঠেছে এবং অসংখ্য মিথ্যা কথা বলছে। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে নব যৌবন লাভ করতে পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে আদিম শুক্রে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষা করা আর কোন মুসলমানের খ্রিষ্টান হবার আকাঙ্ক্ষা করাও একই কথা।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, খ্রিষ্টানগণ কী নিয়েই বা গর্ব করেন! তাদের কোন খোদা যদি থেকে থাকে, তবে তিনিও বহু শতাব্দী পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রিটে মাটির নিচে কবরে সমাহিত আছেন। আর তাঁর যদি কোন অলৌকিক কার্য ও ঘটনা থেকে থাকে, তবে তা-ও অন্য নবীগণের অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনা অপেক্ষা শ্রেয় নয়। বরং ইলিয়াস নবীর মু'জিযা হলো ঈসা নবীর মু'জিযা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ইহুদীদের বর্ণনা মতে তাঁর কোন অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনাই ছিল না। তিনি শুধু মিথ্যা বলেছেন ও প্রতারণা করেছেন।[৪৫] আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা এই, ওগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর ১২ জন হাওয়ারী কি স্বর্গে ১২টি সিংহাসন পেয়েছিলেন? কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি? যে পার্থিব রাজত্বের জন্য অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছিল, তা কি তিনি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? কেউ এর উত্তর দিন তো? যিশু কি তাঁর অঙ্গীকার মতে সে যুগেই আকাশ হতে অবরতণ করেছিলেন? আকাশ হতে অবতরণ করা তো দূরের কথা, আকাশে আরোহণ করাও তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। ইউরোপীয় সমালোচক পন্ডিতগণেরও এই মত : তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। এরপর অতি সংগোপনে পলায়ন করে ভারতবর্ষের পথ ধরে কাশ্মীরে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখানে মারা গিয়েছিলেন।[৪৬]

---

৪৫. ইহুদীরা তাদের এ কথায় স্বয়ং যিশুর বাক্য হতেই সহায়তা পায়। তিনি ইঞ্জিলে বলেছেন, এ যুগের হারামখোরগণ (অসাধু ও পাপী পুরুষরা) আমার সমীপে নিদর্শন চায়, তাদেরকে কোন নিদর্শনই দেখান হবে না। অতএব তিনি যদি কোন মু'জিযা দেখাতেন তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রার্থনাকালে এর উল্লেখ করতেন।

৪৬. যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও ঈসা (আ.)কে জড়দেহে স্বর্গে উত্তোলন করেন, তাঁরা কুরআনের প্রতিকূল যথা বাক্য উচ্চারণ করেন। কুরআন শরীফে **ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী** (সূরা মায়েদা : ১১৮) আয়াতে ঈসা নবীর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে এবং হালকুনতু ইল্লা বাশারার্‌রসূলা (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪) আয়াতে কোন মানবের পক্ষে জড়দেহে স্বর্গারোহণ করা অসম্ভব বলে প্রচার করা হয়েছে। খোদার কালামের প্রতিকূল বিশ্বাস করা বড় মূর্খতা। তাওয়াফ্ফি অর্থ জড়দেহে স্বর্গারোহণ এ অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর কী! প্রথমত কোন অভিধানেই তাওয়াফ্ফি অর্থ জড়দেহে স্বর্গারোহণ করা এরূপ পাওয়া যায় না। আবার যেমন ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী আয়াত কিয়ামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে অর্থাৎ রোজ কেয়ামতে হযরত ঈসা খোদা তাআলাকে এ উত্তর দিবেন। তখন এ অর্থ করলে স্বীকার করতে হয়, পুনরুত্থান দিবস এসে পৌঁছলেও ঈসা নবী মরবেন না। মৃত্যুর পূর্বেই জড়দেহে খোদার সামনে হাজির হবেন। কুরআন শরীফের এরূপ তাহ্‌রীফ ও অর্থ পরিবর্তন ইহুদীদের তাহ্‌রীফ অপেক্ষাও গুরুতর।

ইঞ্জিলের শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয়। অপহরণ যে দোষের তা ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, মানবের মনোবৃত্তির মাঝে কোন একটি মাত্র মনোবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষমা ও ধৈর্য গুণের উন্নতির ওপরই ইঞ্জিলে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাকী মনোবৃত্তিকে একেবারেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আপনারা সবাই অবশ্যই বুঝতে সক্ষম, সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা মানবকে যা দিয়েছেন এর কিছুই অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রতিটি মানবীয় শক্তিই নিজ নিজ স্থানে বিশেষ বিশেষ কল্যাণজনক কাজে ও উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সময় ও অবস্থা বিশেষ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যেমন উত্তম চরিত্রগুণ বলে গণ্য হয় তেমনি সময় বিশেষ আত্মাভিমান, প্রতিশোধ ও শাস্তিদানও উত্তম চরিত্রগুণে পরিগণিত হয়। সব সময় ক্ষমা দেখানো ও ধৈর্য অবলম্বন কল্যাণজনক নয়। সব সময় শাস্তি দেওয়াও সুফল বয়ে আনে না।

কুরআনে খোদা তাআলা যে মহানীতি শিখিয়েছেন তা বাস্তবিক কল্যাণজনক ও সুফলপ্রদ : جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ **যাজাউ সাইয়্যিআতিন সাইয়্যিআতুম্ মিছিলুহা ফামান 'আফা ওয়া আসলাহা ফাআজরুহ্ আলাল্লাহ্** (সূরা আশ্ শুরা : ৪১) অর্থাৎ যে পরিমাণ কুকর্ম (করা হয়) প্রতিফল ঠিক সেই পরিমাণেই (দিতে হয়), কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও তা দিয়ে পরোপকার ও দোষ সংস্কার করে, সে খোদার সমীপে পুরস্কার পায়।[৪৭] এটাই কুরআনের শিক্ষা। কিন্তু ইঞ্জিলে সর্বত্রই অহেতুক ক্ষমা প্রদর্শন করতে ও ধৈর্য অবলম্বন করে থাকতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। যে মনোবৃত্তি বিকাশের ওপর মানব সভ্যতা সংস্থাপিত, ইঞ্জিলে একে পদদলিত করা হয়েছে। মানবতরুর সব শাখার একটি শাখার উন্নতি সাধনে বিশেষ জোর দিয়ে অবশিষ্ট শাখাগুলোর উন্নতি বিধানের কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যিশু তাঁর নিজ নৈতিক শিক্ষানুসারেও জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি। তিনি ডুমুর ফল খাবার জন্য ডুমুর গাছের কাছে গিয়ে তা ফলহীন পেয়ে

৪৭. অনর্থক ক্ষমা করা ও অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া, কুরআন শরীফে অনুমোদিত নয়। কেননা, এতে মানব চরিত্র বিকৃত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সামাজিক বন্ধন ভঙ্গ হয়। যে প্রকার ক্ষমায় কোন উপকার বা সংস্কার সাধন হয় তা-ই কুরআনে অনুমোদিত (সূরা শূরা : ১৪)।

অভিসম্পাত করেছেন। তিনি পরকে আদর্শবাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন. 'কাহাকেও নির্বোধ কহিও না'। কিন্তু স্বয়ং কুবাক্য প্রয়োগে এত উন্নতি করেছেন যে ইহুদীদের নেতৃগণকে 'জারজ সন্তান' বলেছেন এবং তাদেরকে অতি নিন্দিত আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কার্যত সুনীতি দেখানো নৈতিক শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে অপূর্ণ শিক্ষানুসারে তিনি স্বয়ং জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি তা কি কখনো ঈশ্বরপ্রদত্ত শিক্ষা হতে পারে? ফলত পূর্ণ ও পবিত্র শিক্ষা শুধু কুরআনের শিক্ষা। কুরআন মানবতরুর যাবতীয় শাখা প্রশাখার প্রতিপালন করে। কুরআন শুধু একদিকেই জোর দেয় না। সময় ও স্থান বিশেষে কুরআন ক্ষমা ও ধৈয শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু এ দিয়ে উপকার সাধন করতে হবে, এ শর্তও রেখে দেয়। সময় ও স্থান বিশেষ অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাও কুরআন শরীফে বিদ্যমান। অতএব জগতের চির পরিদৃষ্ট অটল অনন্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুরূপ প্রতিবিম্ব শুধু কুরআন শরীফেই দেখা যায়। ঐশ্বরিক বাণী ও ঐশ্বরিক কাজে যে সামঞ্জস্য আছে তা মানব বুদ্ধিতে অবশ্য স্বীকার্য। ঐশ্বরিক কাজ যে ভাবাপন্ন ও যে বর্ণবিশিষ্ট, ঐশ্বরিক বাণীও ঠিক সেই ভাবাপন্ন ও বর্ণবিশিষ্ট হবে, খোদা তাআলার বাণীপূর্ণ সত্যগ্রন্থে তাঁর কার্যের অনুরূপ শিক্ষা বর্তমান থাকবে। কথায় একরূপ কাজে অন্যরূপ হওয়া খোদা তাআলার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা ঐশ্বরিক কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, তিনি সদাসর্বদা ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন না করে পাপীদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেন; এরূপ শাস্তির বিবরণ পূর্ববর্তী পুরাতন ধর্মগ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। আমাদের খোদা শুধু ক্ষমাশীল নন। তিনি সদা ক্ষমাশীলও বটে, কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। যে গ্রন্থ তাঁর অটল স্বাভাবিক নিয়মাবলীর অনুকূল তাই সত্যগ্রন্থ। যে ঐশ্বরিক বাণী ঐশ্বরিক কাজের প্রতিকূল নয়, তা-ই সত্য ঐশ্বরিক বাণী। আমরা কখনো এমন নিয়ম দেখতে পাইনি যে খোদা তাআলা সব সময়ই মানবজাতির প্রতি ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেন। অপবিত্র চরিত্র মানবের শাস্তির মিনিত্তে খোদা তাআলা এই মাত্র আমার দ্বারা এক মহা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ প্রদান করে রেখেছেন। এ ভূমিকম্প এদেরকে ধ্বংস করবে। এদিকে প্লেগ মহামারী এখনও এদেশ হতে দূরীভূত হয় নি। ইতিপূর্বে অতীত যুগে নূহের জাতির লোকদের কী দুর্দশা হয়েছিল! লূতের স্বদেশবাসীগণের কী ভীষণ বিপদ ঘটেছিল! অতএব

নিশ্চয় জানবে শরীয়তের (স্বর্গীয় বিধানের) মুখ্য উদ্দেশ্য তাখাল্লুক বি আখলাকিল্লাহ্ অর্থাৎ মহাসম্মানিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত খোদা তাআলার চরিত্রের আলোকে চরিত্র গঠন– এতেই মানবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হয়। আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার চরিত্রকে অতিক্রম করে কোন সদাচরণ করতে কিংবা সচ্চরিত্র গঠন করতে অভিলাষী হই তবে তা-ই অধর্ম ও কালিমাময় চরিত্র ও ধৃষ্টতা এবং খোদা তাআলার চরিত্রের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ বলে পরিগণিত হবে।

আবার একথাও ভেবে দেখুন! তওবা, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন, পুণ্যবানদের সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধেও প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, অনন্তকাল থেকে খোদার প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই। কিন্তু যায়েদের মাথায় পাথর মারলেই বকরের মাথা বেদনা দূর হয়ে যায়–আমরা খোদার এমন প্রাকৃতিক নিয়ম কখনো দেখিনি। অতএব ঈসা মসীহের আত্মহননে পরের রোগ দূরীভূত হওয়ার কথা কোন্ নিয়মের ওপর সংস্থাপিত এবং কোন্ দার্শনিক সত্যের বলে মসীহের রক্তে পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ও কালিমা দূরীভূত হবে তা আমরা বুঝতে পারি না। বরং আমরা এর প্রতিকূল রীতিই দেখতে পাই। কেননা, মসীহ্ যতদিন আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন নি ততদিন খ্রিষ্টান সমাজে সদাচরণ ও খোদার উপাসনার বীজ বর্তমান ছিল। কিন্তু ক্রুশের ঘটনার পর থেকে খ্রিষ্টানদের প্রবৃত্তিমূলক উত্তেজনা ও অহমিকা- স্রোত বাঁধ ভাঙ্গা নদীর ন্যায় চারদিকে পাড় ডুবিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মসীহ্ যদি এ আত্মহত্যা নিজ ইচ্ছায় করে থাকেন তবে তিনি যে খুবই অন্যায় করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জীবন যদি বক্তৃতা করে ও উপদেশ দিয়ে কাটাতেন তাহলে খোদার সৃষ্ট জীবদের উপকার করতেন। এ অসঙ্গত কর্ম করায় কী পরোপকার হয়েছে? অথচ মসীহ্ আত্মহননের পর জীবিত হয়ে ইহুদীদের সামনে যদি সশরীরে স্বর্গারোহণ করতেন তবে ইহুদীরা বিশ্বাস করতো। কিন্তু এখনও তো ইহুদীদের মতে ও সকল বুদ্ধিমানের মতে ঈসার স্বর্গারোহণ শুধু কাল্পনিক গল্প মাত্র।

আবার ত্রিত্ববাদও এক অদ্ভুত বিশ্বাস। কেউ কি কখনো শুনেছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পরিপূর্ণ সত্তা তিন হয় আবার একও হয় এবং এক পরিপূর্ণ খোদা তিন পরিপূর্ণ খোদা হয়? খ্রিষ্টান ধর্মে যে এর প্রত্যেক কথায় ভুলত্রুটি এবং প্রতিটি বিষয়ে

অপলাপ বিদ্যমান। আবার এত আঁধার সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য ওহী ও ইলহাম একেবারে মোহরাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন ইঞ্জিলে ভ্রান্তিগুলোর মীমাংসা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মতে নতুন ওহী ও ইলহামের মাধ্যমেও অসম্ভব। কেননা, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভবিষ্যতে ওহীর সম্ভাবনা নেই। সব অতীত হয়ে গেছে। এখন সব ভরসা কেবল নিজ নিজ সিদ্ধান্তের ওপর। এ সিদ্ধান্ত যদিও অজ্ঞতা, সন্দেহ ও অন্যান্য কালিমা থেকে মুক্ত নয়। তাদের ইঞ্জিল অগণিত জ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অহেতুক কথায় পরিপূর্ণ। তারা বলে, ইঞ্জিলের মতে দুর্বল মানুষ যীশুই খোদা। পরের পাপে তিনি ক্রুশবিদ্ধ, ৩ দিন ধরে নরকে পরিত্যক্ত। তিনি স্বয়ং খোদা অথচ দুর্বল ও মিথ্যাবাদী। ইঞ্জিলে এসব কথা বিদ্যমান যাতে নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা এথেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি) হযরত ঈসা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন। তিনি এক চোরকে বলেছিলেন, 'তুমি আজ স্বর্গে আমার সাথে ভোজন করবে'। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে তিনি সেদিন নরকে চলে যান। ৩ দিন অবিরত কঠোর নরক যাতনা ভোগ করলেন। 'শয়তান যিশুকে পরীক্ষা করতে কয়েক জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল' একথাও ইঞ্জিলে লেখা আছে। আশ্চর্যের বিষয, স্বয়ং খোদা বা পরমেশ্বর হয়েও যিশু পাপী-সত্তা শয়তানের পরীক্ষা থেকে নিস্তার পেলেন না। শয়তান খোদাকে পরীক্ষা করতে ও বিপথগামী করতে সাহসী হলো! ইঞ্জিলের দার্শনিক জ্ঞান গোটা পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা। শয়তান বাস্তবিকই যদি তাঁর কাছে আগমন করেই থাকতো তবে ইহুদীদেরকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য এটা কি একটি মাহা সুযোগ ঘটেছিল না? কেননা ইহুদীরা হযরত মসীহ্র নবুওয়তের কঠোরভাবে অস্বীকারকারী ছিল। কারণ, মালাকি নবীর গ্রন্থে সত্য মসীহ্র চিহ্ন লিখা আছে, মসীহ্ আবির্ভূত হওয়ার আগে ইলিয়াস নবী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পুনরাগমণ[৪৮] করবেন। এটাই মসীহ্র আগমনের নিদর্শন। কিন্তু

৪৮. বর্তমানে আমাদের সহজ সরল মোল্লা মৌলভীগণ যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণের অপেক্ষা করেন সেভাবে সেই যুগের ইহুদীরা ইলিয়াস নবীর আকাশ থেকে অবতরণের প্রতীক্ষা করতো। হযরত ঈসা (আ.) মালাকি নবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর রূপকভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাই ইহুদী জাতি আজ পর্যন্ত তাঁকে সত্য নবী মানে না। কেননা ইলিয়াস আকাশ থেকে অবতরণ করেন নি। এ বিশ্বাসের দরুনই ইহুদী সমাজ অভিশপ্ত হয়েছে। আজকাল মুসলমান এ বৃথা আশার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ইহুদীদের রঙে রঙ্গীন হয়েছে। যাহোক এতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

ইলিয়াস নবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন না বলেই ইহুদীরা ঈসাকে অস্বীকার করে এবং আজ পর্যন্ত তাঁকে ভন্ড নবী, মিথ্যা নবী ও প্রতারক বলে নির্দেশ করে। এ প্রবল যুক্তির প্রতিবাদে খ্রিষ্টানরা নীরব। ঈসার সমীপে শয়তানের আগমন সংবাদও তাদের মতে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক পাগল এরূপ শয়তানী স্বপ্ন দেখে থাকে। এটা 'কাবুস' বা বোবায় ধরা জাতীয় রোগ বিশেষ। এক গভেষক ইংরেজ শয়তানের আগমনের ব্যাখ্যা করেছেন: মসীহ্র কাছে ৩ বার শয়তানী ইলহাম (প্রত্যাদেশ বাণী) অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু এতে তিনি প্রভাবিত হন নি। 'তুমি খোদা পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আমার অনুচর হও'– এটাও তার একটি শয়তানী ইলহাম। সে এ কথা তাঁর অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরপুত্রের ওপর শয়তান নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারে সমর্থ হলো এবং সংসারের প্রতি তাঁরও হৃদয় আকৃষ্ট করলো এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!

খোদা হয়েও তিনি আবার মারাও গেলেন। খোদা কখনো কি মারা যান? আর শুধু যদি মানুষটি মরে গিয়ে থাকে তবে ঈশ্বরপুত্র মানব জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছেন, এ দাবী কেন? ঈশ্বর পুত্র বলে কথিত হওয়া সত্ত্বেও পুনরুত্থান দিবস সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ রাখেন নি। ইঞ্জিলে স্বীকার করেছেন, ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত কবে সংগটিত হবে তা তিনি জানেন না। স্বয়ং খোদারও পুনরুত্থান দিবসের জ্ঞান নেই, এটা কেমন অলীক ও অসঙ্গত কথা! কিয়ামত দিবস তো দূরের কথা ডুমুর গাছের কাছে যাওয়ার সময়ে সেই গাছে যে ফল নেই তা-ও তিনি জানতেন না।

এখন আমি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে সংক্ষেপে বলতে চাই, কোন ঐশী বাণী যদি কোন অতীত কাহিনী বা গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুরূপ ও অনুকূল হয়ে অবতীর্ণ হয় কিংবা তা মানুষের মতে যদি কাল্পনিক কাহিনী বা কাল্পনিক গ্রন্থ হয় তথাপি উক্ত ঐশী বাণীর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন আক্রমণ করা যায় না। খ্রিষ্টানরা যে পুস্তকগুলোকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন অথবা যেগুলোকে ঐশী বাণীপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ বলে নির্দেশ করেন, ওগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের সব কথা অলীক, ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন। কোন পুস্তকই সন্দেহ ও দ্বিধা হতে মুক্ত নয়। যে গ্রন্থগুলোকে তারা অসত্য বলে বিশ্বাস করেন সেগুলো কৃত্রিম না-ও হতে

পারে। যে গ্রন্থগুলোকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করেন সেগুলো কৃত্রিমও হতে পারে। ঐশীগ্রন্থের ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুকূল অথবা প্রতিকূল হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এসব গ্রন্থের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হওয়া ঐশী গ্রন্থের সত্যতার মাপকাঠি নয়। খ্রিষ্টানরা আদালতের বিচার প্রণালী অনুসারে বিচার করে সেই পুস্তকগুলোকে কৃত্রিম বলতে পারেন না। কোন নিয়মিত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে সত্য ও বিশুদ্ধ বলেও নির্দেশ করতে পারেন না। এসব কেবল তাদের যুক্তিহীন অনুমান কল্পনা ও খেয়াল মাত্র। অতএব তাদের এসব অসার চিন্তা-ভাবনা ঐশীগ্রন্থের সত্যাসত্যের মাপকাঠি হতে পারে না বরং মাপকাঠি হচ্ছে, দেখতে হবে যে সেই কিতাব খোদার প্রাকৃতিক নিয়ম[৪৯] ও অলৌকিক কর্মকান্ড তথা মু'জিযার মাধ্যমে নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করেন কি না। আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তিন হাজার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মু'জিযা (অলৌকিক কাজ) ছিল। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা অগণিত। তাঁর অতীত অলৌকিক কাজের বর্ণনা অনাবশ্যক। বরং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি মহান একটি মু'জিযা হলো, অন্যান্য নবী-রসূলের ওহী বা ঐশীবাণী বন্ধ হলেও, তাঁদের অলৌকিক কাজ বিদ্যমান না থাকলেও, তাঁদের অনুসারীগণ এখন পুরোপুরি রিক্ত হস্ত হলেও এবং তাঁদের হাতে শুধু পুরাতন কাহিনী বৈ আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকলেও তাঁর (সা.) গৌরবমন্ডিত অলৌকিক কাজ বা মু'জিযা লুপ্ত হয় নি। তাঁর (সা.) ওহী বা ঐশীবাণী বন্ধ হয় নি। সর্বদাই তাঁর উম্মতের কামিল বা সিদ্ধ মহাপুরুষদের (যারা তাঁকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে তাঁরই মত জীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করেছিলেন) মাধ্যমে তাঁর (সা.) মু'জিযা জগতে বিকশিত হচ্ছে। তাই ইসলাম ধর্মই জীবিত ধর্ম। ইসলামের খোদা জীবিত খোদা। অতএব এ যুগেও জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতে আমি মহা সম্মানিত খোদার দাসরূপে উপস্থিত রয়েছি। আজ পর্যন্ত আমার হাতে হযরত রসূল সল্লাল্লাহু

৪৯. দুনিয়ায় একমাত্র কুরআন করীমই খোদা তাআলার সত্ত্বা ও গুণাবলীকে খোদার (সৃষ্ট) সেই প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সুসামঞ্জস্যশীল হিসেবে ব্যক্ত করেছে, যা খোদার কাজ হিসেবে জগৎ জুড়ে পরিদৃষ্ট এবং মানবস্বভাব ও মানববিবেকে চিত্রিত রয়েছে। খ্রিষ্টান মহোদয়দের খোদা শুধু ইঞ্জিলের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। যাদের কাছে ইঞ্জিল পৌছেনি তারা এ খোদার বিষয় কিছুই অবগত নয়। কিন্তু কুরআন প্রচারিত খোদা কোন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই অপরিচিত নয়। কাজেই প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই যাঁকে কুরআন করীম তুলে ধরেছে, যাঁর সাক্ষ্য মানবস্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম দিচ্ছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কুরআনের সত্যতা সম্পর্কিত সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। খোদা তাআলার পবিত্র বাক্যালাপে আমি প্রায় প্রত্যহই সম্মানিত হচ্ছি।

অতএব সতর্কতা অবলম্বন করে চিন্তা করুন, দেখুন দুনিয়াতে হাজার হাজার ধর্ম স্বর্গীয় ধর্ম বলে কথিত হয় কিন্তু কোন্ ধর্ম খোদার প্রতিষ্ঠিত ও মনোনীত তা কিরূপে নির্ণয় করবেন? সত্যধর্ম অবশ্যই বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত। যুক্তিসঙ্গত হওয়ার দাবী প্রচারই ঐশী ধর্মের সত্যতার প্রমাণ নয়। কারণ মানুষ মাত্রই যুক্তি প্রদান করতে সমর্থ। শুধু মানুষের যুক্তিপ্রমাণে যে খোদা বা ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় তিনি খোদা বা ঈশ্বর নন। যিনি প্রবল যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনসহ স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করেন তিনিই প্রকৃত খোদা। খোদা স্থাপিত ও খোদা মনোনীত অবিকৃত সত্য ধর্মে ঐশী চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে এবং তা ঐশী মোহরে চিহ্নিত হবে। ধর্মের সত্যতা পরীক্ষার্থে এটা একান্তই আবশ্যক। নতুবা এ ধর্ম যে শুধু ঐশী হাত হতেই জন্ম লাভ করেছে তা কিরূপে বুঝবেন? শুধু ইসলাম ধর্মই এ ধর্ম। শুধু এ ধর্মের সাহায্যেই অতি গোপনীয় ও লুক্কায়িত খোদার সন্ধান পাওয়া যায়। এ ধর্মের প্রকৃত অনুসারীদের মাধ্যমেই খোদা প্রকাশিত হয়ে থাকেন। বস্তুত এটাই একমাত্র সত্য ধর্ম। সত্য ধর্মে খোদার বিশেষ সহায় বিদ্যমান। এতেই তিনি প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'আমি বর্তমান আছি'। যেসব ধর্মের ভিত্তি শুধু গল্পকাহিনীর ওপর সংস্থাপিত সেগুলো মূর্তিপূজা অপেক্ষা শ্রেয় নয়। এসব ধর্মে সত্যতার প্রাণ নেই। খোদা যেমন পূর্বে জীবিত ছিলেন যদি এখনও তেমন জীবিত থেকে থাকেন, তিনি যদি পূর্বের ন্যায় এখনও কথা শুনতে ও বলতে পারেন, তবে এ যুগে যে তিনি মরার মত নি:শব্দ থাকবেন এ কথার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অতএব যে ধর্ম বর্তমান যুগেও খোদার শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি উভয়ই সপ্রমাণ করতে সক্ষম তা-ই সত্য ধর্ম। বস্তুত সত্য ধর্মের অনুসারীকে স্বয়ং খোদা তাআলা স্বীয় বাক্যালাপে ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

খোদা তাআলার পরিচয় লাভ অতি দুরূহ কাজ। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ খোদার সন্ধান দিতে অক্ষম। স্বর্গ মর্ত্য দর্শনে এ অটল প্রকাশ্য রচনা কৌশলের কোন সৃষ্টিকর্তা হওয়া আবশ্যক, শুধু এ কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তিনি যে এখন বিদ্যমান তা প্রমাণিত হয় না। 'হওয়া আবশ্যক' ও 'বিদ্যমান' এ দু'টি কথার পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। অতএব দেখা যায় শুধু কুরআন শরীফই খোদা তাআলার অস্তিত্বের সন্ধান দিতে কার্যত সমর্থ। কুরআন শুধু খোদাকে পরিচয় করে দিতে সহায়তা করে ক্ষান্ত হয় না। কুরআন স্বয়ং খোদাকে দেখিয়ে দেয়। আকাশের নীচে আর এমন কোন গ্রন্থ নেই যা সে গুপ্ত অস্তিত্বের সন্ধান দিতে পারে।

খোদা তাআলার অস্তিত্ব, অসীম সৌন্দর্য ও পূর্ণ গুণাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে কুপ্রবৃত্তি ও কুমতির আকর্ষণ হতে মানবের মুক্তিলাভ ও খোদার সাথে ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা স্থাপনই ধর্মের উদ্দেশ্য। এ অবস্থাই প্রকৃত জান্নাত বা স্বর্গ। এটাই পরলোকে বিভিন্ন বেশে প্রকাশিত হবে। সত্য খোদার কোন সংবাদ না রেখে তাঁর কাছ হতে দূরে অবস্থান, তাঁর সাথে প্রকৃত প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনে অনটনই নরক, এটাই পরলোকে বিভিন্ন বেশ ধারন করে বিকশিত হবে। খোদা তাআলার অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ ও তাঁর সাথে পূর্ণ প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

কোন্ ধর্মে কোন্ গ্রন্থে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা-ই এখন বিচার করে দেখা আবশ্যক। বাইবেলে স্পষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে, খোদা তাআলার সাথে কথাবার্তা ও বাক্যালাপের দ্বার বন্ধ। দৃঢ়-বিশ্বাস লাভের পথ অবরুদ্ধ। যা হবার পূর্বেই হয়েছে, ভবিষ্যতে হবে না। কিন্তু যিনি এ যুগেও শনুতে সক্ষম তিনি কেন এ যুগে বলতে অক্ষম হবেন এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! কেন প্রাথমিক যুগে তিনি বলতেন ও শুনতেন কিন্তু এখন শুধু শুনেন কিন্তু বলেন না? এমন বিশ্বাসে কি মানবহৃদয় শান্তি লাভ করতে পারে? বৃদ্ধ হলে মানুষের যেমন কোন কোন শক্তি নিষ্কর্মা হয় সেরূপ সময়ের গতিতে যে ইশ্বরের কোন কোন শক্তি নিষ্কর্মা হয়, তিনি কোন্ কাজের ঈশ্বর? আবার যে ঈশ্বরকে বেঁধে বেত্রাঘাত না করলে, যার মুখে থু থু না ফেললে, যাকে কিছু দিন হাজতে না রাখলে ও অবশেষে ক্রুশে না চড়ালে, নিজ দাসদের পাপ ক্ষমা করতে অক্ষম, তিনিই বা কোন্ কাজের ঈশ্বর বা খোদা? যার ওপর রাজ্যহারা পদানত ইহুদী জাতি বিজয়ী ও প্রবল হয়েছিল সে ঈশ্বরের প্রতি আমরা বড়ই অসন্তুষ্ট। যে খোদা মক্কার এক দরিদ্র ও নিঃসহ

ব্যক্তিকে নবী নিযুক্ত করে তাঁর শক্তি ও বিজয়-প্রভাব সে যুগেই সমুদয় জগতে প্রকাশিত করেছিলেন, প্রবল-প্রতাপ পারস্য সম্রাট এ নবী (সা.)-কে গ্রেফতার করতে সিপাহী প্রেরণ করলে যে সর্বশক্তিমান খোদা তাকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'হে রসূল তুমি সিপাহীদের বলে দাও, গত রাতে আমার প্রভু তোমার প্রভুর প্রাণ সংহার করেছেন'–আমরা শুধু সে খোদা ও পরমেশ্বরকেই সত্য পরমেশ্বর বলে জানি। ভেবে দেখুন, এক ব্যক্তি ঈশ্বরত্বের দাবী করলেন কিন্তু রোমান গভর্ণমেন্টের এক সিপাহী তাকে গ্রেফতার করে ১/২ ঘন্টা জেলখানায় পুরে দিল। তার সারারাতের কাতর প্রার্থনাও মঞ্জুর হলো না। অন্য ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবী বলে দাবী করলেন আর খোদা তাআলা তার বিরোধী সম্রাটদেরকেও বিনাশ করলেন? 'দিগ্‌বিজয়ীর বন্ধু হও তুমিও দিগ্‌বিজয়ীর হবে–এ প্রবাদ বাক্য সত্যান্বেষণকারীর জন্য বড়ই উপকারজনক। যা মৃতধর্ম তা গ্রহণ করে আমরা কী করব? যা মৃত গ্রন্থ তা দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? যিনি মৃত খোদা তিনি আমাদের কী জ্যোতি প্রদান করবেন? যাঁর হাতে আমার প্রাণ সুরক্ষিত আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি, আমি আমার পবিত্র খোদার নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত হয়েছি এবং প্রায় প্রত্যহই হচ্ছি। যিশু যে খোদাকে বলেছেন–'তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে' সে খোদা আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি! মসীহ্‌র ন্যায় আমিও বহুবার আক্রান্ত হয়েছি কিন্তু প্রতি আক্রমণেই শত্রু অকৃতকার্য হয়েছে। আমাকে ফাঁসি দিতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল কিন্তু যিশুর ন্যায় আমি ক্রুশ বিদ্ধ হই নি। বরং প্রত্যেক বিপদেই খোদা, আমার খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার জন্য তিনি বড় বড় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী হাত প্রসার করেছেন। হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে সুসিদ্ধ করেছেন যে, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন তিনিই প্রকৃত খোদা। আমি এ বিষয়ে ঈসা মসীহ্‌র কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই নি। তাঁর সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাজ বর্ণিত আছে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক কাজ ও ঘটনা আমাতেই পূর্ণ হচ্ছে। আমি এ সম্মান শুধু এক নবীকেই অনুসরণ করে লাভ করেছি। এ নবী আমাদের নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও পদবী সম্বন্ধে পৃথিবী অজ্ঞ। যদিও জীবনের সব

চিহ্ন শুধু হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই পাওয়া যায়, তথাপি মূর্খ অজ্ঞ লোকেরা বলে ঈসা আকাশে জীবিত আছেন। এটা বড়ই অদ্ভুত ও অবিচার। দুনিয়া যে খোদা সম্পর্কে অজ্ঞাত আমি সেই খোদাকে তাঁর নবীর মাধ্যমে অবলোকন করেছি এবং অন্যান্য জাতির ওপর যে 'ওহী-ইলহাম' বা ঐশীবাণীর দ্বার অবরুদ্ধ তা আমার ওপর কেবল এই নবীর বরকত ও কল্যাণে অবারিত করা হয়েছে। আর যে-সব মু'জিযা অন্যান্য জাতি কেবল কল্প কাহিনী রূপে বর্ণনা করে থাকে আমি এই নবীর (সা.) মাধ্যমে সে-সব মু'জিযা দর্শন করেছি। আমি এই নবীর (সা.) সেই পদমর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছি যার ঊর্ধ্বে আর কোন পদমর্যাদা নেই। আশ্চর্যের বিষয় দুনিয়া এ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা বলে, কেন তুমি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র দাবী করলে? কিন্তু আমি সত্য সত্য বলছি, এ নবীকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করলে, ঈসা নবী কেন তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াও সম্ভবপর। অন্ধেরা বলে, এটা কুফরী ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু তোমরা যখন নিজেরাই বিশ্বাসরত্ন হারিয়েছ তখন কুফরী বা অবিশ্বাস কাকে বলে কিরূপে বুঝবে? তোমরা যদি ইহ্‌দিনাস সিরা-ত্বাল মুস্তাকীম সিরা-ত্বাল্‌লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহিম-(সূরা ফাতিহা : ৬-৭) এর অর্থ অবগত থাকতে তবে এমন কুফরী ও অবিশ্বাসীর বাণী মুখে আনতে না। খোদা তাআলা তোমাদেরকে উৎসাহিত করে বলেছেন, তোমরা এ রসূলের পূর্ণ তাবেদারী করলে, রসূলদের বিভিন্ন কামাল ও পূর্ণগুণ একাধারে অর্জন করতে সমর্থ হবে। আর তোমরা শুধু এক নবীর কামাল ও পূর্ণগুণ লাভ করাকে কুফরী বলছো?

কিরূপে খোদা তাআলার মনোনীত সত্য-ধর্ম চিনে নেয়া যায় এর প্রতি আপনার মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। স্মরণ রাখবেন, যে ধর্মে খোদার সন্ধান পাওয়া যায় তা-ই সত্য ধর্ম। অন্যান্য ধর্মে শুধু মানুষের চেষ্টা ও সাধনা দেখা যায়। শুধু মানুষের চেষ্টায় খোদা আবিষ্কৃত হলে তিনি মানুষের কাছে এজন্য ঋণী হয়ে পড়েন। ইসলাম ধর্মে প্রতিযুগেই আনাল মওজুদ বা আমি আছি- এ বাণীর মাধ্যমে খোদা তাআলা নিজ অস্তিত্বের সন্ধান দেন। তদনুসারে এ যুগেও তিনি আমার কাছে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। অতএব যাঁর উপলক্ষ্যে আমরা খোদা তাআলাকে চিনতে সক্ষম হয়েছি সে নবীর ওপর হাজার সালাম, শান্তি, কল্যাণ ও আশিস বর্ষিত হোক!

হযরত মরিয়মকে কুরআনে 'উখতা হারূন' বা হারূনের বোন বলা হয়েছে। এ কথা শুনে আপনার মনে (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে) মন্দভাব উদিত হয়েছে জেনে আমি দুঃখের সাথে পুনরায় বলছি, এতে আপনার অতি অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। এ অনর্থক আপত্তির প্রতিবাদে পূর্ববর্তী ওলামা ও পন্ডিতেরা অনেক কথা লিখে গেছেন। রূপকস্বরূপ কিংবা অন্য কোন কারণে যদি খোদা তাআলা মরিয়মকে হারূনের বোন বলে থাকেন তবে আপনি এত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন কেন? কুরআনে বারংবার বর্ণিত হয়েছে, হারূন ও মূসা সমসাময়িক নবী ছিলেন। মরিয়ম হযরত ঈসার মা, আর ঈসা নবী মূসা নবীর ১৪০০ বছর পর জন্মে ছিলেন। তবে 'নাউযুবিল্লাহ্' খোদা তাআলা ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এবং ভ্রমবশত মরিয়মকে হারূনের বোন বলে ফেলেছেন– এটাই কি প্রমাণিত হয়? যারা অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে আনন্দ পায় তারা কত দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির! মরিয়মের হারূন নামে কোন ভাই থাকাও অসম্ভব নয়। কোন বস্তু বিশেষের অজ্ঞতা সেই বস্তুর অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। ইঞ্জিল ও বাইবেল যে কত যুক্তিসঙ্গত আপত্তির লক্ষ্য হতে পারে, খ্রিষ্টানরা নিজেদের থলিতে হাত দিয়ে সে কথা ভেবে দেখেন না। মরিয়ম চিরকাল বায়তুল মোকাদ্দসের খাদেমা বা সেবিকারূপে জীবন যাপন করবেন, তিনি আজীবন স্বামী গ্রহণে বিরত থাকবেন, এ বলে তাকে মসজিদে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরই ৬/৭ মাসের গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়লে অন্তঃসত্বা অবস্থায়ই সমাজের নেতা ও প্রাচীন ব্যক্তিরা ইউসুফ (যোসেফ) নামক এক সুত্রধরের কাছে তাকে বিয়ে দিলেন। স্বামীগৃহে যাওয়ার ২/১ মাস পরেই এক পুত্র জন্ম নিল। সে পুত্রই ঈসা বা যিশু নামে অভিহিত। দেখুন, এগুলো কত বড় আপত্তির কথা। প্রথম আপত্তি এই, মরিয়মের গর্ভ বাস্তবিকই যদি অলৌকিক ঘটনা হতো তবে প্রসবকাল পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করা হলো না? দ্বিতীয় আপত্তি, এ মন্দিরের আজীবন পরিচর্যার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কেন তাকে সুত্রধর ইউসুফের পত্নি করা হলো? তৃতীয় আপত্তি, তওরাত গ্রন্থ মতে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও, ইউসুফের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তার প্রথম স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্বর্গীয় ধর্মশাস্ত্রের আদেশ অমান্য করে গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর বিয়ে সম্পাদিত হলো? যারা বহু বিবাহের বিরোধী তারা হয়ত ইউসুফের বিয়ের কোন সংবাদ জানেন না। অসদুপায়ে মরিয়মের গর্ভ সঞ্চার হয়ে থাকবে,

এ সন্দেহে পড়েই সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁকে উক্ত অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন। যে কোন আপত্তিকারক ন্যায়সঙ্গতভাবে এ ধারণা পোষণ করতে সমর্থ হয়। ইহুদী জাতিকে পুনরুত্থান প্রদানার্থে শুধু পরমেশ্বরের মহিমা বলেই যে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিলেন, কুরআনের শিক্ষামতে তা আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি। বর্ষাকালে হাজার হাজার কীট পতঙ্গ নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করে। হযরত আদম (আ.) ও মা-বাবা ছাড়া জন্মেছিলেন। অতএব হযরত ঈসার এ জন্মে কোনই মাহাত্ম্য নেই। স্বয়ং পিতৃহীন জন্ম কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু শক্তি-শূন্যতার প্রকাশক। যে অবলাকে বায়তুল মুকাদ্দসের সেবার জন্য নজর দেয়া হয়েছিল তার বিয়ের কী আবশ্যকতা? অতএব হযরত মরিয়মের বিয়ে শুধু সন্দেহেরই ফল। দুঃখের বিষয়, এ বিয়ে বহু অনিষ্টের কারণ হয়েছে। অকর্মণ্য হতভাগা ইহুদীরা এথেকে অবৈধ সহবাসের প্রচার করেছে। অতএব যদি কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকে তবে এ সবই আপত্তি, হারূনকে মরিয়মের ভাই বলায় কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। মরিয়ম 'হারূন নবীর ভাগ্নী' কুরআনে এমন কথাও নেই। শুধু 'হারূন' শব্দ আছে 'নবী' শব্দ নেই। ইহুদী সমাজে নবীদের নামে নাম করণের প্রথা ছিল। অতএব হারূন নামে মরিয়মের কোন ভাই থাকাও সম্ভব। এ কথার আপত্তি উত্থাপন করা বোকার লক্ষণ ও স্পষ্ট বোকামী।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পুরাতন বই-পুস্তকে যদি 'আসহাবে কাহ্ফ' প্রভৃতি গল্প দেখতে পাওয়া যায়, তারা যদি সেগুলোকে কৃত্রিম ও কাল্পনিক গল্প বলে ধারণা করে তবে তাতেই বা ক্ষতি কি? মনে রাখবেন এদের ধর্ম পুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তক ও স্বর্গীয় পুস্তকগুলো সম্পূর্ণ আঁধারে আবৃত। আজকাল ইউরোপ এ গ্রন্থাবলী নিয়ে কত শোকাকূল। সরল স্বভাব বিশিষ্ট নর-নারীরা কিরূপেই স্বত:ই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, কত বড় বড় গ্রন্থ ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখতে হচ্ছে, আপনি হয়ত তা অবগত নন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কয়েকজন খ্রিষ্টান তজ্জন্যই আমাদের জামাতে প্রবেশ করেছেন। অসত্য কতদিন আবৃত অবস্থায় থাকতে পারে? ভেবে দেখুন খোদার ওহীতে এরূপ পুস্তক হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করার কী আবশ্যকতা? স্মরণ রাখবেন, এরা চক্ষুহীন, এদের যাবতীয় পুস্তক জ্যোতিহীন ও আঁধারময়। কুরআন আরব উপদ্বীপে অবতীর্ণ

হয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা সাধারণত খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের কোন সংবাদই রাখত না। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেও উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। এসব কথা জেনে শুনেও যারা সেসব অপবাদ এই মহাপুরুষের (সা.) প্রতি আরোপিত করে তাদের অন্তরে অণুমাত্রও খোদাভীতি নেই। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত হলে, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কতই না আপত্তি উত্থাপিত হবে? যীশু (ঈসা) এক বনী ইসরাঈলী মওলানা সাহেবের কাছে তওরাত কিতাব এক এক করে পাঠ করে পড়ে নিয়েছিলেন, 'তালমুদ' ও ইহুদীদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেছিলেন। তাঁর ইঞ্জিল বস্তুত বাইবেল ও তালমুদের বাক্যে এত পরিপূর্ণ যে ইঞ্জিলের সত্যতা সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়! আমরা শুধু কুরআন শরীফের আদেশ পালনেই এতে বিশ্বাস করি। দু:খের বিষয়, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে মজুদ নেই এমন একটি কথাও ইঞ্জিলে নেই। কুরআন যদি বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন সত্য কথা, সত্য নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য যাবতীয় সত্য একত্র করে থাকে তবে এতে কী-বা অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য কাজ করা হয়েছে এবং কী অনিষ্ট-ই-বা ঘটে গেছে? কুরআন শরীফের কাহিনী ও গল্প শুধু ওহী বা দৈববাণী হতেই প্রাপ্ত। তা কি আপনার মতে অসম্ভব? আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমীপে ওহী বা ঐশীবাণীর অবতরণ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ ও প্রমাণিত। তাঁর সত্য নবুওয়ত ও প্রেরিত হওয়ার আলোক, আশীর্বাদ ও বরকত আজ পর্যন্তও বিকশিত হচ্ছে। তবে নাউযুবিল্লাহ্, কুরআনের কোন কোন গল্প পূর্ববর্তী গ্রন্থ বা শিলালিপি হতে নকল করা হয়েছে, এ শয়তানী ধারণা কি হৃদয়ে কখনো স্থাপন করা সম্ভবপর হয়? খোদা তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি আপনার কোন সন্দেহ জন্মেছে? আপনি কি তাঁকে 'গায়েব' তথা অজ্ঞেয় বিষয়াবলী সম্পর্কে সর্বজ্ঞ বলে অবগত নন? ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কোন কোন গ্রন্থকে মৌলিক ও কোন কোন গ্রন্থকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব মনগড়া অভিমত। আমি ইতোপূর্বেই বলেছি, তারা কোন মৌলিক গ্রন্থের মৌলিকতা দেখতে পায় নি। কোন কৃত্রিম পুস্তকের কৃত্রিম লেখককেও ধরে দিতে পারেন নি। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বহু সমালোচক বিজ্ঞ পন্ডিতের সাক্ষ্য আমার কাছে মজুদ আছে। তারা এক অতি অন্ধ জাতি। তাদের বিশ্বাস-জ্যোতি সম্পূর্ণ নির্বাপিত। যে

খ্রিষ্টানরা পদার্থ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে তিমির সাগরে নিমজ্জিত ও আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী তারাই আবার যিশু খ্রিষ্ট জড়দেহে আকাশে উপবিষ্ট, এ বিশ্বাস পোষণকারী। হায়! এদের জন্য কত পরিতাপ। বস্তুত ইহুদীদের আদিম ধর্ম-পুস্তকগুলো সত্য হলে এদের ওপর নির্ভর করে হযরত ঈসা (আ.)-কে নবী বলা যায় না। দেখুন তিনি যে মসীহ্ মাওউদের দাবী করেছিলেন, মালাকী নবীর গ্রন্থানুসারে তাঁর আগমনের পূর্বে ইলিয়াস নবীর আসমান হতে অবতরণের একান্তই আবশ্যক ছিল। কিন্তু কোথায় সেই ইলিয়াস? তিনি এখনও অবতীর্ণ হন নি। ফলত এটা ইহুদীদের অতি প্রবল যুক্তি। হযরত ঈসা (আ.) এর খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন নি। হযরত ঈসাকে নবী বলে কুরআন শরীফ তাঁর মহোপকার সাধন করেছে। হযরত ঈসা নিজেই খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ববাদের খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইউনুস নবী তিন দিন মাছের পেটে সজীব রয়েছিলেন, আমি তাঁরই সদৃশ'। ঈসা নবী যদি বাস্তবিকই ক্রুশে মরে থাকেন তবে ইউনুস নবীর সাথে তাঁর সাদৃশ্য কোথায়? তাঁর সাথে তাঁর সম্বন্ধই বা কী? হযরত ঈসা যে ক্রুশে মরেন নি, শুধু সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ ছিলেন, তা-ই এ উপমায় প্রতিপন্ন হয়। 'মরহমে ঈসা' নামক যে বিখ্যাত ঔষধের ব্যবস্থা প্রায় সব হাকিমী চিকিৎসা-গ্রন্থেই পাওয়া যায় এর শিরোনামে লিখিত আছে যে হযরত ঈসার জন্যই অর্থাৎ তাঁর ক্ষত আরোগ্য করার জন্য প্রথম এ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল।*

اگر در خانہ کس است ہمیں قدر بس است۔

[উচ্চারণ ঃ আগার দার খানে কাস আস্‌ত
হামিন কাদার বাস আস্‌ত

ভাষান্তর ঃ বাড়ীতে যদি কেউ থেকে থাকে
তবে তা-ই যথেষ্ট]

* রূহলী খাযায়েন ২০তম খন্ড পৃ:৩৩৭-৩৩৮

## Imam Mahdi[as]-er
# PATRABOLI
Moqtubat-e-Ahmad

Vol. 1 Chapter 2

**Letters to Christian Missionaries**

Calling people towards divine truth is a practice of the true Prophets. The Holy Quran clearly mentions the letter sent by Hadhrat Sulaiman[as] to the Queen of Sheba. The compilation of Hadith has recorded the letters written by the Holy Prophet of Islam (sa) to the kings and rulers in and around the Arab peninsula calling them towards Islam. Following the footsteps of his Master, Hadhrat Muhammad[sa] the Imam of latter days Hadhart Mirza Ghulam Ahmad Qadiani[as] took up the pen to preach and defend Islam. He also used his tiny but sharp 'sword' in rejecting allegation against his divine claim. The compilation of these letters are recorded as Moqtubat-e-Ahmad (letters of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad). On the eve of our Khilafat Centerany of 2008, under the auspices of Hadhrat Khalifatul Masih the V (aba), our Jama'at has published these letters with few additions in the older compilation. Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh is fortunate to be able to publish the **first part's second chapter** of this compilation which deals with the letters written to **Christian Missionaries.** This will prove to be a great addition in the world of theological knowledge.

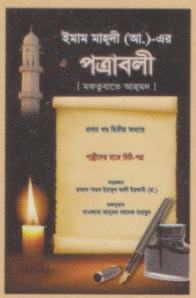


**Imam Mahdi[as]-er**
**PATRABOLI**
Moqtubat-e-Ahmad
Vol. 1 Chapter 2
**Letters to Christian Missionaries**
**by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
**The Promised Messiah and Imam Mahdi[as]**
translated into bengali by
**Maulana Ahmad Sadeque Mahmud**
published by
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-046-6
9 789849 910466